ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ

প্রণীত

মূল্য একটাকা চারি আনা

ভারত প্রেস লিঃ
৪২নং রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা
হইতে
শ্রীমুরারীমোহন কাঞ্জিলাল
কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

উৎসর্গ

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উজ্জ্বলরত্ন

পুরীধামের সিদ্ধ মহাপুরুষ

মদীয় গুরুদেব

৺বাসুদেব রামানুজ দাস

মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ

করিলাম

নাগপুর

কার্ত্তিক সংক্রান্তি

১৩৪৩

গ্রন্থকার

ভূমিকা

ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমে আগাছাগুলি নষ্ট করিতে হয়। সেইরূপ কোনও বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে সে বিষয়ে ভুল ধারণাগুলি দূর করা প্রয়োজন। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে আজকাল অনেকগুলি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তাহার একটি বিশেষ কারণ এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের মনে কতকগুলি সংস্কার উৎপন্ন হয়। হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে ধারণা আমাদের সেই সকল সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। বিশেষতঃ আজকাল অনেকের পক্ষে মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার সুযোগ হয় না। অনেক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম এবং দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত সংযোগের অভাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি অনেক গুরুতর বিষয়ে ভ্রান্ত হইতেছে। আমরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতগুলি পাঠ করিতেছি এবং তাঁহাদের ভ্রান্ত মতগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধে বিবিধ লেখকের ভ্রান্ত মত প্রদর্শন করিয়া যে মতগুলি আমার নিকট সত্য বলিয়া মনে হয় সেইগুলিই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় কোনও কোনও স্থানে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রের প্রতি বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে তাহার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষ ও মাসিক বসুমতীতে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ

হিন্দুর পূজাপদ্ধতি

১৩৩৯ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে "পত্রধারা"শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী পত্র ছাপা হইয়াছে। হিন্দুর পূজা-পদ্ধতি এবং সাধনা সম্বন্ধে ইহাতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুরা ঠাকুরকে কাপড় পরায়, স্নান করায়,— এসব ব্যর্থ শুধু ব্যর্থ নহে অনিষ্টকর; দেবপ্রতিমার নিকট পাঁঠা বলি দিলে অজ্ঞানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র; এইসব পাপের ফলে আমরা বিদেশীদের কাছে মার খাচ্চি। হিন্দুরা যে ভাবে পূজা করে সে ভাবে পূজা করা অপেক্ষা নাস্তিক হইয়া বিশ্বমানবের সেবা করা ভাল, এইরূপ নাস্তিকরা যথার্থ ভক্ত।

কোনও কার্য্য ব্যর্থ কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কি উদ্দেশ্যে সে কার্য্য করা হইতেছে। কার্য্যটি যদি সে উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থ নহে, যদি সহায়ক না হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থ। যে উদ্দেশ্যের জন্য ঐ কার্য্য সাধিত হয় নাই, কার্য্যটি সে উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় নাই বলিয়া তাহাকে ব্যর্থ বলা যুক্তিযুক্ত নহে,—এই অপর উদ্দেশ্যটি যতই মহৎ হউক না কেন।

ভগবানকে লাভ করা, এবং দুঃখীর দুঃখ মোচন করা দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য। দুঃখীর দুঃখ মোচনার্থ যে কর্ম করা যায়, সে কর্ম ঈশ্বরলাভের সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু সেই কারণে উভয় উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিস্মৃত

হইলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে এই দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পার্থক্য রক্ষা করেন নাই, এবং "ঠাকুরকে কাপড় পরান, স্নান করান" প্রভৃতি কার্য্য দুঃখীর দুঃখমোচন রূপ উদ্দেশ্যের সহায়ক নহে বলিয়া তিনি ইহা ব্যর্থ বলিয়াছেন।

"ঠাকুরকে কাপড় পরান, স্নান করান" এই সকল কার্য্য কি ঈশ্বর লাভের সহায়ক হইতে পারে? নিশ্চয় পারে। ঈশ্বর লাভ করিবার উপায়—ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখা, ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া যাওয়া। এই হইল সাধারণ উপায়। এই সাধারণ উপায়ের উপযোগী নানাবিধ বিশেষ উপায় আছে। লোকের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন। এজন্য এক উপায় সকলের পক্ষে উপযোগী হয় না। কেহ নির্জন স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া দীর্ঘকাল ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিয়া রাখিতে পারেন; কেহ বা তাহা পারেন না, সর্বদা ভগবানের জপ করিতে ভালবাসেন; কেহ বা তাঁহার স্তব করিতে বা নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে ভালবাসেন; কেহ বা তাঁহার বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে এবং পুষ্পনৈবেদ্যাদি নিবেদন করিতে ভালবাসেন। এ সকল উপায়ই ভগবানকে পাইবার পক্ষে এবং মনকে ভগবদভিমুখী করিবার পক্ষে উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট প্রথার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, অপর প্রথায় উপাসনা করিলে কোনও ফল লাভ হয় না, ইহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা। হিন্দুধর্মে এরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী হিন্দু শুনিয়াছে,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ গীতা ৪।১১

"যে যে প্রকারেই আমার পূজা করুক, সেই প্রকারেই আমি তাহাকে অনুগ্রহ করি। সকল মানব সকল প্রকার উপায়ে আমার মার্গই অনুসরণ করে।"

"ঠাকুরকে কাপড় পরালুম, সে কাপড় কি পৌঁছবে বস্ত্রহীনের কাছে, ঠাকুরকে স্নান করালুম সেই স্নানের জল কি পাবে যে মানুষ জলের অভাবে তৃষিত-তাপিত? তা যদি না হ'ল এ সেবা কোন্ কাজে লাগল? কেবল নিজেকে ভোলাবার কাজে?"

ঈশ্বরের পূজা যাহার জীবিকা এমন দরিদ্র পুরোহিতের সাধ্বী পত্নীর নিকট সে কাপড় হয় ত পৌঁছিতে পারে,—কিন্তু, নাও পারে। জল যে জলহীনের নিকট পৌঁছিবে না তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলিয়া এ সেবা কোনও কাজে লাগিবে না ইহা বলিতে পারিবেন না। হৃদয়কে ভগবদভিমুখী করা, কিছুকালের জন্য ভগবৎ-সান্নিধ্য উপলব্ধি করা, বুঝি তাঁহার স্পর্শ পাইয়া আমার এই অপবিত্র দেহ পবিত্র ও সার্থক হইল, এইরূপ অনুভূতি হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত করা,—এই সকল উদ্দেশ্যে বস্ত্র এবং জল অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্দেশ্য যদি সার্থক হয়, তাহা হইলেও কি ইহা ব্যর্থ?

রবীন্দ্রনাথ এখানে একটা খাঁটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই ভাবে উপাসনা "কেবল নিজেকে ভোলবার কাজে" লাগিবে। কিন্তু নিজেকে ভোলানও যে একটা বড় প্রয়োজনীয় কাজ। আমার ঘরবাড়ী, ধনখ্যাতি, আমার স্ত্রীপুত্রকন্যা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার বন্ধু, আমার শত্রু,—এই সব চিন্তায় যে আমাদের হৃদয় অধিকাংশ সময়ই পরিপূর্ণ থাকে। এ-সব চিন্তা মধ্যে মধ্যে আমাদের হৃদয় হইতে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন,—আমাদের "নিজেকে ভোলান" দরকার। মনকে বলা দরকার, "ওরে তোর এই সব সুখদুঃখ কয় দিনের জন্য? যদি এই সবেই মগ্ন হইয়া থাকিস, তাহা হইলে প্রায়ই নানাবিধ সাংসারিক দুঃখে কষ্ট পাইতে হইবে,—আর যেদিন ওপর হইতে ডাক আসিবে, সেদিন বড় অসহ্য কষ্ট হইবে। দিন থাকিতে তাঁহার কথা স্মরণ কর,

যাহা সংগ্রহ করিতে পারিস তাহা লইয়া তাঁহায় কাছে ছুটিয়া যা। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, তোর অন্তরের ভক্তি মাখাইয়া তুই যাহা দিবি তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন,—অন্ন, বস্ত্র, নৈবেদ্য, পুষ্প, এমন কি শুধু জল দিলেও তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।" হিন্দু পূজা করিয়া এইভাবে মনকে ভোলায়। রবীন্দ্রনাথ কি ইহা ব্যর্থ বলেন ?

হিন্দুর পূজাপদ্ধতিকে যে ভাবে পরীক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ বলিয়াছেন, সেই ভাবে পরীক্ষা করিলে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতিকেও ব্যর্থ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনার জন্য ভজনালয় নির্মাণ করা হয়। যে অর্থ ব্যয় করিয়া ভজনালয় নির্মাণ করা হয় সেই অর্থ ব্যয় দ্বারা হাঁসপাতাল নির্মাণ করিলে কিছু পরিমাণে দুঃখীর দুঃখমোচন হইত। তাহা হইল না বলিয়া ব্রাহ্মদের ভজনালয় নির্মাণ কি ব্যর্থ হইবে ? ধ্যান ও উপাসনাতে তাঁহারা যে সময় অতিবাহিত করেন, সেই সময় রোগীর পরিচর্য্যা করিলে কিছু পরিমাণে দুঃখীর দুঃখমোচন হইতে পারিত। তাহা হইল না বলিয়া ধ্যান এবং উপাসনাকে কি ব্যর্থ বলিতে হইবে ? মুসলমান ও খৃষ্টানের মস্‌জিদ ও গির্জা নির্মাণ এবং ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই এক কথাই বলা যায়। বস্তুতঃ, হিন্দুর পূজাপদ্ধতিকে যে ভাবে বিচার করিয়া তিনি ব্যর্থ ও অনিষ্টকর বলিয়াছেন, সেই ভাবে বিচার করিলে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা করিবার পদ্ধতিকেও ব্যর্থ বলা যায়। তিনি অপর কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতিকে এ ভাবে বিচার না করিয়া কেবল হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতিকে এই ভাবে বিচার করিয়া ইহাকে ব্যর্থ এবং অনিষ্টকর বলিলেন। তিনি ইহাও বলিতে পারেন না যে, মুসলমান খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম যে ভাবে উপাসনা করে তাহাতে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, কিন্তু হিন্দু যে ঠাকুরকে কাপড় পরায় এবং স্নান করায় তাহাতে হিন্দুর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। কারণ

রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ হিন্দুর পূজা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা বিভিন্ন দেশবাসী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে জীবের দুঃখমোচনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া ভগবদুপাসনার উপরে স্থান দিলে অবশেষে নাস্তিকতাবাদে আসিয়া পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে ইহাই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা মানবের দুঃখ নিবারণই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা কিছু কালের মধ্যে বুঝিতে পারেন—জগতে দুঃখের পরিমাণ কত বেশী। এই দুঃখের পরিমাণের তুলনায় তাঁহাদের নিজের ক্ষমতার অল্পতা তাঁহাদের হৃদয়ে নৈরাশ্যের সঞ্চার করে। ঈশ্বর যদি দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান হন তাহা হইলে কেন জগতে এত দুঃখ, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া প্রথমতঃ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন—ঈশ্বর কখনও দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। তাহার পর তাঁহাদের মনে হয় ঈশ্বর যদি দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান না হন, তাহা হইলে ঈদৃশ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন কি? এই ভাবে পরিণামে তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়েন। য়ুরোপে কোনও কোনও জ্ঞানী, পণ্ডিত ও পরোপকারী ব্যক্তি এই ভাবে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন।

এই ধরণের যুক্তি রবীন্দ্রনাথও এই পত্রে কিছু পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন; এবং যাঁহারা এই ভাবে নাস্তিক হইয়াও পরোপকার-রত আছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধি দ্বারা তাঁদের ধর্মকে মহৎ ক'রে তোলেন,—তাঁরা দূর কালের জন্য প্রাণপণ

করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত।" কিন্তু এই সমস্যার কি সমাধান হইবে রবীন্দ্রনাথ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। উদ্ধৃত অংশের পরেই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারা-জীবন অত্যন্ত শুচি হ'য়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হ'য়ে রইলেন, তাঁরা ত নিজেরই পূজা করলেন,—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রস-সম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি বলে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানীর কাগজ।" এখানে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য যে আচারপরায়ণ হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। না হয় স্বীকার করা গেল যে, আচারপরায়ণতা হিন্দুদের কুসংস্কার মাত্র, ইহাতে তাহাদের কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। কিন্তু যাঁহারা আচার মানেন না,—তাঁদের ধ্যান উপাসনাও কি ব্যর্থ? ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই ত তাঁহারা ধ্যান উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদেরই লাভ, জগতের দুঃখী লোকের তাহাতে কি লাভ? মুক্তি কথাটা অবশ্য হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ব্যবহার হয়। অন্য ধর্মে তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গলাভের কথা আছে, তাহাও ত তাহাদের নিজেদেরই লাভ। তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হয় যে, যাহারা ঈশ্বরলাভই জীবনের লক্ষ্য করে এবং তাহার জন্য নিজ ধর্মানুমোদিত সাধনা করে, তাহারা সকলে স্বার্থপর, এবং যে সকল নিরীশ্বর ব্যক্তি পরোপকারই জীবনের ব্রত করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ? রবীন্দ্রনাথ এত বড় সমস্যা তুলিলেন, অথচ তাহার কোন সমাধান করিলেন না, ইহা বড়ই বিচিত্র।

অথচ এই সমস্যার সমাধান হিন্দুধর্মে যেমন আছে অন্য কোনও ধর্মে তেমন নাই। হিন্দুধর্ম বলিয়াছে, তুমি জীবের দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা কর, ইহা ভাল কাজ। কিন্তু ভাল কাজও করিবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম না মানিয়া কাজ করিলে, ভাল কাজেরও খারাপ ফল হয়। দুঃখীর

দুঃখমোচন করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য—কারণ এইরূপ চেষ্টা করিলে ভগবান প্রীত হন—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু এই কর্মে নিরত হইয়া ইহা কিছুতেই ভোলা উচিত নহে যে, "একজন সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আছেন, তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ চলিতেছে. তাঁহার ইচ্ছাতেই দুঃখী দুঃখ পাইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে অত্যন্ত দুঃখীর দুঃখও অনায়াসে ঘুচিয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাহারও দুঃখ একবিন্দু কমাইতে পারা যায় না। যেখানে দুঃখ প্রয়োজন সেখানে দুঃখ কমাইলে কল্যাণ হয় না।" এই সকল কথা ভুলিয়া দুঃখমোচন ব্রত গ্রহণ করিলে অহঙ্কার এবং নাস্তিকতার আবির্ভাবের আশঙ্কা আছে।

গীতায় কর্ত্তব্য কর্ম করিবার যে কৌশল বা প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা কম। সে প্রণালী হইতেছে (১) কর্মফলের অন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। দুঃখমোচনের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য চেষ্টা করিব। ফল ভগবানের হাতে, আমার হাতে নহে। (২) কর্মে আসক্তি ত্যাগ করা। দুঃখমোচন করিতে আমার ভাল লাগে এই জন্যে দুঃখমোচন চেষ্টা করা উচিত নহে। দুঃখমোচনের চেষ্টা করিলে ভগবান প্রীত হইবেন এই ভাবিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করা উচিত। (৩) আমি যে কাজ করি তাহাতেও আমার কর্তৃত্ব-বুদ্ধি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করা। ভগবান সকলের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করেন,—তিনি যাহাকে যে ভাবে প্রেরণা দেন, সে সেই ভাবেই কার্য্য করে, এই ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা।

হিন্দুর বিশ্বাস, জীব পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারে দুঃখভোগ করে। যদি কেহ বলেন যে এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে দুঃখীর প্রতি সমবেদনা কমিয়া যায় এবং দুঃখমোচনের আগ্রহ শিথিল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে

হইবে, পাপীর প্রতি ঘৃণা একটা হৃদয়ের দুর্বলতা, তাহা ত্যাগ করা উচিত। অন্যায় করিয়া দুঃখ পাইতেছে সত্য, তথাপি তাহার দুঃখমোচনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ঈশ্বরলাভ ও পরোপকার এই দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও ইহাদের মধ্যে যে কোনও সম্পর্ক নাই এমত নহে। পরোপকার ব্রত ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইলে ইহা ঈশ্বরলাভের পক্ষে সহায়ক। কারণ ইহা দ্বারা স্বার্থপরতা কমিয়া যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরোপকার-ব্রতের উদ্দেশ্য হইবে নিজ চিত্ত শুদ্ধ করা। দুঃখীর দুঃখমোচন ইহার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছামাত্র সকলের দুঃখমোচন করিতে পারেন,—যেখানে দুঃখদান করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন সেখানে তিনি দুঃখদান করেন, যখন যেখানে দুঃখমোচন করা প্রয়োজন মনে করেন তখন সেখানে দুঃখমোচনের ব্যবস্থা করেন। হয় ত আমাদের দ্বারাই এই দুঃখমোচন কার্য্য করান। পরোপকার ব্রতের ঠিকমত অনুষ্ঠান না করিলে ইহা হইতেই চিত্তে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাতে চিত্ত মলিন হয়। পরোপকার কার্য্যে অতিরিক্ত আসক্তি হইলে এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইলে, হৃদয়ে নাস্তিকতার সঞ্চার হইতে পারে। য়ুরোপের এইরূপ বিশ্বহিতৈষী নাস্তিকের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "তাঁরা যথার্থ ভক্ত"। কিন্তু যাঁহারা নাস্তিক তাঁহাদিগকে কিরূপে ঈশ্বর-ভক্ত বলা যায়? তাঁহাদিগকে বিশ্বপ্রেমিক বলাও কঠিন, কারণ সাধারণতঃ তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টা মানবজাতির মধ্যেই আবদ্ধ, মানবেতর প্রাণীর মঙ্গলচিন্তা তাঁহারা বিশেষ করেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হ'লে কি বলবি,

হে ঈশ্বর, অনেক ইস্কুল আর হাঁসপাতাল করে দাও ? একজন কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করিতে গেল, কিন্তু সেখানে ভিখারীর ভীড় দেখে তাঁদিকে পয়সা দিতে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল যে মা কালীর দর্শনই পেল না।" আমরা যে সব কথা বলিয়াছি সে সকল কথা স্মরণ রাখিলে পরমহংসদেবের উক্তির তাৎপর্য্য বোঝা যাইবে। পরোপকার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। পরোপকার-ব্রত যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরলাভের সহায়ক, সে পর্য্যন্তই ইহা অনুশীলন করা উচিত। ঈশ্বরলাভের অন্তরায় হইলে পরোপকাব-ব্রতের কোন মূল্য নাই। পরোপকার মাত্রই উত্তম কর্ম নহে। ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছি এইরূপ বুদ্ধিতে পরোপকার করিলে তাহাতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ঈশ্বরলাভের উপযোগী হয়। যদি পরোপকার করিয়া হৃদয়ে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মে, সেরূপ পরোপকার কর্ম মন্দ।

রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক বিশ্বহিতৈষীর সহিত তুলনা করিয়া আচারনিষ্ঠ হিন্দুর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আচারনিষ্ঠা দ্বারা পরোপকার সাধিত হয় না, অতএব ইহা নিন্দনীয়, রবীন্দ্রনাথের এ যুক্তি বিচারসহ নহে। কারণ আচার নিষ্ঠার উদ্দেশ্য পরোপকার নহে, ইহার উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। যদি ঈশ্বরলাভের জন্য সহায়ক না হয়, তাহা হইলে সে আচার নিন্দনীয়। *কিন্তু যদি ইহা ঈশ্বরলাভের সহায়ক হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা পরোপকার সাধিত না হইলেও ইহা সার্থক।* শুদ্ধ আচার অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্র ইহা প্রচার করিয়াছে, সাধক হিন্দুর জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এ ক্ষেত্রে আচার মাত্রই ব্যর্থ—রবীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না।

হিন্দুর পূজাপদ্ধতির নিন্দা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার সহিত বাস্তব জগতের মিল নাই। তিনি বলিয়াছেন "মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে থাকে, আচারে নেই।" ইহা কি সত্য? দরিদ্রকে দান হিন্দুরা যাহা করে তাহা কি নগণ্য? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভারতে এত অসংখ্য ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছে কিরূপে? ইংলণ্ডে Poor Law এবং Work House আছে সত্য, কিন্তু Ruskin, Wordsworth প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া দরিদ্র ব্যক্তির সেখানে বাস করা সম্ভব নহে। দরিদ্র হইলেই যে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। টলষ্টয় বলিয়াছেন, যে দেশের পুলিসে ভিক্ষা করিবার অপরাধে নিঃস্ব লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, সে দেশের লোক কি করিয়া বলিতে পারে যে তাহারা যিশুখৃষ্টের অনুবর্ত্তী? Poor Law না থাকিলেও আমাদের দেশে এত ভিক্ষুক খাইতে পাইতেছে, এবং তাহাদিগকে যাহারা ভিক্ষা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। ধর্ম্মলাভেচ্ছু হিন্দু যদি দুঃখীর অভাবের প্রতি একান্ত উদাসীন হন, তাহা হইলে হিন্দুর তীর্থস্থানে এবং দেবালয়ের নিকটে ভিক্ষার্থীর এত ভীড় হয় কেন? আজকালই পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে মুষ্টিভিক্ষার নিন্দাসূচক বাক্য শোনা যায়,—Indiscriminate charity, এবং drones of society; পূর্বে এরূপ কথা শোনা যাইত না। পূর্বে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত,

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

"যাহার গৃহ হইতে অতিথি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া চলিয়া যায়, অতিথি তাহাকে নিজ পাপ প্রদান করিয়া গৃহস্থের পুণ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়।"

বিদেশী ভ্রমণকারিগণও হিন্দুর অতিথিপরায়ণতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্যত্র এরূপ দেখা যায় না। মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য লোকের আচারে যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে কি ইহা সম্ভবপর হইত? বিনা ব্যয়ে অতিথির থাকিবার জন্য এত অধিক সংখ্যক ধর্মশালা আর কোনও দেশে আছে কি? ধর্মার্থে বৃক্ষ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা আজকাল ইংরাজি শিখিয়া না হয় আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু সেটা কি হিন্দুধর্মের দোষ? পাশ্চাত্যদেশে পরোপকার সাধারণতঃ নিজ জাতির মধ্যে, বড় জোর মানব জাতির মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দুর পরোপকার সর্ব্ব জীবে প্রসারিত, কারণ হিন্দুর বিশ্বাস এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। অক্ষম গরুকে কাটিয়া তাহার মাংস ভোজন করাই পাশ্চাত্য প্রথা। হিন্দু অক্ষম গরুর জন্য আশ্রয় এবং আহারের বন্দোবস্ত করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে। এজন্য গৃহস্থের অবশ্য-কর্ত্তব্য পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে প্রাণিগণকে আহার প্রদান এবং অতিথি পূজা উভয়ই বিহিত হইয়াছে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞো তিথিপূজনং॥

"অধ্যাপনা করার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ হইতেছে পিতৃযজ্ঞ, হোম করা দেবযজ্ঞ, প্রাণিদিগকে আহার প্রদান করা ভূতযজ্ঞ (সর্বপ্রাণির পূজা) এবং অতিথি পূজা নরযজ্ঞ (মানবের পূজা)।"

শুনাং চ পতিতানাং চ শ্বপচাং পাপরোগিণাং।
বায়সানাং কৃমাণাং চ শনকৈর্নিবপেদ্ভুবি॥

"কুকুর, নীচজাতীয় ব্যক্তি, চণ্ডাল, কুষ্ঠ বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তি; কাক ও কৃমি সকলকে যত্নপূর্ব্বক আহার প্রদান করিবে।"

শাস্ত্রে আছে, কিন্তু হিন্দুর আচারে এ সব কিছু নাই এ কথা বলিলে চলিবে না। কারণ হিন্দু বড় বেশী শাস্ত্র মানিয়া চলে এ কথা রবীন্দ্র-

নাথই অনেকবার বলিয়াছেন। আর আজকাল যদি শিক্ষিত হিন্দুর আচার হইতে এ সকল অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহার জন্য কি পাশ্চাত্য শিক্ষাই বেশী দায়ী নহে?

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে লিখিয়াছেন, "জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ; * * যথার্থ ব্রাহ্মণ্যগুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হ'ন্, তাঁকে ভক্তির দ্বারা সত্যফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয়, এই জন্যই অস্থানে ভক্তির দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েচে।" যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত আচার এবং গুণকর্ম নাই তিনি নিন্দনীয়, শাস্ত্রে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। কোন্ ব্রাহ্মণ গুণবান, এবং কে গুণহীন ইহা স্থির করা যতদূর দুরূহ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহা ততদূর দুরূহ নহে। কে ভাল, কে মন্দ, কে সাধু, কে ভণ্ড সমাজে সকলেই ইহা চেনে এবং তদনুরূপ সমাদরও করিয়া থাকে। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ভাল লোক থাকিলে তখনই তাহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিতে হইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বৈশ্য বাল্য-কাল হইতে কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য এই সবই দেখিয়াছে এবং এই সবই শিখিয়াছে। সে খুব আদর্শ-চরিত্রের ব্যক্তি হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া টোলে অধ্যাপনা করিতে বসাইয়া দিলে অধ্যাপনার কার্য্য কি ভালরূপে চলিবে? কৃষি বাণিজ্যে কি আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তির কোনও প্রয়োজন নাই? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা জন্মগত ভিন্ন অন্যরূপ করা সম্ভবপর নহে। অল্প-বয়স্ক বালকের ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণোচিত গুণ হইবে অথবা বৈশ্যোচিত গুণ হইবে তাহা কি করিয়া জানা যাইবে? তাহা না জানিতে পারিলে তাহার ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে, না বৈশ্যোচিত? হিন্দুর বিশ্বাস, জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, পূর্ব কর্মের ফল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত সাধনার উপযুক্ত, ভগবান তাহাকেই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করান। যে

ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও কুকর্ম-নিরত হয়, সে ইহ জন্মে নিন্দনীয় হয় এবং পর জন্মে নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। ইহজন্মেই পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। কোনও কালেই ইহজন্মে এরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি যে কয়েকটি ইহজন্মে বর্ণ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায় সে সকল স্থানে বুঝিতে হইবে যে অসাধারণ অবস্থায় নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল মাত্র (exceptions to the general rule in extraordinary circumstances)। নচেৎ সকল যুগেই জন্মগত বর্ণ ব্যবস্থাই সাধারণ নিয়ম ছিল। এইরূপ ব্যবস্থাতেই প্রত্যেক বর্ণের কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অধিক।

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে হিন্দুরা দেবতার নিকট পাঁঠা বলি দেয় বলিয়া খুব নিন্দা করিয়াছেন। পাঁঠা বলি এবং আমিষ আহার এই দুইটি প্রথা পরস্পর সম্বদ্ধ। আমিষাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ইহা তত বেশী দোষাবহ নহে, তবে ত্যাগ করিতে পারিলে খুব ভাল। মনু বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

"মাংস, মদ্য ও মৈথুনে দোষ নাই। কারণ প্রাণীদের এইরূপই প্রবৃত্তি। কিন্তু এই সকল ত্যাগ করিতে পারিলে খুব উন্নতি হয়।"

মাংস ভক্ষণ যাহাতে সমাজে কমিয়া যায় এ জন্য শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, যজ্ঞে পাঁঠা বলি দিয়া মাংস ভোজন করিতে পার, নচেৎ বৃথা মাংস ভক্ষন করা মহাপাপ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে মাংসভক্ষণ একেবারে বর্জ্জন করিতে বলিলে কেহ কেহ শুনিতে পারে, কিন্তু সকলে শুনিবে না। যাহারা মাংস ভক্ষণ একেবারে ছাড়িতে পারিবে না, তাঁহাদেরও মাংস ভক্ষণ কমান প্রয়োজন। এজন্যই তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। হিন্দুধর্মের একটি নিয়ম এই যে তুমি যাহা কিছু আহার

করিবে পূর্বে ভগবানকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত্।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণং ॥

"যাহা কিছু করিবে, আহার, হোম, দান, তপস্যা,—সকলই আমাকে অর্পণ করিবে।"

মাংস ভোজন করিবার সময়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। বৈষ্ণবগণ আমিষাহার করেন না, তাঁহারা পশু বলিও দেন না। শাক্তগণ আমিষাহার করেন, তাঁহারা পশু বলি দেন। প্রবৃত্তিভেদে অধিকারভেদের ব্যবস্থা আছে। পশুবলি প্রথা সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে আমিষ ভোজন অন্য জাতি অপেক্ষা কম, ইহা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করিবেন না। যদি পশুবলি অনিষ্টকর হইত তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে আমিষ ভোজন প্রথা অন্য জাতি অপেক্ষা বেশী প্রচলিত হইত। পশু বলি দেয়, অতএব হিন্দুরা অতি পাষণ্ড, মুখে এ কথা বলিব, অথচ আমিষ আহার করিব, ইহাতে পশুর প্রতি যতটা করুণা দেখান হয়, তাহা অপেক্ষা পরধর্ম্মে নিন্দার প্রবৃত্তি বেশী পরিমাণে প্রকাশ করা হয় না কি?

আমাদের দেশ অনেক দুঃখ পাইতেছে তাহা স্বীকার করি, তাহার কারণও আছে তাহা মানি। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি এবং হিন্দুর শাস্ত্র মানিবার প্রবৃত্তিকে যদি রবীন্দ্রনাথ ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহার এ নির্দ্দেশ বিচারসহ নহে। বহুদিন ধরিয়া হিন্দু যখন ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনও হিন্দু এই সকল শাস্ত্রই মানিত, এই ধর্ম্মই পালন করিত। কালিদাসের যুগ হিন্দুর সব দিক দিয়া গৌরবের যুগ, সে সময় কোন আদর্শ উচ্চ করিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা কালিদাস নিজে এ ভাবে বলিয়াছেন,—

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাৎ আমনোঃ বর্ত্মনঃপরং।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥"

মনুর সময় হইতে যে পথ কাটা হইয়াছিল তাহা হইতে এক বিন্দুও বিচলিত না হওয়াই রাজা ও প্রজা উভয়েরই গৌরবসূচক ইহাই কালিদাসের মত। উচ্চ নীতি সম্পদে হিন্দুধর্ম কোন ধর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইবেন হিন্দুধর্ম হিন্দুর অধঃপতনের কারণ নহে, হিন্দুধর্মে অবহেলাই হিন্দুর পতনের কারণ।

(ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩৯)

পাশ্চাত্যমতে বেদের আলোচনা

আমাদের দেশের ইংরাজ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ হইতে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তমত পোষণ করেন। কারণ বেদ বড় দুরূহ গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুদের সাধনা এবং রীতি-নীতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু পরিমাণে অজ্ঞ। দুঃখের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভ্রমগুলি ইংরাজশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেন তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ডাক্তার উইণ্টারনিজ্ (Dr. Winternitz) এর কয়েকটি মত আলোচনা করিব। এই সকল মত যে কেবলমাত্র ডাক্তার উইণ্টারনিজই পোষণ করেন তাহা নহে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই এতদনুরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। যে

সকল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় পণ্ডিত বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও সাধারণতঃ এই সকল মত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ডাক্তার উইণ্টারনিজের মতগুলি আলোচনা করিবার কারণ এই যে, অধুনা সংস্কৃত বিদ্যায় পণ্ডিত পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে ডাক্তার উইণ্টারনিজ একজন অগ্রণী। তাঁহার প্রণীত জার্মাণ ভাষায় লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (History of Sanskrit Literature) বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বেদের ধর্মকে polytheism বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন * অর্থাৎ তাঁহার মতে বেদের ধর্মে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা নাই। কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা বেদে বহু স্থানে আছে। এই কথা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বিচার করা প্রয়োজন, বেদ কাহাকে বলে ? মহর্ষি আপস্তম্ব তাঁহার যজ্ঞসূত্রপরিভাষা নামক গ্রন্থে বেদের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্ববাদিসম্মত। সে সংজ্ঞা এই—মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের নাম বেদ। বিখ্যাত দশ উপনিষদের মধ্যে অধিকাংশ উপনিষদই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। একটি উপনিষদ (ঈশোপনিষদ্) মন্ত্রভাগের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দশটি উপনিষদ্ই যে বেদের অন্তর্গত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল উপনিষদ এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ। ডাক্তার উইণ্টারনিজও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

* History of Sanskrit Literature ৭৬ পৃষ্ঠা

তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উপনিষদ বাদ দিয়া বেদের অবশিষ্ট অংশে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা নাই। কিন্তু ইহাও ভুল। উপনিষদ্ ব্যতীত ও বেদের বহুস্থলে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কথা আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদকেই বেদের প্রাচীনতম অংশ বলিয়া মনে করেন। আমরা ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন ইহাতে একেশ্বর-বাদতত্ত্ব কিরূপ পরিস্ফুট।

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি

ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ—ঋগ্বেদ সংহিতা ২।৩।৩২

"ব্রাহ্মণগণ সেই এক তত্ত্বকে বহু প্রকার নাম দিয়াছেন; ইন্দ্র, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) এই সকল নামে তাঁহাকে অভিহিত করেন।"

হিরণ্যগর্ভসূক্ত (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০-১২১) হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ

"দেবগণ যে ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন।"

মহিত্বা এক ইদ্ রাজা জগতো বভুব

"তিনি নিজ মহিমায় জগতের রাজা হইলেন।"

যো দেবেষু অধি এক দেব আসীৎ

"যিনি সকল দেবতার উপরে এক দেবতা ছিলেন।"

পুরুষসূক্তে (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০-৯০) উক্ত হইয়াছে—

পুরুষ এব ইদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যৎ চ ভব্যং

"যাহা কিছু হইয়াছে যাহা কিছু হইবে, এই সবই পুরুষ (ঈশ্বর)।"

ঋগ্বেদের আরও অনেকস্থলে ঈশ্বরের কথা আছে। যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদেও সে কথা বহুস্থলে আছে। সুতরাং উপনিষদ বাদ দিয়াও বেদের অপর অংশে ঈশ্বরের কথা নাই ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

অতএব ডাক্তার উইণ্টারনিজের এই যে মত—বেদে ঈশ্বরের কথা নাই—ইহা সমর্থন করিতে হইলে কেবলমাত্র উপনিষদগুলি বাদ দিলে চলিবে না, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সর্বত্র যেখানে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে (বহু-সংখ্যক স্থানেই ইহা আছে) সে সকল অংশই বাদ দিতে হইবে। ইহা কেমন বিচার পদ্ধতি ? যেমন একজন বলিলেন—"সকল গাভীর বর্ণই শ্বেত" এবং তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য লাল ও কালবর্ণের যত গাভী আছে, সেগুলি সব বাদ দিতে বলিলেন।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ (এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতগণ) বেদকে যে ঈশ্বরবাদহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে বেদে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অনেক দেবের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোনও রাজ্যে যদি কতকগুলি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ থাকেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যায় না—সে দেশে রাজা নাই। বেদে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে সত্য ; ইহাও উল্লেখ আছে যে এই সকল দেবতার পূজা করিলে নানাবিধ অভীষ্ট লাভ হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই সকল দেবতার অধীশ্বর এক সর্বশক্তিমান পুরুষ নাই ? বিশেষতঃ বেদে যখন বহুস্থানেই এরূপ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা আছে। এই সকল পণ্ডিত স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লইয়াছেন যে কেহ যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিশ্বাস করে তাহা হইলে সে বিবিধ দেবতায় বিশ্বাস করিতে পারে না। বোধ হয় খৃষ্টানধর্মে এই সকল দেবতার কথা নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরূপ মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত।

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সকল আচার্য্য বলিয়াছেন যে অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ অলৌকিক বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় না। পরমেশ্বর এবং দেবদেবী, এই সকল অলৌকিক

তত্ত্ব। সুতরাং এ সকল বিষয়ে হিন্দুর পক্ষে বেদই প্রমাণ। বেদে বলা হইয়াছে যে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ইন্দ্রাদি দেবগণ আছেন। এজন্যই হিন্দুগণ ইহা বিশ্বাস করে। এই তত্ত্বের মধ্যে কিছুই অযৌক্তিক নাই। বাইবেলে পরমেশ্বরের কথা আছে, কিন্তু পরমেশ্বরের অধীন অপর দেবগণের কথা নাই (যদিও দেবদূতের কথা আছে) এজন্য খৃষ্টান ধর্মমতের সহিত মিলাইয়া যে আমাদের ধর্মমত গঠন করিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। অনেক বিষয়ে (যথা পুনর্জন্ম এবং কর্মফল) খৃষ্টানধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম যে অনেক বেশী উন্নত ইহা সর্ববাদিসম্মত। দেবতত্ত্ব বিষয়েও হিন্দুধর্ম খৃষ্টানধর্ম অপেক্ষা উন্নততর।

এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অধীন অনেকগুলি দেবতা থাকিলে তাহাকে polytheism বলা যায় না। যে ধর্মমতে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নাই, কতকগুলি স্বতন্ত্র দেবতা আছেন তাহাকেই polytheism বলা হয়। অধ্যাপক হেন্‌রি ষ্টিফেন্ বলিয়াছেন যে, অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেবতার উপর এক জন ঈশ্বর রাজত্ব করিলে তাহা এক প্রকার একেশ্বরবাদ (monotheism) ("problems of Metaphysics" ২৬৪ এবং ২৬৫ পৃষ্ঠা)। বেদের ধর্মমত এই যে ঈশ্বর কেবল অপর দেবগণের অধিপতি নহেন, তিনি অপর দেবগণকে নিজ দেহ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অপর দেবগণের অন্তর্য্যামী হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন। সুতরাং বেদের ধর্ম-মতকে অবশ্যই একেশ্বরবাদ বলিতে হইবে।

ডাক্তার উইনটারনিজের ধারণা এইরূপ যে—নির্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতে পারে না। এই ধারণা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাঁহারা এক পরমেশ্বরের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা এরূপ নির্বোধ হইতে পারে না যে বহু দেবদেবী বিশ্বাস করিবেন—অথবা মনে করিবেন যে বৈদিক যজ্ঞ করিয়া কেহ স্বর্গে যাইতে পারে। এজন্যই তিনি

লিখিয়াছেন—ঋগ্বেদের কোনও কোনও মন্ত্রে দেবদেবীর অস্তিত্বে এবং যজ্ঞের কার্য্যকারিতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে এবং এইসকল অবিশ্বাসী ব্যক্তির চিন্তা হইতে অবশেষে উপনিষদের উৎপত্তি হইয়াছিল।* এই প্রসঙ্গে ডাক্তার উইণ্টারনিজ্‌ যে বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন (ঋগ্বেদ ২।১২ এবং ৮।১০০) তাহাতে ইহা বলা হইয়াছে বটে যে কেহ কেহ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতায় বিশ্বাস করে না; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে এই ব্যক্তিরা ভ্রান্ত। এই সকল অবিশ্বাসী ব্যক্তি যে বেদের কোনও অংশ রচনা করিয়াছিলেন অথবা উপনিষদের রচনার সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেল একথা বেদে কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। অবিশ্বাসী ব্যক্তির কেবলমাত্র উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এই সকল অবিশ্বাসী ব্যক্তি বেদের মন্ত্র এবং উপনিষদ রচনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। বেদের যে সকল স্থলে সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কথা আছে সে সকল স্থানে অন্য দেবগণের কথা এবং যজ্ঞের কথা আছে, ঐ সকল মন্ত্রের রচয়িতা যে দেবতত্ত্বে এবং যজ্ঞের সার্থকতায় বিশ্বাস করিতেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। পূর্বে আমরা হিরণ্যগর্ভসূক্ত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে—দেবগণ সেই পরমেশ্বরের আদেশ পালন করেন (উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ)।

* "...In some of the hymns of the Rigveda doubts and scruples arose concerning the popular belief in gods and the priestly cult. These sceptics and thinkers. these first philosophers of ancient India certainly did not remain isolated" (History of Sanskrit Literature, pages 226 and 227)

"When the Brahmanas were pursuing their barren sacrificial science, other circles were engaged upon those highest questions which were at last treated so admirably in the Upanishads" (ঐ পুস্তকের ২৩১ পৃষ্ঠা)

স্মৃতরাং হিরণ্যগর্ভসূক্তের রচয়িতা যে দেবগণের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঐ সূক্তেই ইহাও বলা হইয়াছে যে সেই পরমেশ্বর দেবগণের উপর অধিপতি হইয়া থাকেন (যো দেবেষু অধি একদেব আসীৎ)। পুরুষসূক্তেও পরমেশ্বরের কথা আছে এবং দেবগণের উৎপত্তির কথা আছে, এবং যজ্ঞের কথাও আছে। উপনিষদেও দেবগণের কথা এবং যজ্ঞের কথা আছে। 'কেন' উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে দেবাসুরের সংগ্রামে দেবগণ বিজয়লাভ করিবার পর ব্রহ্ম দেবগণের সমীপে জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দেবগণ প্রথমে অগ্নিকে পরে বায়ু ও ইন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন—এই জ্যোতির্ম্ময় বস্তু কি তাহা জানিবার জন্য। কঠ উপনিষদে নচিকেতা যমের নিকট গিয়াছিলেন —যম নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যার উপদেশ দিলেন, যে অগ্নি উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ করা যায়। সুতরাং এখানেও যে দেবগণের অস্তিত্বে এবং যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবসর নাই। অন্যান্য উপনিষদগুলি আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে বহু স্থলেই দেবগণের কথা এবং যজ্ঞের কথা আছে। ফলতঃ যে সকল বেদমন্ত্রে পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সে সকল মন্ত্রের রচয়িতা এবং উপনিষদের ঋষিগণ যে দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ হয় ইহাও বিশ্বাস করিতেন—এ বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবসর নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে এ বিষয়ে ডাক্তার উইণ্টারনিজের বিপরীত কল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বৈদিক যজ্ঞের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ তিনি এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

উপনিষদের বাণী এইরূপ; দেবগণ আছেন ইহা সত্য; বেদবিহিত যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের আরাধনা করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহাও সত্য; কিন্তু সে স্বর্গবাস যত দীর্ঘকালের জন্যই হউক না কেন, একদিন স্বর্গবাস শেষ

হইবে—তখন আবার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ; অতএব যজ্ঞদ্বারা দেবগণের আরাধনা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে না ; কিন্তু মোক্ষলাভ করিলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করা যায় ; অতএব ব্রহ্মকে জানিয়া মোক্ষলাভের জন্য চেষ্টা করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

তদ্ যথা ইহ কর্মজিতো লোক ক্ষীয়তে।
এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।

"যেমন কর্মদ্বারা ইহলোকে যাহা কিছু লাভ করা যায় একদিন তাহার ক্ষয় হয়, সেইরূপ যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি যাহা লাভ করা যায় একদিন তাহারও ক্ষয় হয়।"

শ্বেতাশ্বর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হয়নায়।

"কেবল তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় ; মোক্ষলাভের অপর কোনও উপায় নাই।"

গীতায় সকল উপনিষদের সার ভাগ লিখিত হইয়াছে। গীতাতেও এই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপা পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

"বেদবিদ্গণ সোম পান করিয়া পাপমুক্ত হন এবং যজ্ঞদ্বারা আমারই

আরাধনা করিয়া স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যময় ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবোচিত সুখভোগ করেন।"

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্ম্ অনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে॥

"তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া যখন পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যায় তখন মর্ত্ত্যলোক প্রবেশ করেন। যাঁহারা বেদের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করেন তাঁহারা সকামচিত্তে এইভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যাতায়াত করেন।"

অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

"মহাত্মাগণ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় এবং দুঃখের আলয় ও অনিত্য পুনর্জন্ম আর প্রাপ্ত হয় না।"

হিন্দুধর্মের এই সার উপদেশ বেদ উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে। ধর্মশাস্ত্রের সহিত যে সকল হিন্দুর সামান্য পরিচয় আছে তাঁহারাও এই তত্ত্বের সহিত সুপরিচিত। এই জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজিশিক্ষিত পণ্ডিতগুলি হিন্দু হইয়াও এই সহজ তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যান এবং গ্রন্থ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া ইহার বিপরীত মতই প্রচার করেন। . . .

ডাক্তার উইণ্টারনিজ মনে করেন যে হিরণ্যগর্ভস্থক্তে দেবগণের অস্তিত্বে এবং যজ্ঞের কার্য্যকারিতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ-সূক্তে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে হিরণ্যগর্ভ সকল দেবতার অধিপতি, দেবগণ

তাঁহার আদেশ পালন করেন, সুতরাং এই সূক্তে দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা কিছুতেই বলা যায় না। এই সূক্তের প্রত্যেক শ্লোকের শেষে আছে—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"। ডাক্তার উইণ্টারনিজ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—"কোন্ দেবতাকে ঘৃত দ্বারা পূজা করিব" এবং বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ এই যে অন্য দেবতাকে পূজা করিয়া কোনও ফল নাই। কিন্তু সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে এখানে "ক" শব্দের অর্থ প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ এবং এই পংক্তির অর্থ এই যে "প্রজাপতিকে আমরা হবিঃ দ্বারা পূজা করিব।" হিরণ্যগর্ভসূক্তে বলা হইয়াছে যে হিরণ্যগর্ভ সকল ভূতের অধিপতি, সকল দেব তাঁহার আজ্ঞা-পালন করেন ইত্যাদি। সুতরাং এই সূক্তে ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত হয় যে আমরা হিরণ্যগর্ভের পূজা করিব। একজন রাজা আছেন—অতএব আমরা রাজপুরুষকে সম্মান করিব না—ইহা বলাও যেমন যুক্তিযুক্ত—পরমেশ্বর আছেন অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিব না—একথা বলাও সেইরূপ যুক্তিযুক্ত। অতএব ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তদপেক্ষা সায়ণাচার্য্যের অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ইন্দ্রাদি দেবগণ নাই অথবা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা নিষ্ফল—ইহা হিরণ্যগর্ভসূক্তের অর্থ কখনও হইতে পারে না। এ বিষয়েও ডাক্তার উইণ্টারনিজের মত ভ্রান্ত।

বৈদিক যজ্ঞের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ডাক্তার উইণ্টারনিজ আর একটা ভ্রান্ত উক্তি করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে সৎ ও অসৎ সকল কর্ম ত্যাগ করিতে হয় ("**In order to attain the highest object—Brahma—it is necessary to give up all work, good as well as bad**")। সন্ন্যাস আশ্রমে সকল কর্ম ত্যাগ করিবার কথা আছে বটে কিন্তু সাধারণতঃ

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বাণপ্রস্থ আশ্রমের পর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমে ঐ আশ্রমদ্বয়ের বিহিত কর্ম সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়। গার্হস্থ্য আশ্রমে যজ্ঞ করা প্রয়োজন। ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—"বিহিত কর্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়াই এক্ শত বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে।" কঠোপনিষদে দেখিতে পাইবে—যম নচিকেতাকে প্রথমে যজ্ঞ করিতে শিখাইয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলেও কর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন—কর্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে সহস্র উপদেশ লাভ করিলেও জ্ঞানের উদয় হয় না। উপনিষদের যে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত তাহা মহর্ষি বেদব্যাস "সর্বাপেক্ষা হি যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববদ্" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৬) এই সূত্রে স্থাপিত করিয়াছেন। গীতাতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যম্ এব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥১৮।৫

"যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে—অনুষ্ঠান করা উচিত। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে।"

যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তিনি কর্ম ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ লোক একান্ত বিরল। সাধারণ লোক শাস্ত্রীয় কর্ম পরিত্যাগ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না—সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদে পুনর্জন্মের কথা নাই (তাঁহার গ্রন্থের ৭৮ ও ৭৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে)। ইহাও যথার্থ নহে। 'অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণঃ' 'এবং অবর্ত্ত্যা শুন অন্ত্রাণি পেচে' (ঋগ্বেদ-

সংহিতা ৩-৫) এই দুইটি মন্ত্রে পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে। এখানে ঋষি ব্যাসদেব তাঁহার পূর্বজন্মের কথা বলিয়াছেন—যখন দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কুকুরের অন্নপাক করিয়াছিলেন। ডাক্তার উইণ্টারনিজ তাঁহার গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের অনুবাদ দিয়াছেন (১০, ১৬, ১—৬)। যেখানে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে "যাও, তোমার কর্ম অনুসারে স্বর্গ, পৃথিবী, জল বা উদ্ভিদের মধ্যে যাও।" এখানেও পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে।

তাঁহার গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদের সময় জাতি-ভেদের উৎপত্তি হয় নাই। অথচ তিনি লিখিয়াছেন যে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি ইহা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু ঋগ্বেদ কয়েকস্থলেই ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে (যথা ৫-৭-৪, ১-১০-২, ৮-৭৮-৩, ৮-৩-২৬, ৮-২৫-৩)। অধিকন্তু অথর্ববেদের বহুস্থানে চারিবর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ডাক্তার উইণ্টারনিজ নিজেই বলিয়াছেন যে অথর্ব বেদের ভাষা ও ছন্দ ঋগ্বেদের ভাষা ও ছন্দ হইতে বিভিন্ন নহে অর্থাৎ অথর্ববেদ ঋগ্বেদের ন্যায়ই প্রাচীন। সুতরাং বৈদিকযুগে জাতিভেদ ছিল না ইহা সত্য নহে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে নীতির উপদেশ নাই বলিয়া ডাক্তার উইণ্টারনিজ খুব নিন্দা করিয়াছেন। অনেকগুলি উপনিষদ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত, তাহাতে বহু নীতি উপদেশ আছে; মন্ত্রভাগেও নীতি উপদেশ আছে। বেদের মর্ম জানিতে হইলে মন্ত্র, উপনিষদ প্রভৃতি সকল অংশের আলোচনা করা প্রয়োজন। মন্ত্র ও উপনিষদ অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণের মধ্যে নীতি উপদেশ নাই বলিয়া নিন্দা করা তাঁহার সমীচীন হয় নাই। বিশেষতঃ তিনিই বলিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞ করিবার বিস্তারিত বিবরণই দেওয়া হইয়াছে—কিরূপে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, যজ্ঞপাত্রগুলি কিরূপ

হইবে, কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতে হয় ইত্যাদি। বেদের এই অংশে নীতি উপদেশ না থাকা দোষাবহ হয় না। পদার্থবিজ্ঞান (Physics) সম্বন্ধে একটি বই পাঠ করিয়া কেহ যদি নিন্দা করেন—"ইহাতে একটিও নীতি কথা নাই"—তাহা হইলে তাঁহার উক্তি যেরূপ সঙ্গতিবিহীন হয়—এ বিষয়ে ডাক্তার উইণ্টারনিজের উক্তিও সেইরূপ হইয়াছে।

তাঁহার গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় বেদের সৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে এই বিবরণগুলির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য নাই একটি বিবরণে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতি অগ্নি সৃষ্টি করেন—তাহার পরে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন, তাহার পর সূর্য্য, তাহার পর বায়ু। আর এক বিবরণে উক্ত হইয়াছে যে তিনি পক্ষী, সর্প ও স্তন্যপায়ী জন্তু সৃষ্টি করেন। তৃতীয় বিবরণে বলা হইয়াছে যে তিনি তাঁহার মন হইতে মানব, চক্ষু হইতে অশ্ব, প্রাণবায়ু হইতে গাভী, কর্ণ হইতে মেষ এবং স্বর হইতে ছাগ সৃষ্টি করেন। আবার অপর বিবরণে উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি নিজেই সৃষ্ট হইয়াছিলেন অথবা সৃষ্টি জল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল অথবা শূন্য হইতে অথবা ব্রহ্ম হইতে। ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই সকল বিবরণকে পরস্পর-বিরোধী মনে করেন।

কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ এই সকল বিভিন্ন স্থলে উক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া এইরূপ দাঁড়াইবে; প্রলয়ের সময় কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না (শূন্য ছিল); তাহার পর জল সৃষ্টি হয়; তাহার পর প্রজাপতি; প্রজাপতি অগ্নি (দেবতা), উদ্ভিদ, সূর্য্য, বায়ু (দেবতা), পক্ষী, সর্প, স্তন্যপায়ী জীব (যথা মানব, অশ্ব, গাভী, মেষ, ছাগ)—এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উইণ্টারনিজের উল্লিখিত বিভিন্ন বিবরণগুলি এইভাবে একটি সম্পূর্ণ বিবরণের বিভিন্ন অংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনও পরস্পর বিরোধ থাকিবে না।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন যে সমগ্র উপনিষদের মধ্যে একটি দর্শনশাস্ত্র আছে ইহা বলা যায় না অর্থাৎ উপনিষদের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী মত পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার ভ্রম। সমগ্র উপনিষদে একটিই দর্শনশাস্ত্র আছে—তাহা বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত ইহাই হিন্দু-ধর্মের ভিত্তি। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এই বেদান্তদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উপনিষদের যে সকল বিভিন্ন অংশে আপাততঃ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি তাহাদের মধ্যে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ডাক্তার উইণ্টারনিজ উপনিষদের কোন্ অংশগুলি পরস্পর বিরোধী মনে করেন তাহা উল্লেখ করেন নাই।

উপনিষদের 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যের ডাক্তার উইণ্টারনিজ যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় যে তিনি উপনিষদের মর্ম কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই বাক্যে 'তৎ' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম; 'ত্বম্' শব্দের অর্থ জীব। আচার্য্য শঙ্করের মতে এই বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে; আচার্য্য রামানুজ বলেন—এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম জীবের আত্মস্বরূপ। মতই গ্রহণ করা যাউক এই বাক্যে যে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই বাক্যের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"জগতের যতটুকু সম্বন্ধে তুমি সচেতন ততটুকুরই অস্তিত্ব আছে"। তৎ ত্বম্ অসি—এই বাক্য হইতে এই অর্থ পাওয়া যায় না। উপরন্তু অর্থটি একপ্রকার যুক্তিহীন প্রলাপ। জগতের যে অংশ সম্বন্ধে আমি সচেতন অপর এক ব্যক্তি তাহা সম্বন্ধে সচেতন নহে; আমি ১০ বৎসর পূর্বে যাহা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম এখন তাহা সম্বন্ধে সচেতন নহি। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে আমাদের জ্ঞান অনুসারে জগৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন জগৎ বিদ্যমান আছে।

এই সিদ্ধান্তগুলি যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা সহজ বুদ্ধি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ উপনিষদের সারতত্ত্ব এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—"জগৎই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই আত্মা"। ইহাও ভুল। উপনিষদে বহু স্থানে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কিন্তু জগৎ ইন্দ্রিয়গোচর। সুতরাং জগৎকে কিরূপে ব্রহ্ম বলা যায়? অধিকন্তু জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ব্রহ্ম পরিবর্ত্তন-হীন, নির্বিকার। বস্তুতঃ জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছেন। উপনিষদের যে বাক্য পড়িয়া ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই ভ্রমে পড়িয়াছেন সে বাক্যটি এই—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম, কারণ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেই অবস্থান করে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়। এ বাক্যের অর্থ এরূপ নহে যে জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বেদে ইহা বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম জগৎকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান থাকেন—

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি
ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি

"বিশ্বের সমুদয় ভূত তাঁহার এক অংশ, তাঁহার অপর তিন অংশ অমৃত—তাহা দ্যুলোকে অবস্থান করে।"

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়াবুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

"ইনি সর্বভূতের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া অবস্থান করেন, প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শিগণের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ইনি প্রকাশিত হন।"

ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে নিহিত আছেন, আবার তাহার

বাহিরেও অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং জগতের দৃশ্যমান পদার্থগুলিকে ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিলে ভুল হইবে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" সমগ্র বাক্যটিতে যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। বাক্যটির "তজ্জলাম্" এই অংশ বাদ দিয়া কেবলমাত্র "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এই অংশটিতে অর্দ্ধ সত্য মাত্র প্রকাশিত হইতেছে। অর্দ্ধ সত্য প্রায়ই ভুল হয়।

এইভাবে উপনিষদের সর্বজনবিদিত কথাগুলি পর্য্যন্ত ডাক্তার উইণ্টারনিজ বুঝিতে পারেন নাই। অথচ অতিশয় বিজ্ঞভাবে বেদ ও উপনিষদের নানা প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। শোপেনহয়ার, ডয়সেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় উপনিষদের যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন, ডাক্তার উইণ্টারনিজ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বেদের কোনও কোনও অংশ "নির্বোধ এবং অর্থহীন" (foolish and nonsensical—page 149). এমন কথাও বলিয়াছেন যে বেদের কোনও কোনও অংশ উন্মাদের রচনা বলিয়া বোধ হয় (১৮২ পৃষ্ঠা)। তিনি বেদের যে অংশ বুঝিতে পারেন নাই, সেই অংশগুলি দম্ভ এবং অহঙ্কার হেতু এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

মনুসংহিতার দোষ দিয়া তিনি বলিয়াছেন—যদিও বেদে দেখা যায় যে স্বামী ও স্ত্রী একত্র যজ্ঞ করিতেছে তথাপি মনু বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। এখানেও তিনি মনুর নিষেধের মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। মনুর উদ্দেশ্য এই যে স্ত্রীলোক পুরোহিতের কার্য্য করিবে না। কারণ বেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে যজ্ঞ করিবার সময় ভুল হইতে পারে এবং ভুল হইলে অনিষ্ট হইবে। বেদে যেখানে বলা হইয়াছে স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া কোনও যজ্ঞ করিবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার সঙ্কোচ করা মনুর উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মনু ত গোড়াতেই বলিয়াছেন যে যেখানে তাঁহার বিধান বেদ-বিরোধী মনে হইবে সেখানে

বেদের বিধানই পালন করিতে হইবে—মনুর বিধান নহে। "শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"। অতএব ডাক্তার উইণ্টারনিজ মনুর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া মনুকে বেদবিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন—ঋগ্বেদের মন্ত্র পড়িয়া দেখা যায় যে সে সময় রমণীগণ উৎসবের সময় প্রকাশ্যে বাহির হইতেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে বৈদিক যুগের পরে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। রামায়ণেও রমণীগণের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়মই লিপিবদ্ধ আছে ;—

ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রিয়ঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড ১১৪ অধ্যায়)

"বিপদের সময়, অভাবে, যুদ্ধে, স্বয়ম্বরে, যজ্ঞে এবং বিবাহে স্ত্রীলোককে দেখা গেলে তাহা দোষের বিষয় হয় না।"

আধুনিক হিন্দুসমাজেও এই প্রথাই বর্ত্তমান।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এইখানেই উপসংহার করা হইবে। পরিশেষে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন এই গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন, তখন গ্রন্থ হইতে এই সকল ভুল যাহাতে সংশোধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ ছাত্রগণের মধ্যে বেদ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত হইবার আশঙ্কা আছে। গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। গ্রন্থকারকে তাঁহার ভ্রমগুলি দেখাইয়া দেওয়া কবিবরেরও কর্ত্তব্য।

(ভারতবর্ষ বৈশাখ ১৩৪৩)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি

বর্ণাশ্রম-ধর্ম হিন্দু জাতির উপকার করিয়াছে না অনিষ্ট করিয়াছে, এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শূদ্র-ধর্ম" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরোধী তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাবলে এবং চিন্তাশীলতায় রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলির বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বিষয়টির গুরুত্ব অতিশয় বেশী। হিন্দুর আচার-ব্যবহার, ধর্ম কর্ম সকলই বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে কি কর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে ; এবং সে সকল শাস্ত্রবিধান বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রূপ ব্যবস্থাকে হিন্দু-সমাজ-সৌধের ভিত্তি বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু-সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম-রূপ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম ও সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য গভীর চিন্তার সহিত, ধীর ও সংযত ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি এই যে ইহা বংশগত। পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে পুত্রকেও যে শাস্ত্রব্যবসায়ী হইতে হইবে, ইহা তিনি যুক্তি সঙ্গত মনে করেন না। শাস্ত্র-চর্চ্চা করিবার জন্য বা ধর্ম জীবন

যাপন করিবার জন্য যেরূপ শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন, পুত্রের সেরূপ শক্তি ও সাধনা যদি না থাকে, তাহা হইলে পুত্রকে পিতার ন্যায় জীবন যাপন করাইবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মতে অনর্থক,—শুধু অনর্থক নহে, অনিষ্টকর। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, বা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, তা' ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হ'তেই পারে না।" কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সে সত্যটি এই যে পুত্রের মন ও বুদ্ধি পিতা-মাতার অনুরূপ হয়। পিতা-মাতার যেরূপ মতিগতি, পুত্র সেইরূপ স্বাভাবিক মতিগতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। একই প্রকারের মতিগতি যদি পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পুত্রের তদনুরূপ মতিগতি হইবার সম্ভাবনা আরও বেশী। পুত্র পিতামাতাকে যেভাবে জীবন যাপন করিতে দেখে, নিজের সেইভাবে জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি হয়। এই সকল কারণে যদি পুত্রের শৈশব হইতে পিতামাতা যত্নপূর্ব্বক নিজ বিদ্যাবুদ্ধি এবং আচার ব্যবহার পুত্রকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কে কি ভাবে জীবন যাপন করিবে তাহা প্রথম হইতে স্থির করিয়া তদনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করাই সমীচীন। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইভাবে জীবন যাপন করুক, এরূপ ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না।

এই গেল সাধারণ বুদ্ধির কথা। আধুনিক সৌজাত্যবিজ্ঞান (Eugenics) সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও বলেন যে, বংশের মধ্য দিয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ লক্ষণগুলি সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। সন্তানের যে কেবল বাহ্য আকৃতি পিতামাতার অনুরূপ হয় তাহা

নহে, তাহার আন্তরিক বৃত্তিগুলিও পিতামাতার অনুরূপ হয়। অধিকন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যদি একপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তানের সেইরূপ বিশেষ বুদ্ধির স্বাভাবিক আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা বেশী। এরূপ হইবার কারণ মোটামুটি এই ভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে যে মানবদেহ অসংখ্য অণুকোষ দ্বারা গঠিত। আমরা যে সকল কার্য্য করি বা চিন্তা করি, সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তার ছাপ প্রতি অণুকোষের উপর পড়ে। যে বীজ হইতে পুত্রের জন্ম হয় তাহার মধ্যে এই অণুকোষ বিদ্যমান। এইজন্য সন্তানের বাহ্য আকৃতি এবং আন্তরিক প্রবৃত্তি সকল পিতামাতার অনুরূপ হয়। সৌজাত্যবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুক্ষেত্রে এই সকল তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া ইহাদের যথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুর বংশগত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এই সকল বিজ্ঞান-সম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। বংশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা—heredity and environment—এই দুইটি জিনিষের উপর সন্তানের চরিত্রের বিশেষত্ব নির্ভর করে। এই সত্যও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বংশগত করিবার পক্ষে অনুকূল। পিতামাতা যদি যথার্থ ব্রাহ্মণ হন এবং নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম-জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে সন্তানের শান্ত স্বভাব, আত্মসংযম, আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলি সহজাত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। শৈশব হইতে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পালিত হয়, তাহার প্রভাবে এই সকল গুণাবলি পুষ্টি লাভ করে ;—তাহার পিতা-মাতার জীবনে শান্তি, ধর্ম্মানুরাগ, ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রভৃতি দেখিয়া সেও ঐ সকলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। কারণ শৈশবে অনুকরণস্পৃহা অতিশয় বলবতী থাকে। পুত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলি যাহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, পিতা দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন এইরূপ আশা করা যায়। পিতা যেরূপ অনুরাগের সহিত নিজ জীবনের

সাধনা পুত্রকে অভ্যস্ত করাইতে চেষ্টা করিবেন, অন্যের পক্ষে ততদূর অনুরাগ স্বাভাবিক নহে। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, যে সকল কাজ "বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা সাধিত হইতে পারে" সেগুলিও বংশগত হওয়া উচিত। যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন—শক্তি ও সাধনা। এ কথা রবীন্দ্রনাথও উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন —"ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তা'র জন্য ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার।" আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বংশ বা **heredity**র প্রভাবে এইরূপ ব্যক্তিগত শক্তির আবির্ভাব হওয়া খুবই সম্ভব; এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা **environment**এর প্রভাব এইরূপ সাধনার অনুকূল।

ইহা সত্য যে কোনও কোনও স্থলে পুত্রের স্বভাব পিতামাতার স্বভাব হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলি নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম এই যে পুত্রের স্বভাব পিতামাতার স্বভাবের অনুরূপ হইবে। সামাজিক ব্যবস্থা সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করা সমীচীন। দুই এক স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে এই সামাজিক ব্যবস্থা সুফল প্রসব করিতে না পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সাধারণ নিয়ম অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থায় যে সুফল পাওয়া যাইবে, তাহা যথেষ্ট মূল্যবান। দুই চারি স্থলে সুফল না ফলিলে সামাজিক ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আসল জিনিসটি ম'রে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হ'য়ে উঠে' জীবন-পথের বিঘ্ন ঘটায়।" কিন্তু কাজ বংশ-গত হইলে যে আসল জিনিষটী মরিয়া যাইবার সম্ভবনা কম, ইহা আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহ অনিয়মিত হইলে বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত বংশের মিশ্রণের ফলে প্রত্যেক বংশের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব মন্দীভূত বা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী; এবং অবিচ্ছিন্ন বংশাবলীর মধ্য দিয়া

অনুরূপ চর্চ্চার ফলে "আসল জিনিষটি" সমধিক প্রাণময় এবং তেজস্বী হইবার সম্ভাবনাই অধিক। বংশপরম্পরা ধরিয়া যে সাধনা চলিয়া আসিয়াছে, সেই সাধনা যাহাতে সজীব থাকে, মানবের এইরূপ চেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয় যে ধর্ম্মের প্রাণ নাই, সেখানেও যে আচারের কোন মূল্য নাই এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত—ইহা সমীচীন মনে হয় না। অনেক সময় প্রাণশক্তি সুপ্ত থাকে, পরে অনুকূল অবস্থায় তাহা জাগ্রত হইয়া উঠে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে যখন জল হইতে তোলা হয়, তখন মনে হয়, তাহার প্রাণ নাই। কৃত্রিম নিংশ্বাস বহাইবার জন্য তাহার হাত তুলিয়া নামান হয়; এই ভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। সেইরূপ, যেখানে ধর্ম্মের প্রাণ নাই বলিয়া মনে হয়, সেখানেও আচার পালন করিবার ফলে প্রকৃত ধর্মভাব আবির্ভূত হইতে পারে।* বৈষ্ণবেরা যে বলেন নাম করিলেই মুক্তি হইবে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই, তাহার মধ্যেও এই সত্য নিহিত আছে। নাম করিয়া গেলে ভক্তি আসিবে, ভক্তি হইলে মুক্তি হইবে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্ম্মেই প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার নিয়ম আছে। হয়ত নির্দিষ্ট সময়ে মনে যথেষ্ট ভক্তির উদয় হইল না; অথাপি প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে যে প্রার্থনা করিবার কোন ফল নাই তাহা বলা যায় না। রবিবাবুর কথাতেই বলা যায়,

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ,

* তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন "আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ"—আচার পালন করিলে ধর্মভাব আবির্ভূত হয়।

তখনও হে দেব প্রণমি তোমায়,
গাহি বসে স্তব গান।
অন্তর্যামী ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন
ভক্তিবিহীন প্রাণ।

বীজকে রক্ষা করিবার জন্য তুষের যেরূপ প্রয়োজন, সাধনকে রক্ষা করিবার জন্য আচারের ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন। তুষটি শুষ্ক কঠিন এবং কর্কশ বটে, কিন্তু সেই কারণে কেহ যদি তুষটি ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তণ্ডুল হইতে নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। সাধনা বস্তুটি অতি শুষ্ক এবং কোমল, নিরাবরণ অবস্থায় সংসারে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহা অচিরাৎ শুকাইয়া যাইবে। তাহাকে বাঁচাইতে হইলে, তাহাকে প্রাণবান এবং সফল করিতে হইলে, আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আচারগুলিকে অর্থহীন বোঝা হ'য়ে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন; তিনি কি ইহাও দেখেন নাই যে, অনেক স্থলে বাহ্য আচার পরিত্যাগ করাতে সাধনার প্রাণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? রোমাণ ক্যাথলিকদের অনেক আচার প্রোটেষ্টাণ্টরা পরিত্যাগ করিয়াছেন; সেই সঙ্গে ধর্মের প্রভাবও কি প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে শিথিল হইয়া যায় নাই? মধ্যযুগে খৃষ্টানধর্ম্মযাজকদের মধ্যে St Francis of Assissiর ন্যায় যথার্থ সাধুপুরুষ অনেক দেখা যাইত। আজকাল প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে তত বেশী দেখা যায় না। গির্জায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ধর্মভাবের অভাবের দরুণ অনেক ধর্ম্মযাজক অনুযোগ করিয়া থাকেন। তাহার তুলনায় আমাদের তীর্থস্থানে নিরক্ষর দরিদ্র রমণীর মুখে যে পবিত্র ভাব, যে ভগবদ্ভক্তির আকুলতা দেখা যায়, তাহা কি সমধিক স্পৃহনীয় নহে? এক স্থানে আচার বর্জন, অপর

স্থানে আচার রক্ষা। উভয়ের ফলের পার্থক্য দেখিয়া সুধীগণ বিচার করিবেন কোনটি ভাল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান ক'রতে ছোটে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভাল লোককে বাহ্য শুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না।" সত্য কথা। এখানে "স্নান করা ভাল" এই আচারের অপব্যবহার হইয়াছে। *কিন্তু আচারটি কি খারাপ? মেয়েটির বুদ্ধি কম, ঘৃণা করিবার প্রবৃত্তি* প্রবল, তাই এই ভাল নিয়মটি সে খারাপ ভাবে দেখিয়াছে। সব ভাল নিয়মেরই অপব্যবহার হইতে পারে। ঈশ্বরের নামেরও ত অপব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু সেজন্য কি ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করা উচিত? দেখিতে হইবে নিয়মটি ভাল কি না; এই নিয়মের যে ভাল ফল হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অধিক, না যে খারাপ ফল হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অধিক? অনেক নিরপেক্ষ সমালোচকের মতে শারীরিক পরিচ্ছন্নতায় দরিদ্র হিন্দুরা অপর জাতির দরিদ্র লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। Is India Civilized এই পুস্তকে Sir John Woodroffe বলিয়াছেন, "প্রত্যহ স্নান করিবে এবং ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে" এই নিয়মটি ভারতবর্ষের নিকট য়ুরোপের শিক্ষা করা উচিত। শরীর পরিষ্কার রাখিবে, মন পবিত্র রাখিবে, হিন্দুধর্ম্মে এই দুইটি উপদেশই দিয়াছে। ইহার ফলে দেহ ও মন উভয়ই শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। যাহারা কেবল দেহকে পবিত্র করিয়া রাখে, তাহারাও একটা ভাল কাজ করে। তাহারা যদি অন্য অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা করে তাহা হইলে একটা অন্যায় কাজ করে, কিন্তু এ অন্যায় কাজের কারণ শাস্ত্রের উপদেশ নহে; ইহার কারণ তাহার মনে ঘৃণা নামে একটি দুষ্ট প্রবৃত্তি আছে। সে যদি শুচিবায়ুগ্রস্ত না হইত, তাহা হইলেও অন্য কারণে ভাল লোককে ঘৃণা করিত। আচার বংশগত হইলে যে এইরূপ ঘৃণার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকিবে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখা

যায় না ; রবীন্দ্রনাথও কোনও কারণ দেখান নাই। সকল ধর্মেই সমগ্র অনুশাসনের কিয়দংশ সহজ, কিয়দংশ কঠিন। কঠিন অংশ অপেক্ষা সহজ অংশ যে বেশীর ভাগ লোক পালন করিবে তাহা স্বাভাবিক। কঠিন অংশ বাদ দিয়া সহজ অংশ পালন করা—উভয় অংশ পালন না করা অপেক্ষা খারাপ নহে। যাহারা এরূপ করিবে তাহাদের অধিকাংশের মনে যে দম্ভ ও ঘৃণার উদ্রেক হইবে তাহা নহে। খুব অল্প সংখ্যকের মনেই হইবে। এই কুফলের জন্য ধর্মানুশাসন যে পরিমাণে দায়ী, ধর্মানুশাসনটি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সুফল প্রসব করিয়া থাকে।

পাছে আচারকে লোকে অত্যধিক আদর করে এবং উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করে, এজন্য হিন্দুধর্মশাস্ত্র যথেষ্ট সাবধান হইয়াছে। সাধনার পথে সাহায্য করে বলিয়াই আচার প্রয়োজনীয়, সাধনা সিদ্ধ হইলে আর আচারের প্রয়োজন থাকে না,—এ কথা হিন্দুধর্মে খুব স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে আচারের সবচেয়ে কড়াকড়ি, গার্হস্থ্য আশ্রমে ততদূর নহে, বানপ্রস্থ আশ্রমে অনেকটা শিথিল, সন্ন্যাস আশ্রমে প্রায় কিছুই নাই। সাধনার পথে লোকে যেমন অগ্রসর হয়, আচারের বাঁধন সেই পরিমাণে খুলিয়া দেওয়া হয়। হিন্দুর আরাধ্য মহাদেব শ্মশানে থাকেন, সর্বাঙ্গে ছাই মাখেন, গলায় সাপ জড়ান। শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়েও যে এ কথা জানে না তাহা নহে। আচারহীন সাধু সন্ন্যাসীকে সেও ভক্তি করে। তবে যে কোথাও ভাল লোককে অন্যায় ভাবে ঘৃণা করে, তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সে যাহাতে এরূপ না করে সেজন্য হিন্দুধর্ম্ম যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। বোধ হয় এরূপ সঙ্কীর্ণতা অপর ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মে কম। শুনিয়াছি বিলাতে যদি কেহ ধুতি পরিয়া পথে হাঁটে, লোকে তাহাকে পাগল করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে প্রথমে যিনি ছাতা লইয়া পথে হাঁটিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপ

দল-বাঁধা সঙ্কীর্ণতার উগ্র অত্যাচার আমাদের দেশে কম বলিয়াই মনে হয়।

যে সকল কাজ বুদ্ধিমূলক, কেবল সেই সকল কাজ বংশগত করিতে যে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন, তাহা নহে; যে সকল কাজ কেবল শারীরিক চেষ্টার উপর নির্ভর করে, সে সকল কাজও বংশানুক্রমিক করিতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরী করা, বা ঘানির তেল বের করা, বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়,—বরং তাতে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হ'য়ে আসে। এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন ক'রতে গিয়ে উপযুক্ত চিত্তও বাকী থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে একই কর্ম্মের পুনারাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক আজ ভারতের বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নাই। এই জন্যেই ভারতবর্ষের নিমকে জীর্ণ দেশফেরা ইংরেজ গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তা'রা বড় বেশী অনুভব করে।" হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করা প্রভৃতি দরিদ্রের উপজীবিকাকে রবীন্দ্রনাথ যতটা হীন বলিয়া মনে করিয়াছেণ, বাস্তবিক ইহারা ততটা হীন নহে। দরিদ্রের জীবিকা অবলম্বন করিলেও মানুষ যদি সৎপথে থাকে, ঈশ্বর-চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক হয়। চাকুরি ওকালতী প্রভৃতি তথাকথিত ভদ্রজনোচিত বৃত্তি অপেক্ষা দরিদ্রের জীবিকা অধিক অনিষ্টকর বা লজ্জাজনক নয়। আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়াছিল বলিয়াই তাহার এত দুর্গতি।

বাস্তবিক পক্ষে তথাকথিত ভদ্রবৃত্তিতে মনের যেরূপ অধোগতি হয় একঘেয়ে হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করা বা চরকা কাটাতে সেরূপ

অধোগতি হয় না। হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করার সময় শরীর একঘেয়ে পরিশ্রম হয় বটে, কিন্তু মন মুক্ত থাকে। চাকুরি ওকালতি প্রভৃতিতে মনের দাসত্ব প্রায় অনিবার্য্য। দেহের দাসত্ব অপেক্ষা মনের দাসত্ব অধিকতর শোচনিয়। মনের দাসত্ব হইলে কোন্ কাজ করা উচিত আমরা তাহার বিচার করি না, যে কাজ করিলে প্রভু খুসী হইবেন সেই কাজ করিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তখন আত্মসম্মানবোধ থাকে না; চাটুকারিতা, পরনিন্দা, প্রবঞ্চনা, পরের সর্বনাশ করিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। কুমার, তেলি, কামার, তাঁতীদের হৃদয় অনেকটা সরল থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বংশগত জাতিভেদের ফলে মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে। কিন্তু ইহা কি সত্য নহে যে, য়ুরোপের শ্রমজীবী অপেক্ষা ভারতের শ্রমজীবি মধ্যে ধর্মভাব বেশী? একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইংলণ্ডের একটি শ্রমজীবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যিশুখৃষ্টের বিষয় কি জান?" সে বলিয়াছিল, "তাহার নম্বর কত?"—অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট কত নম্বরের কুলি? আমাদের শ্রমজীবিগণ ধর্মবিষয়ে এতদূর উদাসীন নহে। ইংলণ্ডে বংশগত জাতিভেদ নাই, আমাদের আছে। অতএব জাতিভেদ বংশগত হইলে যে শ্রমজীবিদের বেশী অবনতি হইবে ইহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয় বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের দরিদ্র লোকেরা অন্য দেশের দরিদ্র লোক অপেক্ষা শান্ত, সংযত এবং ধর্মবিষয়ে উন্নত। ইহা অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ লোক আমাদের দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী লেখাপড়া জানে। কিন্তু বেশী লেখাপড়া শিখিলেই যে মনোবৃত্তি-সকল বেশী উন্নত হয়, তাহা নহে। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের মনের ভাব অন্যদেশের লেখাপড়া-জানা লোকদের মনের ভাব অপেক্ষা হীন নহে। পাশ্চাত্যদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, বেশী

টাকা রোজগার করা এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা ও বিলাসভোগই জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরাও জানে যে, এসকল জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ এসকল চিরকাল ভোগ করিতে পারা যায় না। ঈশ্বরকে লাভ করিলে যে সুখ হয় তাহা চিরস্থায়ী; অতএব ঈশ্বরলাভই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। রামায়ণ এবং মহাভারতের শিক্ষাপ্রদ গল্প, শুনিয়া ঈশ্বরের দয়া ও সর্ব্বশক্তিমত্তা, পার্থিব সুখসম্পদের অনিত্যতা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এসকল কথা আমাদের দেশের দরিদ্র নিরক্ষর সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে জানে। যাত্রা, কথকতা, সাধুসন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপদেশ, ভিখারী, বৈষ্ণব, এবং বাউলের গান, এইসকল উপায়ে ধর্মের বড় বড় তত্ত্বগুলি দরিদ্র ও নিরক্ষরের হৃদয় গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কৃষক গান শুনিয়াছে

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত—
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।

কলু শুনিয়াছে

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।

এই সকল গানের পদ অনেক শ্রোতার মন ঈশ্বরের দিকে "মোড় ফিরাইয়া" দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই সকল কাজেও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে চিত্ত চাই।" তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে বংশগতভাবে একই রকম কাজ করিয়া আমাদের শিল্পিদের চিত্তের অবনতি করিয়াছে; এইজন্য তাহারা শিল্পের নূতন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীন

ভারতে সকল প্রকার শিল্পবিদ্যা যে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। এবং প্রাচীন ভারতে বংশগত ভাবেই শিল্পচর্চ্চা হইত। অতএব বংশগত ভাবে শিল্পচর্চ্চা করিলে যে উন্নতি হইতে পারে না, ইহা যথার্থ নহে। আজকাল ভারতে শিল্পের অবনতি হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার কারণ প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা; শিল্পচর্চ্চা তাহার কারণ নহে। কার্পাস, পশম, রেশম কাষ্ঠ ধাতু প্রভৃতির উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের জন্য ভারত অতীতকাল হইতে বিখ্যাত। ভুবনেশ্বর, কোনারক এবং মাদুরা মন্দির, অজন্তা এবং এলোরার চিত্রও ভাস্কর্য্য আজমীরের বিগ্রহরাজ-নির্ম্মিত বিশ্ববিদ্যালয়, এ সকল যাহাদের কীর্ত্তি, তাহারা বংশগত ভাবেই শিল্পচর্চ্চা করিয়াছিল। গভীর চিন্তাশীল এবং স্বদেশের ঐকান্তিক উন্নতিকামী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে জাতিভেদ-প্রথা প্রাচীন ভারতের শিল্পে উৎকর্ষ-লাভের পথে বাধা দেয় নাই, সহায়ক হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "জাতিভেদ প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষের সমুদয় শিল্পকার্য্য বহুপূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত হইয়াছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ ১০৪ পৃঃ) পাশ্চাত্যদেশে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীতে অনেক "নূতনতর উৎকর্ষ" হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সকল উৎকর্ষে মানবজাতির কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়। কারণ এই সকল "নূতনতর উৎকর্ষ" কলকারখানার উপযোগী; কলকারখানাতে খুব দ্রুতভাবে দ্রব্য প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু কারখানার কার্য্য করিলে মানুষ কলের মত হইয়া যায়, উচ্চ মনোভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, পারিবারিক সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া সে নানা প্রলোভনে পতিত হয়। পাশ্চাত্যদেশে সস্তায় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ফলে আমাদের ন্যায় অনেক দেশের দরিদ্র লোকদের জীবিকার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে কলের নূতন উৎকর্ষ বাস্তবিক

বাঞ্ছনীয় কি না, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে কামার, কুমোর, তেলিরা বংশগত ভাবে একই কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের মত হইয়া যায়—ইহা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার বিপরীত অবস্থাটাই ঘটিয়া থাকে। কলকারখানায় কয়েক বৎসর কাজ করিলেই মানুষ কলের একটা অঙ্গের ন্যায় হইয়া যায়। কারণ, কল-কারখানাতে শ্রমজীবীকে কলের ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতে হয়; গৃহশিল্পে সেরূপ নহে। সেখানে শ্রমজীবী প্রভুর ন্যায়, এবং যন্ত্রগুলি তাহার সম্পূর্ণ অধীন। ইহাই স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিক ভাবে কাজ হইলে বংশপরম্পরাতেও শ্রমজীবীর অবনতি হয় না। কলের অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে অল্প দিনেই তাহাদের অবনতি হয়। একঘেয়ে কাজ করিলেই যে মনের অবনতি হয়, ইহা কুসংস্কার মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আজ ভারতে বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা।" কিন্তু ইহা সত্য নহে। ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষি বৈশ্যের কাজ। কৃষি এবং ব্যবসাতে বৈশ্যধম এখনও উচ্ছিন্ন হয় নাই। পরাধীন জাতির ক্ষাত্রধর্ম বিনষ্ট হইবে, ইহ বিচিত্র নহে। বাকী ব্রাহ্মণ। দেশ পরাধীন হইলে ব্রাহ্মণের স্বধমে টিকিয়া থাকা খুব কঠিন। ব্রাহ্মণের রাজদত্ত বৃত্তি এখন বন্ধ। পরাধীনতা ফলে দেশের অতিরিক্ত ঝোঁক পড়িয়াছে ইংরাজি শিক্ষার উপর; সংস্কৃ শিক্ষার যারপরনাই অনাদর হইয়াছে। ইহাতেও ব্রাহ্মণের জীবিক সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষার ফলে শিক্ষিত লোকেদে মধ্যে ধর্মকর্মে আস্থা অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে। তাহাতেও ব্রাহ্মণে জীবিকা বন্ধ। যে সকল জীবিকা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্ত্তব্যপালন সহজ হইত: সে সকল জীবিকা প্রায় বন্ধ হওয়াতে

ব্রাহ্মণকে অপর সকল জীবিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে; তাহার ফলে ব্রাহ্মণের নিজধর্ম পালন করা কঠিন হইয়াছে। তথাপি এখনও দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন,—নির্লোভ, পরোপকারী ঈশ্বরে নির্ভরশীল, দারিদ্র্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ। দেশের সুগভীর ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, শিক্ষিত লোকের নির্মম বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়াও, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত এখনও যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রণেপণে প্রাচীন আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক এবং প্রাচীন আদর্শের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতে যদি আবার কখনও সুদিন ফিরিয়া আসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যুগ্র আলোকের মোহে কাটাইয়া আবার যদি ভারতবাসী প্রদীপের স্নিগ্ধ আলেকে নিজের ঘরে জিনিসের যথার্থ আদর করিতে শিখে, তাহা হইলে যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আজিকার দুর্দিনে দৈন্যের অন্ধকার এবং বিদ্রূপের শিলাবর্ষণ সহ্য করিয়া বুকের রক্ত দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিতেছেন তাঁহাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। মহাত্মা গান্ধি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধী তাহা সত্য; কিন্তু তিনি যাহা স্বদেশের ত্রুটি মনে করেন তাহা নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রচার করেন, ইহা সর্বজনবিদিত। তিনি বলিয়াছেন,

I have not a shadow of doubt the Hinduism owes it all to the great traditions that the Brahmins have left for Hinduism. They have left a legacy for India which every Indian no matter to what **Varna** he may belong, owes a deep debt of gratitude. Having studied the history of almost every religion in the world it is my settled conviction that there is no other class in the world that has accepted poverty and

self effacement as its lot. * * * Even in this black age, travelling throughout the length and breadth of India, I notice that the Brahmins take the first place in self-sacrifice and self-effacement, * * * I wish to confess too that the Brahmins together with the rest of us have suffered a *fall*. They have set before India voluntarily and deliberatey the highest standard which a human mind is capable of conceiving, and they must not be surprized if the Indian world exacts that standard from them. The Brahmins have declared themselves, and ought to remain the custodians of the purity of our life.

Mahatma Gandhi's speech in Madras at the Seabeach on the 8th April 1921.

অনুবাদ :—আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু ভাল সে সকলেরই কারণ ব্রাহ্মণগণের গৌররময় কীর্ত্তিকলাপ। ব্রাহ্মণেরা যে সকল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুর গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মের ইতিহাস অধ্যায়ন করিয়া ইহা আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, পৃথিবীর আর কোন শ্রেণীর লোক দারিদ্র্য এবং স্বার্থোৎসর্গ নিজ ভাগ্য বলিয়া বরণ করিয়া লয় নাই। * * * এমন কি বর্ত্তমান অবনতির দিনে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, স্বার্থোৎস্বর্গ এবং স্বার্থবিলোপ বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। * * * ইহাও আমি স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি যে, অমাদের অন্য সকলের ন্যায় ব্রাহ্মণদের

ও পতন হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং গভীর চিন্তার পর ভারতের সম্মুখে এমন এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ মানব-মন কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং ভারতের লোকরা যদি তাঁহাদের নিকট সেই আদর্শ অনুযায়ী আচরণ প্রত্যাশা করে, তাহা হইলে তাঁহাদের আশ্চর্য্য হইলে চলিবেনা। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুর জীবনের পবিত্রতার রক্ষক বলিয়া নিজদিগকে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁদের তাহাই হওয়া উচিত ৮ই এপ্রিল ১৯২১ তারিখে মাদ্রাজনগরে সমুদ্রতটে মহত্মা গান্ধির বক্তৃতা।

বর্ণাশ্রমধর্ম স্মরণাতীতকাল হইতে বংশগত। ব্রাহ্মণদের যে গৌরবময় কীর্ত্তি-কাহিনী মহাত্মাজি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বংশগত বর্ণাশ্রমধর্মের সময় সম্ভব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের যে অবনতির কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহার কারণ বংশগত বর্ণাশ্রমধর্ম নহে; কারণ, তাহা হইলে তিন সহস্রবৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণ মহত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত না। সে অবনতি অধুনিক এবং তাহার কারণ প্রতিকুল রাজনৈতিক অবস্থা।

ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজ মহিলার নিকট ভারতের চাকরদের প্রশাংসা শুনিয়া রবিন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়াছেন; বলিয়াছেন, বংশানুক্রমে চাকর থাকিয়া তাহারা মনুষ্যত্ব-বর্জিত হইয়াছে, নীরবে লাথি-ঝাঁটা সহ্য করে, তাই প্রভুদের এত ভাল লাগে। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, বোধ হয় ইংরেজ মহিলা ভারতের চাকরদের লাথি-ঝাঁটা সহ্য করিবার ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন নাই—তাহারা বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ কষ্টসহিষ্ণু—এই সকল কথাই বোধ হয় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের ভৃত্য সচরাচর মুসলমান হয়, বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দু হয় না। সাংঘাই (Shaughai) সহরে একজন শিখ পুলিশ চীনীয়দিগকে

অন্যায় ভাবে তাড়ণা করিয়াছিল, আমেরিকার Nation পত্রে তাহার বিবরণ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং অনুমান করিয়াছেন যে, আমাদের শূদ্ররা বংশানুক্রমিক শূদ্র বলিয়া এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করে না। রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, শিখদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম নাই। অতএব বংশানুক্রমে শূদ্রত্ব করিয়া শিখদের এইরূপ প্রবৃত্তি হইয়াছে, একথা বলা যায় না। বিদেশী বেতনভূক সেনা বা পুলিশের লোক (merceneries) প্রায়ই অত্যাচারী হয়, ইতিহাসে তাহার বহু নিদর্শন আছে,—ইহাও তাহার অপর একটী নিদর্শন। ইহার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মকে দায়ী করা যায় না। হংকঙের (Hong Kong) এর পাঞ্জাবী পুলিশ রবীন্দ্রনাথের চক্ষের সম্মুখে একজন পুলিশ চীনীয়কে লাঞ্ছনা করিয়াছিল, সে শিখ কিনা রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখেন নাই। খুব সম্ভব সেও শিখ, কারণ ঐ সকল অঞ্চলে শিখ পুলিশই (প্রায় অবসর প্রাপ্ত সৈনিকেরা) গিয়া থাকে। ইহার জন্যও বর্ণাশ্রম ধর্মকে দায়ী করা যায় না। আর এ সকল দৃষ্টান্ত ক্ষাত্রধর্মের অপব্যবহার শূদ্রধর্মে নহে। সেনা বা পুলিশে কায করা ক্ষত্রিয়ের কাজ,—শূদ্রের নহে : "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজং"—পরিচর্য্যা শূদ্রের কায, শাসন করা শূদ্রের কায নহে। পাঠান সৈনিক বা পুলিশে যে মনোবৃত্তি লইয়া ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করে, শিখ পুলিশ সেইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া চিনীয়দের উপর অত্যাচার করে। যাহারা বেতনভুক হইয়া বিদেশে পুলিশ বা সৈনিকের কর্ম করিতে যায়, তাহাদের মনোভাব অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত হইয়া যায়। তাহাদের মনোভাব দেখিয়া দেশের সাধারণ লোকদের মনোভাব নির্ণয় করা উচিত নহে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেদের মধ্যে হিংস্রভাব অপর দেশে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা কম। আমাদের দেশের সাধারণ লোক অন্য সকল দেশের সাধারণ

লোক অপেক্ষা বেশী অভদ্র নহে। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়দের মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধি এ বিষয়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় বলিয়াছেন,——I ask you to accept the testimony given by Sir Thomas Munro, and I confirm that testimony, that the masses of India are really more cultured than any in the world অনুবাদ :—"স্যর টমাস্ মন্‌রো যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমি তাহা আপনাদিগকে গ্রহণ করিতে বলি, —এবং আমি সে সাক্ষ্য সমর্থন করি যে ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর অপর সকল দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য।" ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন।" (সামাজিক প্রবন্ধ ৩৭ পৃঃ) ভূদেববাবু পুনশ্চ বলিয়াছেন, "একজন বহুদর্শী ইংরেজের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল। অপর সকল সমাজের ছোট লোকেরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্যভাবাপন্ন।" (সামাজিক প্রবন্ধ) রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন:—From a careful survey and observation of the people and inhabitants of various parts of the country and in every condition of life, I am of opinion that the peasants or villagers who reside at a distance from large towns and head stations and courts of law are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever. &c.

(Quoted in Mr. P. N. Bose's National Education and Modern Progress. p. 41).

অনুবাদ ঃ—"দেশের বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, যে সকল কৃষক এবং গ্রামবাসী নগর এবং বিচারালয় হইতে দূরে বাস করে, তাহারা যে কোনও দেশের লোক অপেক্ষা কম নির্দোষ, সংযত এবং উন্নত-চরিত্র নহে।" এই সকল বিচক্ষণ ব্যক্তির মত হইতে প্রতীতি হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে শূদ্ররা বংশানুক্রমিক শূদ্র বলিয়া নিরীহ লোকদের উপর দুর্দান্ত এবং অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যথার্থ নহে।

গীতার "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্মো ভয়াবহঃ" এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোথাও বা বাক্যটিকে "স্বধর্মে হননং শ্রেয়" এই ভাবে বিকৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বাক্যটিরও তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, "ধর্ম্ম অনুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা যায়, তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তা'র কোন প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্"। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিজধর্ম্ম পালন করিবে, ইহাই গীতার উক্ত বাক্যটির উদ্দেশ্য। অর্থটির মধ্যে বিশেষ কিছু জটিলতা নাই। এই সহজ অর্থই সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ইহাদের কোনও বর্ণের কাজ কি সমাজে অপ্রয়োজনীয়? ব্রাহ্মণের কাজ সমাজকে সৎশিক্ষা দেওয়া, নিজে ধার্মিক হওয়া, এবং সাধারণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তার করা। ক্ষত্রিয়ের কাজ সমাজকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বৈশ্যের কাজ কৃষি বাণিজ্য, শূদ্রের কাজ পরিচর্য্যা। প্রত্যেক বর্ণের কাজই সমাজে প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন 'প্রয়োজন থাক্ বা

না থাক্ করতে হবে' এ কথা কেমন করিয়া উঠে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, চীন ও জাপান যদি য়ুরোপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, তাহা হইলে ভারতবাসী ইংরাজের ভৃত্য হইয়া চীন ও জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবে, কারণ ভারতবাসী কেবল শিখিয়াছে,—"শূদ্রের বহু যুগের দীক্ষা"—স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কিন্তু যুদ্ধ করা ত শূদ্রের দীক্ষা নয়, ক্ষত্রিয়ের দীক্ষা: বেতনভুক সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করাও ক্ষত্রিয়ের কাজ, শূদ্রের নহে। আরও এক কথা—শাস্ত্র ক্ষত্রিয়কে ন্যায় যুদ্ধই করিতে বলিয়াছে, অন্যায় যুদ্ধ করিতে বলে নাই—ধর্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। সকলেই জানেন যে, হিন্দুশাস্ত্র বরাবর বলিয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রেও ন্যায়, ধর্ম, দয়া, ক্ষমা এ সকল পরিত্যাগ করিবে না। এই সকল শাস্ত্রোপদেশ যে ক্ষত্রিয়রা পালন করিত না, তাহা নহে। প্রত্যুত যুদ্ধের সময়ও হিন্দুবীর এই সকল গুণাবলির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; তাহা দেখিয়া বৈদেশিকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। রাণা কুম্ভ মালব এবং গুর্জ্জরের মিলিত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া মালবরাজ মামুদকে বন্দী করিয়া চিতরে আনিয়া উপঢৌকন দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া Todd বলিয়াছেন, **Such is the character of the Hindu: a mixture of arrogance, political blindness, pride and generosity. To spare a prostrate foe is the creed of the Hindu cavalier, and he carries all such maxims to excess,**

. . .

অনুবাদ:—"হিন্দুর চরিত্র এইরূপ: দর্প, রাজনৈতিক অন্ধতা, অহঙ্কার এবং দয়ার সংমিশ্রণ। পরাস্ত শত্রুকে ক্ষমা করা হিন্দুর ধর্ম, এবং সে এই সকল ধর্মমতকে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুবর্ত্তন করে।" রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে হিন্দুর বর্ণ-বিশেষকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছে

বলিয়া হিন্দু অন্ধভাবে যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, ইহা যথার্থ নহে। চীন ও জাপান য়ুরোপের সহিত যুদ্ধ করিলে হয় ত বেতনভুক ভারতীয় সৈনিক ইংরাজের হইয়া লড়াই করিতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মের অনুশাসন তাহার কারণ নহে ; তাহার কারণ, সকল দেশেই এমন লোক পাওয়া যায়, যাহারা বেতন পাইলে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, সে আজ্ঞা ন্যায় বা অন্যায় তাহা বিচার করিবে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে বেতনভুক মুসলমান সৈন্য ইংরাজের ও ফরাসীর হইয়া তুর্কীর বিপক্ষে লড়াই করিয়াছিল—ইহা সকলেই জানে। মুসলমানদের মধ্যে ত জাতিভেদ নাই, তবে এমন হইল কেন? আজ যদি হিন্দুদের জাতিভেদ উঠিয়া যায়, তাহা হইলেই কি ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে বেতনভুক সৈন্য লইয়া যাহার বিরুদ্ধে ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে পারিবে না?

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—কথাটিতে খারাপ কিছুই নাই। নিজের ধর্ম, নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে, তাহাতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। ইংরাজিতে যাহাকে বলে to die at the post of duty—মনুও এই কথাই বলিয়াছেন, ন সীদন্নপি ধর্মেন মনো ধর্মে নিবেশয়েৎ। ৪।১৭১

"কষ্ট এবং অভাবে পড়িলেও শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ করিবে না।" এই ধরণের কথা Ruskin এর লেখাতেও আছে। তাঁহার Unto this last হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Five great intellectual professions, relating to daily necessities of life, have hitherto existed,—three exist necessarily in every civilized nation:

The Soldier's profession is to defend it,

The Pastor's, to teach it.

The Physicians, to keep it in health.

The Lawyer's to enforce justice in it.

The Merchants, to provide for it,

And the duty of all these men is, on due occasion to die for it,

"On due occasion," namely.

The soldier, rather than leave his post in battle,

The Physician, rather than leave his post in plague,

The Pastor, rather than teach falsehood,

The Lawyer, rather than countenance in justice.

For, truly, the man who does not know when to die. does not know how to live.

মর্ম :—পাঁচ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছে,

সৈনিক,—তাহার কাজ সমাজকে রক্ষা করা

ধর্মযাজক, " " শিক্ষা দেওয়া

চিকিৎসক, " " সুস্থ রাখা,

আইন ব্যবসায়ী " সমাজের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা

বণিক " " সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা।

এই সকল লোকের কর্ত্তব্য হ তেছে প্রয়োজন হইলে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য প্রাণত্যাগ করা.—

প্রয়োজন হইলে,—অর্থাৎ

সৈনিকের, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করিয়া,

চিকিৎসকের, ব্যাধির স্থান পরিত্যাগ না করিয়া,

ধর্ম্ম যাজকের, মিথ্যা শিক্ষা না দিয়া,

আইনব্যবসায়ীর, অবিচারে প্রশ্রয় না দিয়া,

—কারণ যে মানুষ যথোপযুক্ত সময়ে প্রাণত্যাগ করিতে জানে না, সে বাঁচিতেও জানে না।

Ruskin এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে কর্ত্তব্যের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন, গীতার "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" সেই আদর্শই প্রচার করিতেছে।

যাহার যে খুসী বৃত্তি অবলম্বন করিলে যে সমাজের কল্যাণ হয় না, এবং কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহা ঠিক করিয়া সেই মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে যে সমাজ শীঘ্রগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাও রাশ্‌কিনের মত। এ বিষয়ে তিনি Political Economy of Art প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—National law has hitherto been only judicial contented, that is, with an endeavour to prevent and punish violence and crime; but as we advance in our social knowledge we shall endeavour to make our government paternal as well as judicial: that is, to establish such laws and authorities as may at once direct us in our occupations, protect us against our follies and visit us in our distress.

অনুবাদ :—এ পর্য্যন্ত আইন কেবলমাত্র বিচার করিয়াছে,—অর্থাৎ সমজে উপদ্রব এবং পাপে বাধা দিয়া এবং দণ্ড দিয়াই সন্তুষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক জ্ঞান যত বাড়িবে, তত সামাজিক শাসন পারিবারিক শাসনের অনুরূপ হইবে। এরূপ আইন এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা আমোদের জীবিকার পথ নির্দেশ করিবে, মূর্খতার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে এবং বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করিবে।

পুনশ্চ রাস্কিন বলিয়াছেন,—the nction of Discipline and Interference lies at the root of all human progress or power ;—the "Let Alone" principle is, in all things which man has to do with, the principle of Death [The Political Economy of Art] অনুবাদ :—মানবের সকল প্রকার উন্নতি ও শক্তির মূলে নিয়ম এবং শাসন বর্ত্তমান থাকে। মানবসংক্রান্ত সকল বিষয়েই স্বেচ্ছাচার হইতেছে মৃত্যুর পথ।

রাস্কিনের মতে, কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহা শৈশবেই পরীক্ষা করিয়া স্থির করা উচিত ; এবং তদনুযায়ী তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। রাস্কিন যাহা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে বলিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্র তাহা জন্ম দ্বারা নির্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, পিতামাতা এবং পূর্বপুরুষদের মধ্যে যেরূপ প্রবৃত্তি বেশী প্রবল ছিল, সন্তানের সেইরূপ প্রবৃত্তি সহজাত হইবার সম্ভাবনা অধিক, এবং শৈশব হইতে সে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পালিত হয়, তাহার প্রভাব সেই সকল প্রবৃত্তির অধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার পক্ষে অনুকূল। একটি শিশু বড় হইয়া কোন্ বৃত্তির উপযোগী হইবে—পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়। জন্ম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা (heredity and environment) প্রকৃতি যেরূপ নির্ভুল ভাবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেয়, পরীক্ষা দ্বারা সেরূপ নির্ভুল নির্বাচন সম্ভব নহে। হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃতির এরূপ আচরণের যুক্তিসঙ্গত কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে। সে কারণ হইতেছে পূর্বকৃত কর্ম্মফল ; যাহার যেরূপ কর্ম্মফল, যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তাহার অনুরূপ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। জন্ম একটা অহেতুক ঘটনা নহে। পৃথিবীতে অহেতুক ঘটনা কিছুই ঘটে না। একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন ; Birth is no more

an accident than the delivery of a letter to the person whose address is written on the envelope. "পত্রের উপর যাহার ঠিকানা লেখা থাকে তাহার নিকট পত্র পৌছান যেমন দৈবাধীন ব্যাপার নহে, জন্মও সেইরূপ দৈবাধীন ব্যাপার নহে।" আর এক বিষয়ে রাস্কিনের প্রস্তাব অপেক্ষা বর্ণাশ্রমধর্ম শ্রেষ্ঠ। সমাজে কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাজ আছে সেগুলি সাধারণতঃ হীন কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। মানবকৃত কোন ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের কতগুলি লোককে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিলে, অসন্তোষ উৎপন্ন হইবেই,—সে ব্যবস্থা যতই উৎকৃষ্ট হউক। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাতে সেরূপ অসন্তোষ উৎপন্ন হয় না। কারণ, হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সে পূর্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছা যে সে তদনুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিবে। বাস্তবিক সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা এইরূপ বিশ্বাসে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া আসিতেছে। অথচ ইহাতে যে তাহাদের নৈতিক অবনতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, Sir Thoms Munro এবং মহাত্মা গান্ধীর মতে The masses of India are more cultured than any in the world.—"ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর অন্য সকল দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক সভ্য।" পিতৃ-মাতৃভক্তি, দাম্পত্য প্রেম, সন্তানবাৎসল্য, অহিংসা, ঈশ্বরভক্তি—এই সকল উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুর মধ্যে প্রবলতর। হীন বৃত্তি সত্ত্বেও যে নৈতিক অবনতি হয় না, তাহার কারণ এই যে দরিদ্র লোকেরাও জানে যে তাহাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি পালন করিয়াও তাহারা জীবনের যাহা উদ্দেশ্য—ঈশ্বরলাভ, তাহা সাধন করিতে পারে। কারণ ঈশ্বর সমদর্শী,— কোন বৃত্তিকে তিনি হীন চক্ষে দেখেন না। যে কার্য্যই হউক, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে করা যাইতেছে, এইরূপ মনে

করিয়া করিলে, মনের অবনতি মনে হয় না, প্রত্যুত চিত্ত শুদ্ধ হয়।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ গীতা ১৮।৪৬

"যাঁহা হইতে প্রাণীদের উৎপত্তি, যিনি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে মানব সিদ্ধি লাভ করে।" শূদ্র যখন অন্য বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে তখন ভাবিবে, সকলেই ত ভগবান হইতে উৎপন্ন, আমি এই পরিচর্য্যা ভগবানেরই করিতেছি—ইহা ত লজ্জার বিষয় নহে, সৌভাগ্যের বিষয়; দুঃখের বিষয় নহে, আনন্দের বিষয়। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিলে চিত্তের অবনতি হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বহস্তে পায়খানা পরিষ্কার করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধি এই কার্য্য করিতে গর্ব অনুভব করেন। হিন্দুর সমাজতন্ত্রের মর্মকথা ইঁহারা অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই ইঁহারা এরূপ আচরণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এরূপ ভাব দেখা যায় না। তাহারা ভাবে,—অন্যের পরিচর্য্যা করা লজ্জাকর—আমার অন্য কিছু বড় কাজ করিবার সুযোগ নাই বলিয়াই এরূপ করিতেছি। বড় লোকেরা পরিশ্রম না করিয়াও কত রকম সুখভোগ করিতেছে, আমি এত কষ্ট করিয়াও কত কষ্টে দিনপাত করিতেছি। এইরূপ মনোভাব হইলে অসন্তোষ ও মানসিক অবনতি অনিবার্য্য।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুকে অন্যরূপ ভাবিতে শিখাইয়াছে। সে বলে—

প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়মারভ্য প্রাততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনং তব॥

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত যাহা করি, হে জগন্মাতঃ, সে সকলই তোমার পূজা।

দেবেশ চৈতন্য মায়াদিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে

হে দেবেশ, চৈতন্যময়, হে আদিদেব, লক্ষ্মীকান্ত, বিষ্ণো, তোমার আজ্ঞাতেই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার প্রিয়সাধন করিবার জন্য সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব।

অন্যায় কার্য্য করিবার সময় এরূপ মনোভাব লইয়া করা যায় না; কিন্তু খুব দরিদ্র ব্যক্তিরও নিজ জীবিকার অনুরূপ কর্ম করিবার সময় এইরূপ মনোভাব লইয়া করা সম্ভব। এই সকল শাস্ত্রোপদেশ কেবল পণ্ডিতের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যাত্রা, গান, কথকতার মধ্য দিয়া এই সকল মূল্যবান তত্ত্ব নিরক্ষর দরিদ্রের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও ধর্মভাবের অভাব হয় নাই। তাহাদের মধ্য হইতেও অনেক সাধু মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।

যে সকল সমাজে এরূপ ধর্মানুশাসন নাই, যেখানে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হইয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, যেখানে অসন্তোষ, ঈর্ষা, বিদ্রোহ অনিবার্য্য। সেখানে সামাজিক শান্তি দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি বলিয়াছেন, "বাধ্য হ'য়ে কাজ করা অপমানকর।" "রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তাহলেও তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকৃত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থামৃত না।" "ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করারও মধ্যে তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে" "আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম শাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ এবং বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।" "তাতে মানুষকে শান্ত করে" "ধর্ম আমাদের দেশে

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়াছে।” কিন্তু এসকল সত্ত্বেও তিনি বৃত্তি বিষয়ে ধর্মানুশাসনের অত্যন্ত বিরোধী। তিনি আশঙ্কা করেন—এইরূপ ধর্মানুশাসনের ফলে আচারের চাপে আধ্যাত্মিকতার প্রাণ বহির্গত হয়, এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সুবিধা পাইলেই দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। আমরা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এরূপ হইবার কোন কারণ নাই; এবং অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয় নাই।

ভারতবর্ষে কত দিন ধরিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচলিত আছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। উপনিষদ যে অন্ততঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বেকার, ইহাতে কাহারও বোধ হয় সন্দেহ নাই। প্রাচীন পন্থীদের মতে জাতিভেদ ৩০০০ বৎসরের অনেক বেশী দিন ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। ভারতের এই তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস সবটাই লজ্জাকর নহে। অতীত ইতিহাসে গৌরব করিবার বিষয় হিন্দুর যথেষ্ট ছিল। উপনিষদ, ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা,—কালিদাস, ভবভূতি, আর্য্যভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, তুলসীদাস, শ্রীচৈতন্য—কোণারক, ভুবনেশ্বর, এলোরা, অজন্তা, তাঞ্জোর, মাদুরা,—অতীত ভারতের কয়েকটিমাত্র উজ্জ্বল নিদর্শন। ভারতের মুসলমান অধিকারের পূর্বে অন্ততঃ ২৩০০ বৎসর—বংশগত বর্ণাশ্রমধর্ম সত্ত্বেও ধর্ম, দর্শন, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, বয়ন প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা এবং শিল্পে ভারতবর্ষ যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম, দর্শন ও কাব্যে তাহারা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, পৃথিবীর কোন যুগে কোন

দেশ তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল বিদ্যা এবং শিল্পের বংশগত ভাবেই চর্চ্চা করা হইয়াছিল। হিন্দু মনে করে—বংশগতভাবে চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়াই এত উন্নতি হইয়াছিল। যে সকল কারণে সে এইরূপ মনে করে, এই প্রবন্ধের পূর্বভাগে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বংশগত ভাবে বিদ্যা ও শিল্প-চর্চ্চার ফলে উন্নতি হইয়াছিল—কেহ যদি ইহা স্বীকার না-ও করেন, তাঁহাকে অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করিতে হইবে, যে, বংশগত ভাবে বিদ্যা এবং শিল্প-চর্চ্চা হওয়াতে ঐ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের পথে বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। কারণ অন্তরায় হইলে ভারত এত শীঘ্র এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

এরূপ একটা কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদ প্রথা আছে বলিয়াই হিন্দুজাতির অবনতি হইয়াছে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া বলেন, তাহা মনে হয় না। কারণ, একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পৃথিবীর অপর সকল জাতির তুলনায় হিন্দুজাতির বেশী অবনতি হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। ব্যাবিলনিয়া, কার্থেজ, মিশর ও ফিনিশিয়াতে যে সকল সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল, আজ সে সভ্যতা কোথায়? বহু যত্নে মৃত্তিকাস্তরের নিম্ন হইতে খনন করিয়া তাহার যে সকল ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাদুঘরে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তাহাদের সমসাময়িক, অথবা তাহাদের অপেক্ষাও প্রাচীন, হিন্দুর সভ্যতা এখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়াইয়া আর্য্যঋষিগণ যে বেদমন্ত্র গান করিয়াছিলেন, আজিও হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র মন্দিরে এবং বিদ্যালয়ে সে সঙ্গীতের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করেন; উপনয়ন এবং বিবাহাদি সংস্কারে

সেই সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আশ্রমের পর্ণকুটীরে বসিয়া প্রাচীন হিন্দু ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল মহীয়ান সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল, ইংলণ্ড জার্ম্মণি ও ফ্রান্সের মনীষিগণ আজিও বিস্ময়মুগ্ধ চিত্তে তাহার অনুশীলন করিতেছেন। বিজ্ঞানের অত্যুগ্র আলোকচ্ছটায় জগতের আর সকল ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, কেবল হিন্দুধর্ম্ম হয় নাই; সে যেন ঈষৎ স্মিতবদনে বিজ্ঞানকে বলিতেছে,—বৎস, চরম সত্য নির্ণয় করিতে এখনও দেরী আছে। পরাধীন হইবার পরও ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, তৈলঙ্গস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাস্করানন্দ, কাটিয়া বাবাজি, পাগল হরনাথ। ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীর আর কোনও জাতি কি হিন্দু অপেক্ষা অধিক দিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? এতদিন স্বাধীনতা রক্ষা করা দূরের কথা, আর কোনও জাতি হিন্দু জাতির ন্যায় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারে নাই। যে ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শক্তি বলিয়া পরিচিত, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করুন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে জাতি ইংলণ্ডে বাস করিত, সে জাতি আজ কোথায়? Saxonরা আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর তাহারা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে, কিংবা Saxonদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেই Saxon জাতিই বা কত দিন নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিল? তাহারা প্রথমে Daneদের দ্বারা, পরে Normanদের দ্বারা বিজিত হইল এবং ক্রমশঃ Normanদের সহিত মিশিয়া গেল। দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড চারবার বিজিত হইল এবং দুইটি জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। য়ুরোপের অন্যান্য জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও এইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রিটনদের, স্যাক্সনদের, রোমানদের, গ্রীকদের যে

ধর্ম ছিল, সে ধর্ম এখন কোথায় ? হিন্দু জাতি ২৫০০ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন ছিল, ৩।৪ সহস্র বৎসর ধরিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং নিজ ধর্ম রক্ষা করিয়াছে, সুতরাং অপর সকল জাতির ইতিহাসের তুলনায় ভারতের ইতিহাস অধিকতর লজ্জাজনক নহে। মহামতি Todd লিখিয়াছেন,—

What nation on earth would have maintained the semblance of civilization, the spirit or the customs of their forefathers, during so many centuries of overwhelming oppression but one of such singular characters as the Rajpoots ? * * * How did the Britons at once sink under the Romans, and in vain strive to save their groves, their Druids or their altars of Bal from destruction ! To the Saxons they alike succumbed ; they, again, to the Danes ; and this heterogenous to the Normans. Empire was lost or gained by a single battle, and the laws ond religion of the conquered merged in those of the conquerors. Contrast with these the Rajpoots : not an iota of their reilgious and customs have they lost through many a foot of land. [Annals of Mewar, Chapter V]

ভূদেববাবু বলিয়াছেন, "কোনও সমাজ অন্য কর্তৃক বিজিত হইলেই যে তাহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, তাহা নহে। মূর্খ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, অসভ্য ম্যাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল, বন্য তাতারীয়েরাও সুসভ্য চীনীয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল, অসভ্য বর্ব্বরজাতিয়েরা রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল,

পাণ্ডু পাল্যোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসাম দেশ অধিকার করিয়াছিল। যে যুদ্ধে হারে সে হীন, এটা গোঁয়ারের কথা, বিচক্ষণ লোকের কথা নয়।" (সামাজিক প্রবন্ধ ৩৫—৩৬ পৃঃ) "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ?" এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"আরবদেশীয়রা এক প্রকার দিগ্বীজয়ী, যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে তখনই সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরবেরা মিশর ও সিরিয়দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয়বৎসর মধ্যে, পারশ্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণ অধিকার করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিনশত বৎসর ধরিয়া যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। পুনশ্চ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, যখন কোন প্রাচীন দেশের নিকটে নবঅভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থান করে, তখন প্রাচীনজাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি—প্রাচীন য়ুরোপে রোমকেরা, এসিয়ায় আরব্য এবং তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংশ্রবে আসিয়াছে তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যতদূর দুর্জেয় হইয়াছিল এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকাল মধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারশ্য, তুরস্ক এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষে বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খৃঃ পূর্বাব্দে প্রথম রোমকদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ ১২০

বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্বরোমক বা গ্রীস সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তুরকীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক—যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ :—তাহাই ২৮৬ খৃঃ অব্দে উত্তরীয় বর্বর জাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম বর্বরবিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃঃ অব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে ৫২৯ বৎসর পরে শাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দিন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফল-যত্ন হইয়াছিল গজনীনগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারত অপহরণ করে তাহারা পাঠান বা আফগান। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্বগত আরব্য এবং তুরকীয়দের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য তুরকী এবং পাঠান এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।"—বিবিধ প্রবন্ধ—ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

আমার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, হিন্দু জাতির কোন দোষ নাই, ইহাদের সব ভাল। হিন্দু জাতির মধ্যে যে পরিমাণে স্বার্থ, দলাদলি, নিরুদ্যম প্রভৃতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সে পরিমাণে তাহাদের জাতীয় উন্নতির বাধা পড়িয়াছে। সে সকল দোষ উঠাইয়া দিন এবং তাহার স্থানে নিঃস্বার্থপরতা, ঐক্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চারিত করা হউক। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের যৌবন যেমন চিরদিন থাকে না, কালক্রমে জরা বা বার্দ্ধক্য

আসে, একটা জাতিরও অবস্থা সেইরূপ চিরদিন সমান থাকে না, কালের প্রভাবে তাহার কখনও উন্নতি কখনও অবনতি হয়। অবনতি হইয়াছে বলিয়াই যে তাহার সামাজিক অবস্থা সব খারাপ এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। পরাধীন জাতির পক্ষে বিজেতার অনুকরণ অনেকটা স্বাভাবিক। সে মনেকরে বিজেতার আচার ব্যবহার যাহা কিছু সব ভাল। সে বিজেতার অনুরূপ বেশ পরিধান করিতে ইচ্ছা করে, মাতৃভাষার অনাদর করিয়া বিজেতার ভাষার আদর করে, ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়েও বিজেতার অনুকরণ করে। তাহার সমাজের ব্যবস্থাগুলি যদি বিজেতার সমাজে না থাকে সে মনে করে সে গুলি বড় খারাপ, সে গুলি নাই বলিয়াই বিজেতৃগণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে গুলি আছে বলিয়াই তাহাদের পরাধীনতা ঘটিয়াছে। এইরূপ বিকৃত দৃষ্টিতে ভাল ব্যবস্থা-গুলিও খারাপ বলিয়া মনে হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম হিন্দুসমাজকে যে সুগভীর শান্তি দিয়াছে, আজ আমরা তাহার মূল্য বুঝিতে পারিতেছি না; যখন হারাইব তখন বুঝিব কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি।

(ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৩)

সাহিত্যে ভোগাসক্তি

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি গল্প আছে। দেবতাগণ এবং অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। তন্মধ্যে দেবগণ কনিষ্ঠ, অসুরগণই জ্যেষ্ঠ। উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। দেবগণ মনে করিয়াছিলেন যজ্ঞে উদ্গীথ স্তবপাঠ করিয়া আমরা অসুরদিগকে অতিক্রম করিব। এইরূপ

সংকল্প করিয়া দেবগণ বাক্‌ইন্দ্রিয়কে বলিলেন "তুমি আমাদের হইয়া উদ্গীথ গান কর।" বাক্ ইন্দ্রিয় উদ্গীথ গান আরম্ভ করিলে অসুরগণ বাক্-ইন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিল এবং ভোগাসক্তি-রূপ পাপ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। লোকে যে অনুচিত বাক্য বলিয়া থাকে তাহাই সেই পাপ। অতঃপর দেবগণ ঘ্রাণইন্দ্রিয়কে উদ্গীথ গান করিতে বলিলেন। অসুরগণ তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়া ভোগাসক্তি-রূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। লোকে যে নিন্দিত ঘ্রাণ করে, তাহাই সেই পাপ। অতঃপর শ্রবণেন্দ্রিয়ও পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল। লোকে যে অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া থাকে তাহাই এই পাপ। এই ভাবে মনও পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল। লোকে যে অনুচিত সংকল্প করে তাহাই এই পাপ। ইত্যাদি।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে এখানে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গণকেই দেবতা এবং অসুর বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যখন শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান এবং কর্মানুষ্ঠানে অভিরত থাকে, তখন তাহারা দীপ্তিমান হয়, এজন্য দেব শব্দবাচ্য হয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন ভোগাসক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করে, তখন তাহারা কেবলমাত্র প্রাণ বা "অসু"র পরিতৃপ্তিতে নিরত থাকে, এজন্য অসুর শব্দ বাচ্য হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্মে প্রবৃত্তি বহু আয়াসসাধ্য, এজন্য অল্প। ভোগাসক্তিহেতু কর্মে প্রবৃত্তিই স্বাভাবিক, এজন্য বহুসংখ্যক। এই কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, দেবগণ কনিষ্ঠ, এবং অসুরগণ জ্যেষ্ঠ।

যজ্ঞে অর্থাৎ ঈশ্বরপূজনে নিযুক্ত করাই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সার্থকতা। দেবগণ এইভাবে অসুরগণকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোগাসক্তি হেতু ইন্দ্রিয়গণ ঈশ্বরারাধনারূপ সাধনা হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই ভোগাসক্তিই পাপ। পাপের স্পর্শনিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ অনুচিত কর্ম্মই নিষ্পন্ন করে।

উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকার অনুসরণ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যও অসুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভোগাসক্তি-রূপ পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার ফলে অসৎসাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ যেরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলেই সার্থক হয়, ভোগের জন্য নিযুক্ত হইলে তাহার অপব্যবহার হয়,—সেইরূপ সাহিত্যেরও সার্থকতা শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ তাহাকে নিযুক্ত করা, এবং সাহিত্যের অপব্যবহার হইতেছে দুর্নীতিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করা। এইভাবে দুই শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়,—সৎসাহিত্য এবং অসৎসাহিত্য। সৎসাহিত্য মানবকে ভগবদভিমুখী করে, অসৎসাহিত্য মানবকে ভোগাভিমুখী করে, এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল করে।

আজকাল সাহিত্যে আর্টের (Art) কথা প্রায় শোনা যায়। আধুনিক সাহিত্যিকগণ বলিয়া থাকেন যে Artই সাহিত্যের প্রাণ, যাহাতে Art আছে তাহাই ভাল সাহিত্য, যাহাতে Art নাই, তাহা সাহিত্য নামের যোগ্য নহে, সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিবার জন্য সাহিত্যের সুনীতি-দুর্নীতির কথা অপ্রাসঙ্গিক। এই Art কি বস্তু, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাহা চিত্তাকর্ষক তাহাই Art। বলা বাহুল্য ভাল ও মন্দ উভয় বস্তুই চিত্তাকর্ষকভাবে কথিত হইতে পারে সুতরাং আধুনিক সাহিত্যিকগণ যাহাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিবেন তাহা ভাল ও মন্দ দুই প্রকারই হইতে পারে। যাঁহারা অর্ব্বাচীন, তাঁহারা ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের সাহিত্যই আদর করিবেন,—যদি সে সাহিত্য চিত্তাকর্ষক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর * হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা মন্দ সাহিত্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর

* চিত্ত বা মনও একটি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় একাদশটি,—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন (উভয়েন্দ্রিয়)।

হইলেও তাহা বর্জন করেন ; ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগজনিত যে সুখ তাহা ক্ষণস্থায়ী। এই সুখে আসক্তি থাকিলে পরিণামে,—এই সুখের অবসানে,—দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনো ২নিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত॥ গীতা ২।১৪

"বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংবন্ধ হইলে কখনও শীত কখনও উষ্ণ, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ,—নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। এই সকল ভাব অনিত্য জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ পাইলে হর্ষান্বিত হন না, দুঃখ পাইলে বিষণ্ণ হন না।"

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্"—যে সকল দ্রব্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর তাহাতে আসক্তি বর্জন করিতে হইবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান পুনরায় বলিয়াছেন,—

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রে২মৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং॥ ১৮।৩৮

"বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে ইন্দ্রিয়ের যে সুখ হয় তাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায়। এই সুখের নাম রাজস সুখ।"

জ্ঞানী "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ" (২।৫৫) নিজের মধ্যেই তুষ্টি অনুভব করেন, বাহ্য বস্তুর সংযোগের অপেক্ষা করেন না, এবং কূর্ম যেরূপ স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ দেহের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, জ্ঞানী সেইরূপ বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি সংহরণ করিয়া রাখেন (২।৫৮)।

জ্ঞানী সুন্দর দৃশ্য দেখিলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির কথা ভাবেন না। তিনি ভাবেন এই সুন্দর দৃশ্য যাঁহার মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তিনি নিজে

কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর। এইরূপ ভাব হইতে যে সাহিত্যের আবির্ভাব হয়, তাহা সৎসাহিত্য।

মনে হইতে পারে জীবনের সকল বিষয়ে এরূপ অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতে গেলে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া যদি বলা যায় "আহা চক্ষু জুড়াইল", সুন্দর গান শুনিয়া যদি বলা যায় "কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল" তাহা হইলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে মনকে ভোগোন্মুখ করা হয়; যাহা কল্যাণকর তাহার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি হয় না; যাহা আপাতমধুর তাহার জন্য অভিরুচি বর্দ্ধিত হয়; শ্রেয়র পরিবর্ত্তে প্রেয়কে বরণ করা হয়। যাহা ভাল লাগে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেলে সুনীতি-দুর্নীতির পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। "আমরা একটা মহৎ বিষয়ের চর্চ্চা করিতেছি" এইরূপ মিথ্যা ভাবের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির আয়োজন প্রবলভাবে চলিতে থাকে। দুর্নীতি ললিতকলার মুখোস পরিয়া সমাজে সমাদর লাভ করে।

সাহিত্যের ক্ষমতা আছে মানবচিত্তকে আকৃষ্ট করা। এই ক্ষমতার উচিত মত ব্যবহার হইলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ,—রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই গ্রন্থ যেমন প্রবলভাবে মানব-মন আকর্ষণ করে সেইরূপ গভীরভাবে মানব-মনের উপর ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের সংস্কার অঙ্কিত করিয়া দেয়। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের জনসাধারণ এই দুই গ্রন্থ হইতে সুশিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছে। ইহাই সাহিত্যের সদ্ব্যবহার। অসৎ সাহিত্যে দুর্নীতিকে চিত্তাকর্ষকভাবে অঙ্কিত করা হয় এবং ধর্ম্মকে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। দুঃখের বিষয় আজকাল কয়েকজন শক্তিশালী লেখক এরূপ অসৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রতিভা নিযুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করিতেছেন। এ বিষয়ে

সাহিত্যস্রষ্টাদের যেরূপ দায়িত্ব আছে, সাহিত্য-প্রচারক এবং সাহিত্য পাঠকদেরও সেইরূপ দায়িত্ব আছে। অসৎ সাহিত্য লোকে না পাঠ করিলে লেখকগণ সেরূপ সাহিত্যরচনা হইতে বিরত হইবেন। সাহিত্যিকের *দায়িত্ব অতি গুরুতর। এই দায়িত্বজ্ঞান বর্জ্জন করিলে সমাজ দ্রুতগতিতে* ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। আজকাল সমাজ-ধ্বংসকর অসৎ সাহিত্য অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এবং অপরিণত বয়স্ক যুবক যুবতী আগ্রহের সহিত সে সকল সাহিত্য পাঠ করিয়া দুর্নীতিরূপ বিষে চিত্ত কলুষিত করে। আমাদের সমাজের নেতাদের এ বিষয়ে কত দিন পরে চেতনা হইবে বলিতে পারি না।

(ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪১)

বাঙ্গলা ভাষার মঙ্গলকাব্য

[১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় "বাতায়নিকে পত্র" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ঃ ঐ প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা ছিল। তাহার প্রতিবাদ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল এবং ভরেতবর্ষের ভাদ্র (১৩২৬) সংখ্যাতে ছাপা হইয়াছিল।]

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "বাতায়নিকের পত্রে" বাঙ্গলা ভাষার মঙ্গলকাব্যগুলি-সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বাংলা ভাষার মঙ্গলকাব্য-গুলির বিষয়টা হচ্চে এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে

আরেক দেবতার অভ্যুদয়”—“আমরা (শক্তিপূজক বাঙ্গালীরা) বল্‌চি,—শিবকে মান্‌ব না ; শিবকে মানা কাপুরুষতা, আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেচি।” কিন্তু এই এক দেবতাকে “খেদিয়ে” দেওয়া, শিবকে না মানা, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এ সকল কথা কোথাও পাওয়া যায় না। চণ্ডী বা মনসার পূজা করিলে শিব পূজা ছাড়িতে হইবে, যুক্তির সাহায্যেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কারণ চণ্ডী ও মনসা (পদ্মা) কে শিবের পত্নী ও কন্যা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাই বরং বলা উচিত, যে, চণ্ডী ও মনসাকে অবজ্ঞা করিলে প্রকারান্তরে শিবকেও অবমাননা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ শক্তির সহিত মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অত্যন্ত বিরোধ দেখিয়াছেন। কিন্তু শক্তি মাত্রই ত খারাপ নহে। শক্তির দ্বারা যে কেবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার বা পরস্ব লুণ্ঠন করিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। শক্তির দ্বারা ভালও করা যায়, মন্দও করা যায়—উদ্দেশ্য অনুসারে শক্তির শুভ বা অশুভ উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। যে শক্তির উদ্দেশ্য পরপীড়ন, পরস্বহরণ তাহা অশুভ ; আর যে শক্তির উদ্দেশ্য পরপোকার তাহা শুভ। হিন্দুধর্ম্মোপদেষ্টাগণ শক্তির এই দুই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের শক্তি সর্ব্বদা শুভ ও পূজনীয়। যে শক্তি অশুভ তাঁহারা তাহার নাম দিয়াছেন আসুরী শক্তি। এই আসুরী শক্তির সহিত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যে আসুরী শক্তির পরাভব হয়। আসুরী শক্তি বিনাশ করিবার জন্যই ঈশ্বরের শক্তি চণ্ডীরূপ গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাছে শক্তির আরাধনা করিবার সময় ভক্ত ভ্রমক্রমে আসুরী শক্তির আরাধনা করে, এ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যথেষ্ট সাবধান হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা এই দুই শক্তির প্রভেদ

স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং দশভুজা মূর্ত্তিতে চণ্ডীর অসুর-বিনাশিনী রূপ দেখাইয়া এই প্রভেদ হিন্দুর হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

পরমেশ্বর যেমন মঙ্গলময়, সেইরূপ তিনি সর্ব্বশক্তিমান। এই বিশাল জগতের সৃজন ও প্রতিপালন তাঁহার অসীম শক্তি নিদর্শন। পরমেশ্বরের এই শক্তিকে চণ্ডী বা দুর্গারূপে পূজা করা হয়। পরমেশ্বর বা শিব,—স্বামী; পরমেশ্বরের শক্তি বা চণ্ডী,—তাঁহার পত্নী। শক্তিকে তাঁহার পত্নী বলিয়া কল্পনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রী যেমন বাস্তবিক স্বামী হইতে ভিন্ন নহেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া যেমন এক ব্যক্তির ন্যায় সংসারের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পাদন করেন, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বর ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ঈশ্বর ও ঈশ্বরের শক্তি মিলিত হইয়া এক ব্যক্তির ন্যায় জগতের সৃজন, পালন প্রভৃতি সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। বৈদান্তিক এই সিদ্ধান্তটি "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ" অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন নহেন, এই বলিয়া প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মান্‌লেই আর একটিকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি মান্‌লেই দাহিকা শক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। * * তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না।

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তাঁরই নাম কালী।

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কোন কাজ কর্‌ছেন না,—এই কথা যখন ভাবি, তখন

তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম, রূপ, ভেদ।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বহিসাবে শক্তি-পূজা ঈশ্বরের পূজা ব্যতীত কিছুই নয়।

ধনপতি সদাগর চণ্ডীর মঙ্গল-ঘটে পদাঘাত করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল, চাঁদ সদাগর মনসাকে অবজ্ঞা করিয়া উপর্য্যুপরি শোক পাইয়াছিল, ইহা রবীন্দ্রনাথের চক্ষে অতিশয় অশোভন বলিয়া বোধ হইয়াছে। এজন্য তিনি বলিয়াছেন "মঙ্গলকাব্যগুলি অধর্ম্মের জয় গান, অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত।" আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবের পরাভবের কথা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা মাত্র, শিবপূজা ছাড়িয়া কোথাও শক্তি-পূজা করিবার বিধান দেওয়া নাই। দ্বিতীয়তঃ, জগদীশ্বর বা জগদীশ্বরীর অবমাননা করিলে অনিষ্ট হইবে, ইহা যে কেবল বাঙ্গালী কবিরই বিকৃত কল্পনা, তাহা নহে। শয়তান ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই বলিয়া, তাহার বহু নির্য্যাতন হইয়াছিল,—মিল্‌টন্ তাঁহার প্যারাডাইজ-লষ্ট-কাব্যে জলদমন্দ্র স্বরে সেই কাহিনী গান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সে কাব্যকে কোন সমালোচক এ পর্য্যন্ত অধর্ম্মের জয় গান বা দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টধর্ম্মের কল্পনা এবং হিন্দু-ধর্ম্মের কল্পনার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। ঈশ্বর-বিরোধী শয়তান চিরকালতরে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। কিন্তু কংস, রাবণ ও হিরণ্যকশিপু ঈশ্বরের বিরোধাচরণ হেতু শাস্তি পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত সদ্গতি লাভ করিয়াছিল; এবং ইহাই ঠিক—এইরূপ না হইলে ঈশ্বরের অনন্ত করুণা বা অসীম শক্তির উপর দোষ পড়ে।

দুঃখ, কষ্ট, বিপদ মাত্রেই যে খারাপ তাহা নহে। দুঃখ ও বিপদের সময়ে যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা হয়, তাহা দুঃখ ও বিপদের একটা মাত্র ফল—সমগ্র ফল নহে। ঐ যাতনা পাইয়া যদি হৃদয়ে কোন উন্নতি না হয়, বা অবনতি হয়, তাহা হইলে সেরূপ দুঃখ ও বিপদ বাঞ্ছনীয় নহে সত্য; কিন্তু অনেক সময় দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া মানবের হৃদয় নির্ম্মল হয়। সোণা যেমন আগুনে পুড়িয়া বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া মানবের হৃদয় সেইরূপ পাপ-মুক্ত ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে ক্ষণিক যাতনা সত্ত্বেও দুঃখ ও বিপদ বাঞ্ছনীয়; এবং যিনি এই অভিপ্রায়ে দুঃখ ও বিপদ দেন, তিনি নিষ্ঠুর নহেন, তিনি মঙ্গলেচ্ছু। এই জন্য কুন্তী বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে সর্ব্বদা দুঃখ ও বিপদের মধ্যে রাখিও; কারণ দুঃখের সময় আমি তোমাকে যেমন প্রাণের সহিত ডাকিতে পারি, অন্য সময় তেমন পারি না। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে নিঃস্ব কবিয়া ফেলি, তাহার স্বজনগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তখন সে একান্তমনে আমার শরণ লয়।

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

বাইবল্ বলিয়াছেন, Whom the Lord loveth He chasteneth and scourgeth every son that He receiveth. ধনপতি সদাগর, চাঁদ সদাগর প্রভৃতিকে যে দুঃখ দেওয়া হইয়াছিল তাহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং এই দুঃখ বাঞ্ছনীয়; এবং যিনি এ দুঃখ দিয়াছিলেন, তিনি নিষ্ঠুর নহেন, তিনি তাহাদের শুভাকাঙ্খী।

মঙ্গলকাব্যের কবি যে ভাবে দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিপরীত দিক হইতে দেখিয়াছেন, উভয়ের angle of vision (যে

দিক হইতে দেখিয়াছেন) সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মঙ্গলকাব্যের কবির বিশ্বাস জগজ্জননীরূপ শক্তির আরাধনা করা শ্রেয়স্কর।

ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়। (অন্নদামঙ্গল)

এজন্য ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি লাভ করিবার জন্য দুঃখ-কষ্ট পাইতে হইলেও, তাঁহারা ইহাকে ক্ষতির বিষয় মনে করেন নাই; স্নেহময়ী মাতা অবাধ্য শিশুকে যেমন ভয় দেখাইয়া, প্রয়োজন হইলে তাড়না করিয়াও সৎপথে আনায়ন করেন,—সে ভয় দেখান, ছলনা এবং তাড়নাতে মাতৃ-হৃদয়ে স্নেহাতিশয্যই প্রকাশ পায়, স্নেহের অভাব প্রকাশ পায় না,—ইহাও সেইরূপ। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে নিষ্ঠুরতা ও ছলনা বলিয়াছেন, তাহাকে মাতৃস্নেহের পরিচায়ক বলিয়া মঙ্গলকাব্যের কবির অভিপ্রায় ছিল। মঙ্গলকাব্যের পাঠকও এত দিন এইভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এই তথাকথিত নিষ্ঠুরতা ও ছলনার অভিপ্রায় কি? সন্তানের হৃদয়ে মাতৃভক্তির সঞ্চার করা। সুতরাং ইহা দোষাবহ নহে। দুঃখ কষ্ট না পাইলে ভক্তিহীন জীবন যাপন অপেক্ষা শত দুঃখ-লাঞ্ছনা সহিয়াও শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির উৎস উৎসারিত হওয়া বহুগুণে শ্রেয়ঃ। এই ভাবে প্রাণোদনায় ৺কবি রজনীকান্ত মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া গাহিয়াছিলেন—

আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ
গর্ব্ব করিতে চূর।
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছ দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিলে মোরে অহমিকা কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছ দীন আতুর।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হ'ল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট কর্‌লে। শক্তি তাদের এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল, সে দুঃখে তেমন অপমান নেই, যেমন অপমান শেষ কালে এই মাথা হেঁট করে। যে আত্মা অভয়, যে আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে, ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড় বলে মান্‌লে। এইখানে *শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।"*

প্রথমতঃ চাঁদ সদাগর শক্তির কাছে "মাথা হেঁট" করিবার সময় শিবকে সরাইয়া রাখে নাই,—শিবকে সরাইয়া রাখিবার কোন কথাও ছিল না; দ্বিতীয়তঃ চাঁদ সদাগর যাহার নিকট মাথা নত করিয়াছিল, তাহা ভগবানের শক্তি—ভগবানের শক্তির নিকট মাথা নিচু করার মধ্যে কোন অপমান নাই, সে মাথা যতই কেন উচ্চ হউক না। রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে ভগবনের শক্তি মনে করেন নাই, তাই তিনি ইহাতে এত অপমান দেখিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু এই শক্তিকে ভগবানের শক্তি মনে করে মঙ্গলকাব্যের কবির উদ্দেশ্য তাই, এজন্য হিন্দু ইহাতে কোন অন্যায় দেখে না। লোকে ভগবানের বিরুদ্ধে মাথা উত্তোলন করে —দম্ভ ও অহঙ্কারের দরুণ। সে দম্ভ ও অহঙ্কারের পতন একদিন আছেই এবং সে পতন দুঃখের বিষয় নহে, আনন্দের বিষয়। এই দম্ভ ও অহঙ্কারকে রবীন্দ্রনাথ অভয় ও অমর আত্মা বলিয়াছেন। কিন্তু অহঙ্কার যে আত্মা হইতে একান্ত বিভিন্ন তাহা হিন্দু-দর্শনের একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত। কোন ব্যক্তি ঘোর অপমান এবং লাঞ্ছনার মধ্যে পড়িলে, তাহার হৃদয় মন বা অহঙ্কারের দুর্গতি হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অবস্থাতেও তাহার আত্মা কখনও আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নামিয়া আসে না, কারণ আত্মা "সে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের সমস্ত দুঃখ ও

অপমানের সাধ্য কি যে, আত্মার সেই নিজ মহিমাকে স্পর্শ করিতে পারে ?

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "ঐ দেখ না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরা বারমাস্যা একবার শোন; কিন্তু হোল কি ? হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন একটা আংটি দিলেন যে ঘরে আর টাকা ধরে না। *কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যখন এই সামান্য ব্যাধ লড়াই করল, তখন* খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বর-পুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা-মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেনতেন প্রকারে ছোটকে বড়, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমন ভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেম্নি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বল্‌তে হবে—মা, মা মা।"

ধনী ও শক্তিশালী হইবার জন্য কিরূপ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজন মনে করেন? আমাদের মনে হয়, ধনী ও শক্তিশালী হইবার প্রকৃত যোগ্যতা তাহারই হইয়াছে, যে অর্থ ও শক্তিলাভ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে। কালকেতু টাকা পাইয়া বন কাটাইয়া নগর প্রতিষ্ঠা করিল, প্রজা বসাইল, তাহার সুশাসনে নগরবাসিগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইল। প্রজাদের উপর ভাঁড়ুদত্ত-শ্রেণীর লোকের অত্যাচার সে নিবারণ করিল। এ সকল অর্থ ও শক্তির সদ্ব্যবহার। পূর্ব্বে তাহারা নিঃস্ব ছিল বটে,

কিন্তু তাহাদের অন্তরের দারিদ্র্যের ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ব্যাধ হইয়াও কালকেতু পশুদের জন্য দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। পশু বধ করা অন্যায়, তথাপি তাহাকে জীবিকার জন্য পশু বধ করিতে হইতেছে, এই চিন্তা তাহাকে বড়ই কাতর করিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে যখন এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল তখন সে অন্তরের দিক হইতে উচ্চতর অবস্থায় জীবিকালাভের উপযুক্ত হইয়াছিল। কালকেতু অলস ছিল না। শুধু তাহাই নহে। নিজ গৃহে অলোক-সামান্যা সুন্দরী রমণী দেখিয়াও কালকেতুর মনে কোন অন্যায় ভাবের উদয় হয় নাই, বরং সঙ্গলাভেচ্ছু অপরিচিতা স্ত্রীলোককে আপদ ভাবিয়াছিল। এরূপ ব্যক্তি শক্তিলাভ করিলে, শক্তির অপব্যবহার হওয়া সম্ভব নহে। জগতে যাহারা ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে তাহারা কি সকলেই বা অধিকাংশই অন্তরে ও বাহিরে কালকেতু ও সরলা স্বামীপরায়ণা ফুল্লরা অপেক্ষা যোগ্যতর? যোগ্য হইবার দরকার নাই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করিবার প্রয়োজন নাই—রবীন্দ্রনাথের এ অনুমান যথার্থ নহে। জগজ্জননীকে "মা, মা" বলিয়া ডাকাকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর বিশ্বাস যে অন্তরের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, অযোগ্যের পক্ষে যোগ্য হইবার জন্য, একান্তভাবে জগন্মাতার শরণ লওয়া অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় নাই।

কালকেতু কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করে নাই। কলিঙ্গরাজই শঠ ভাঁড়ুদত্তের প্ররোচনায় অনর্থক কালকেতুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে হনুমানের আবির্ভাব কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ত দেখিতে পাইলাম না। রবীন্দ্রনাথ ইহা কোথায় পাইলেন? সে যাই হউক, যুদ্ধে যদি চণ্ডী কালকেতুর পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় নাই,—কারণ কালকেতুকে আক্রমণ করা কলিঙ্গরাজের

অন্যায় হইয়াছিল। সুতরাং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, "সে চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যার সে ভেদ করে না।" এ উক্তি যুক্তি যুক্ত হয় নাই।

চণ্ডী কালকেতুকে এমন এক আংটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না,—এই অলৌকিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথ শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা ও ভয়ের বরপুত্র, হঠাৎ একটা কিছু হইবার আশা প্রভৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু অলৌকিক ঘটনায় অতিমাত্র বিশ্বাস যেমন একটা কুসংস্কার, অলৌকিক ঘটনাতে একান্ত অবিশ্বাসও একটা কুসংস্কার, কারণ অলৌকিক ঘটনার অর্থ কি? যদি অলৌকিক ঘটনা মানে হয়, যাহা অতি আশ্চর্য্য—তাহা হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, জগতের অধিকাংশ ঘটনাই অতি আশ্চর্য্য। এই বিশাল জগৎ—"মনসাঽপি অচিন্ত্য রূপং"—ইহার সৃষ্টি অতি আশ্চর্য্য। পৃথিবীর আবর্ত্তন, বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব, মানবের অবস্থা-বিপর্য্যয়, তাহার শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে পরিণতি, জন্ম, মৃত্যু সকলই অতি আশ্চর্য্য। মাটি হইতে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে,—কোন ঐন্দ্রজালিক ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়াছে? প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যাপারই অতি আশ্চর্য্য,—আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি বলিয়া সে সকল ব্যাপার আশ্চর্য্য বোধ হয় না। অলৌকিক মানে যদি ধরা যায়, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, তাহা হইলেও সূর্য্য হইতে গ্রহগণের উৎপত্তি, অগ্নিময় গ্রহ শীতল হইয়া তাহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব—এ সকল কেহ কখনও দেখে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসম্ভব মনে করে না। যাহা কখনও হয় নাই তাহা যে কখনও হইতে পারে না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ভগবান তাঁহার শক্তি সবটুকুই কি মানুষকে দেখাইয়া দিয়াছেন, আর কিছুই কি দেখাইতে বাকী নাই? ইহা বলা যায় না

যে, মঙ্গলকাব্যে অনেক জায়গায় হঠাৎ বড়লোক বা হঠাৎ শক্তিমান হইবার দৃষ্টান্ত আছে। দুই চারিটা অতি-প্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ যদি গুরুতর দোষের বিষয় হয়, তাহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা প্রভৃতি অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যই দূষণীয় হইয়া পড়ে।

মঙ্গলকাব্যে দেবীর নিকট ধনদৌলৎ প্রার্থনা করা হইয়াছে—উপরি উদ্ধৃত বাক্যে রবীন্দ্রনাথ ইহার উপরও কটাক্ষপাত করিয়াছেন। জগদীশ্বরীর নিকট ধনদৌলৎ প্রার্থনা করা অবশ্য শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা নহে। কিন্তু ইহারও উপযোগিতা আছে। সংসারের অধিকাংশ লোক ঐশ্বর্য্য ও সাংসারিক সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। তাহাদের পক্ষে বিধান এই যে—তুমি যাহা কিছু অভীষ্ট মনে কর সে সকলই করুণাময়ী, অসীমশক্তি-সম্পন্না জগদীশ্বরীর নিকট প্রার্থনা কর,—তিনি ইচ্ছা করিলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। বেদের বহু মন্ত্রে ঋষিগণ দেবতাদের নিকট সরল অন্তঃকরণে নানারূপ পার্থিব ঐশ্বর্য্যের প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা ভক্তির সর্ব্বোচ্চ স্তর না হইলেও, ইহার মধ্যে অন্যায় বা চিত্তের অপকর্ষজনক কিছুই নাই। শিশু যেমন মায়ের নিকট শত তুচ্ছ জিনিষ চাহিয়া থাকে, অজ্ঞতানিবন্ধন কখনও কখনও অনিষ্টকর দ্রব্যও চায়, বয়ঃপ্রাপ্ত মানবও (যাহার তত্ত্বজ্ঞান শিশু অপেক্ষা অধিক বেশী নহে) সেইরূপ জগজ্জননীর নিকট নানা তুচ্ছ বর চাহিয়া থাকে। ঈশ্বরের নিকট তুচ্ছ জিনিষ প্রার্থনা করিলেও কতকগুলি সুফল আছে। মানবের এরূপ বিশ্বাস থাকা বাঞ্ছনীয় যে রাজা ও ধনী ব্যক্তির নিকট অর্থ বা কৃপা ভিক্ষা করা কিছু নহে। ভিক্ষা করিবার আছেন এক জগন্মাতা;—তাঁহার যেমন কৃপা অনন্ত, সেইরূপ শক্তিও অপরিসীম। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলই পাওয়া যাইবে, কেহ বাধা দিতে পারিবে না। ভগবানের উপর এরূপ নির্ভর থাকা ভাল। আর এক সুফল

এই যে, ভগবানের নিকট এক মনে প্রার্থনা করিলে তাহা কল্যাণজনক হইবেই। তুচ্ছ কামনা লইয়া ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে ভগবানের কৃপা হয়, তিনি তখন দেখাইয়া দেন, এই সকল কামনা অতি তুচ্ছ; এবং যে কামনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা—তাহাই আমাদের মনে জাগাইয়া দেন।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যবাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গীতা।

সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য এই সকল কামনা ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু যত দিন ত্যাগ করিতে না পারা যায়, ততদিন সেই কামনা ভগবানের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। আমাদের হৃদয় সরল ভাবে ভগবানের নিকট উন্মুক্ত করিয়া ধরা উচিত। সূর্য্যকিরণ এবং উন্মুক্ত বায়ুতে রুদ্ধ গৃহের দুষ্ট বীজাণুসকল যেমন বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পতিত হইলে আমাদের সকল মলিনতা সেইরূপ বিদূরিত হইবে। শক্তি-পূজার প্রকৃত তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভক্ত শুধু পাথিব ঐশ্বর্য্যই প্রার্থনা করে না; পার্থিব ঐশ্বর্য্য প্রধানভাবেও প্রার্থনা করে না। ভগবানকে লাভ করিবার পথে যে সকল বাধা আছে, সেই সকল বাধা দূর করিবার জন্যই শক্তির উদ্বোধন। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, পরমহংস, বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধকগণ ভারতে শক্তি-পূজার ইতিহাস গৌরবময় করিয়া রাখিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলি দেবীর পূজা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও, তাহাদের মধ্যে একটা অসাম্প্রদায়িক উদারতার ভাব অতিশয় সুস্পষ্ট। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল উভয় গ্রন্থের আরম্ভে বিষ্ণু, মহাদেব, লক্ষ্মী,

সরস্বতী, মহামায়া, গণেশ, রাম, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের দেবদেবী ও অবতার প্রভৃতির বন্দনা আছে। অন্নদামঙ্গলে শিব বলিয়াছেন,

হরি হর দুই মোর অভেদ শরীর
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর।

এক দেবতাকে খেদাইয়া আরেক দেবতার প্রতিষ্ঠা যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এইরূপ হইত না।

চণ্ডীকে মহাদেবের পত্নী বলা হইয়াছে, মনসাকে মহাদেবের কন্যা বলা হইয়াছে, তথাপি রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবলে চণ্ডী ও মনসার সহিত শিবের ঘোর বিরোধ দেখাইয়াছেন। শিবপূজা করা উচিত নয়, এ কথা মঙ্গলকাব্যে কোথাও কি লেখা আছে? প্রত্যুতঃ মঙ্গলকাব্যে নানা স্থানে মহাদেবকে পরমেশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; মহাদেবের অনেক স্তবস্তুতি আছে; শুধু ভারতচন্দ্র নহে, মুকুন্দরামও হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন।

ধনপতি সদাগর, চাঁদ সদাগর প্রভৃতি এক শ্রেণীর লোক ছিলেন,—ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের মত অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। প্রাচীন দেবতা শিব ভিন্ন তাঁহারা কোন লৌকিক দেবতার নিকট মস্তক অবনত করার একান্ত বিরোধী ছিলেন। অথচ এই বিরোধের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। স্ত্রীলোক এবং নিরক্ষর জনসাধারণ এই দেবতার পূজা করে, ইহা বোধ হয়, তাঁহাদের আপত্তির কারণ। এই নূতন দেবতাকে তাঁহারা স্ত্রী দেবতা, মেয়ে দেবতা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু উদারভাবে দেখিলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, লৌকিক দেবতা কোন নূতন দেবতা নহেন। উপনিষদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, পুরাণে যাঁহাকে শিব বলা হইয়াছে, তাহাকেই চণ্ডী, দুর্গা প্রভৃতি রূপে

পূজা করা হইয়াছে। এই তত্ত্বটি ভারতচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়াছেন,—

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার ছায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনা আপনি সমা
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥
বিনা চন্দ্রানল রবি প্রকাশে আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থূল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥

এখানে আমরা উপনিষদের

"অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"
"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

প্রভৃতি বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাই। উপনিষদে অবশ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধেই এই সকল কথা বলা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র চণ্ডী বা মহামায়া সম্বন্ধে ইহাদের প্রয়োগ করিয়া দেখাইতেছেন যে, চণ্ডী বা ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। দম্ভ ও অহঙ্কার ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরকে এই তত্ত্ব বুঝিতে দেয় নাই। তাঁহারা বুঝেন নাই যে, এক পরমেশ্বরকেই

শিব, চণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে পূজা করা হইয়াছে। এ ভুল ভাঙ্গিতে তাঁহাদের বহু দুঃখকষ্ট পাইতে হইল সত্য, কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহাদের হৃদয়ে জগজ্জননীর প্রতি ভক্তির উদয় হইল, তখন তাঁহাদের সকল দুঃখ-কষ্ট সার্থক হইল। সরল ভাবে কবিগণ এই কাহিনী গান করিয়াছেন। যে "নিষ্ঠুর ছলনা"র উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ অজস্র ধারায় বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে কোন দোষ দেখেন নাই। শত-শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী পাঠকও তাহাতে কোন দোষ দেখে নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এই সকল কাব্যের সাহায্যে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবন যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিলাভ করিতেছিল।

মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য শিবকে তাড়াইয়া তাঁহার স্থানে শক্তির প্রতিষ্ঠা নহে,—উদ্দেশ্য শিব ও শক্তির সমন্বয়। এ সমন্বয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ "গোঁজা-মিলন" দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের ন্যায় গোঁজামিল দিয়া বল্‌চেন, যীশুর সঙ্গে (অর্থাৎ ভগবানের মঙ্গলময় রূপের সঙ্গে) শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে দুজনকেই সমান মান্‌বার মন্ত্র আছে।" পাশ্চাত্য জগৎ সম্বন্ধে এ উক্তি বোধ হয় যথার্থ ; কারণ, তাঁহারা অনেকে আসুরী শক্তির আরাধনা করিতেছেন, আসুরী শক্তির সহিত মঙ্গলময় ভগবানের প্রকৃত মিলন হয় না, এ মিলনে গোঁজামিলন দিতে হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কথায় মধ্যে কোন "গোজামিলন নাই" ; কারণ তিনি যে শক্তির আরাধনা করিয়াছেন তাহা আসুরী শক্তি নহে, তাহা অসুর-বিনাশিনী ঐশী শক্তি, তাহা শুভ শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা জগতের সৃজন পালন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। শক্তিমাত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথ ভগবানের এরূপ

বিরোধ দেখিয়াছেন কেন? ভগবান কি অসীম শুভ শক্তির আধার নহেন? ভগবান যে সকল শুভ শক্তির মূল, তাহা কেনোপনিষদের হৈমবতী-উমার উপাখ্যানে অতি সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা সংযত ভাষাতেই করা উচিত—যাহাতে অপরের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত না লাগে। "এক দেবতাকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়", "এককালে পুরুষ-দেবতা ছিলেন তাঁর বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না, খামকা মেয়ে-দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন আমার পূজা চাই", "করজোড়ে তারস্বরে বল্‌তে হবে মা, ম, মা"—এই সকল ভাষা মহাদেব, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দুর আরাধ্য দেবতার প্রতি প্রয়োগ করা যে শোভন হয় নাই তাহা নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই স্বীকার করিবেন। আমাদের দেশের মার্জ্জিত-রুচি ব্যক্তিগণ যদি অপরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করিয়া অশোভন ভাষার প্রয়োগ করিবেন, তাহা হইলে সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব লইয়া যাহারা পরস্পর গালাগালি করে তাহাদের কি দোষ দিব? যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সত্যনির্ণয়ের পক্ষে এরূপ অবস্থা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

শক্তি-পূজা

[বাঙ্গলাভাষার মঙ্গলকাব্য-নামক পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধটি ছাপা হইবার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে এবিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে এই প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছিল এবং ফাল্গুন (১৩২৬) এর ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।]

"বাতায়নিকের পত্রে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শক্তিপূজার যে আলোচনা করিয়াছিলেন, কার্ত্তিকের 'প্রবাসীতে সে সম্বন্ধে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা' স্বীকার করে নিচ্চি। কিন্তু বাঙ্গলা মঙ্গল-কাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েচে সে লৌকিক এবং তার ভাব অন্যরূপ।" কিন্তু আমাদের মতে বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা শক্তির শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুরূপ। প্রথমতঃ শক্তির "শাস্ত্রিক ও দার্শনিক" ব্যাখ্যা কি তাহাই দেখা যাউক। শাস্ত্রে যে শক্তিপূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা পরমেশ্বরের শক্তি। দর্শনের অদ্বৈতবাদ অনুসারে শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, যেমন অগ্নি (শক্তিমান) আর তার দাহিকা-শক্তি; অতএব পরমেশ্বরের শক্তি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। শাস্ত্রের বিধান ও দর্শনের সিদ্ধান্ত একত্র করিয়া পাওয়া যাইতেছে যে, যে শক্তির পূজা করা হয় সে শক্তি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। ইহাই শক্তির "শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা"। মঙ্গল-কাব্যেও যেখানে শক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা

হইয়াছে সেখানে অবিকল এই কথাই পাওয়া যায়। অন্নদা-মঙ্গলে শক্তিকে বলা হইয়াছে.

ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর
পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর

পুনশ্চঃ—

তুমি সর্ব্বময় তোমা হৈতে হয়
সৃজন পালন লয়
কত মায়া কর কত কায়া ধর
বেদের গোচর নয়

অন্যত্র,—

অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনা আপনি সমা
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-প্রকৃতি ॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥

উপনিষদে পরমেশ্বরের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এখানে আমরা সেই সকল লক্ষণ দেখিতে পাই। যথা উপনিষদে,

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥

এখানে ব্রহ্মকে পরম পুরুষ বলা হইল।

যস্মাৎ ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তৎবিজিজ্ঞাসস্ব তৎব্রহ্ম ॥

এখানে বলা হইল যে ব্রহ্ম হইয়ে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয়।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ॥

অর্থ—ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে বহু রূপ ধরেন

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ॥

অর্থাৎ—তিনি অনির্বাচ্য

ন তস্য কশ্চিৎ প্রতিমাস্তি লোকে।

তাঁহার কোন উপমা নাই—তিনি নিরুপম।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥

তাঁহার হস্ত ও পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন, এবং গ্রহণ করেন। চক্ষু নাই, দর্শন করেন। কর্ণ নাই, শ্রবণ করেন।

এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ এব অসাধু কর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্যঃ অধোনিনীষতে ॥

যাঁহাকে এই পৃথিবী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে দিয়া সাধু কর্ম করান, যাঁহাকে অপকৃষ্ট লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে দিয়া অসাধু কর্ম করান ("সবে দেন সুমতি কুমতি")।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন, আদিদেব ভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, ("তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"-উপনিষদ) তখন তাঁহার শরীর হইতে আদ্যা-শক্তি মহা-মায়ার উৎপত্তি হইল। এই আদ্যাশক্তি সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন

পরম পুরুষ পুরাতন।

শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি

সৃজনের উপায় কারণ ॥

চিন্তিতে এমন কাজ একচিত্তে দেব রাজ
তনু হৈতে নির্গত প্রকৃতি।

আদিদেব নিত্য শক্তি ভুবন-মোহন মূর্ত্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী॥

অতএব উভয় মঙ্গল-কাব্যে শক্তির স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শক্তির শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুরূপ। মঙ্গল-কাব্যগুলির আখ্যান ভাগেও এই ব্যখ্যার মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। কারণ ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরকে দুঃখ ও বিপদে ফেলিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁহারা যেন দর্প ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হন, এবং বিশ্বপিতা ও জগজ্জননীকে অভিন্ন জানিয়া পূজা করিতে শিক্ষা করেন। ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' বাঙ্গালাভাষায় মঙ্গল-কাব্য নামক প্রবন্ধে ইহা দেখান হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সংসারে যারা পীড়িত যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোন ধর্ম্মসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্চে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকে সকল দুঃখের কারণ ব'লে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গল-কাব্যের প্রেরণা।" হিন্দু পূর্ব্বজন্ম এবং কর্ম্মফল বিশ্বাস করে। সংসারে মানব যত দুঃখ কষ্টপায়, সকলই তার ইহ-জন্মের বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল, ইহাই সে মনে করে। দরিদ্র, নিরক্ষর সকলেই এই তত্ত্বের সহিত সুপরিচিত; তাহাদের বিশ্বাস শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা বোধ হয় দৃঢ়তার কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি অনেকে ইহাকে কুসংস্কার মনে করেন। সুতরাং সংসারে যখন বড়বেশী দুঃখ কষ্ট পাইতে হয় অথচ তাহার কোন "ধর্ম্ম-সঙ্গত কারণ" দেখিতে

পাওয়া যায় না, তখন দুঃখ ক্লিষ্ট হিন্দু বিনা দোষে নির্ব্বাসিতা সীতা দেবীর ন্যায় বলে,—

মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জ্জথুরপ্রসহ্যঃ।

অর্থাৎ ইহা আমার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল।

যাহাদের পূর্ব্বজন্মে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস নাই, তাহাদের জন্য দুঃখ কষ্টের কারণ স্বরূপ "স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধ" কল্পনা করা প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্মফলে বিশ্বাস যুক্ত হিন্দুয় এ কল্পনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছের, "শক্তি-পূজার যে অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সহিত জড়িত" সে অর্থ "শাস্ত্রে নিগূঢ়" অর্থ হইতে ভিন্ন। "সাধারণ লোকের মনে পূজার সঙ্গে একটা নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বল পূর্ব্বক দুর্ব্বলকে বলি দেবার ভাব সঙ্গত হয়ে আছে।" বাঙ্গালাদেশে শক্তিপূজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত ও সুপরিচিত রূপ হইতেছে দুর্গা-পূজা। এতবড় পূজা বাঙ্গালীর আর নাই। সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ান্দোলক এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান অন্য কোন জাতির মধ্যে আছে কি না জানি না। দুর্গাপূজার সময় বাঙ্গালী কি মনে করে যে, দুর্গা-পূজায় উদ্দেশ্য "স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধ" প্রশমিত করা, "ঈর্ষা-পরায়ণ শক্তিকে স্তব দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করা"? আমাদের ত মনে হয়, অনন্ত করুণা ও অসীম শক্তির আধার পরমেশ্বরকেই বাঙ্গালী জগজ্জননী দুর্গা রূপে পূজা করে। অসুর-বিনাশিনী রূপে বাঙ্গালী দুর্গার প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। দুর্গা যদি স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তি, ঈর্ষা-পরায়না শক্তি হইলেন, তাহা হইলে অসুর কোন শক্তির প্রতিরূপ হইবে? দুর্গার উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী কন্যা রূপে শোভা পান। ইহারা কি

নিষ্ঠুর শক্তি হইতে উৎপন্ন ও নিষ্ঠুর শক্তির সহায়কারিণী? দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ যে আগমনী-সঙ্গীতে প্লাবিত হয়, তাহা নিষ্ঠুর ঈর্ষা-পরায়ণা শক্তিকে প্রসন্ন করিবার স্তব, না স্নেহময়ী জননীকে বরণ করিবার গাথা? বহুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথই গাহিয়াছিলেন,

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে

অন্যায় কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তিকে কি আনন্দময়ী বলা যায়? এরূপ শক্তির আগমনে দেশ আনন্দে ছাইয়া যায়,—না, ভয়ে স্তব্ধ হইয়া থাকে? প্রতিবৎসর বিজয়া-দশমীর দিন লক্ষ-লক্ষ বাঙ্গালী জোড়হস্তে প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাকে বিদায় দিবার সময় আবেগস্খলিতকণ্ঠে মন্ত্র পড়ে,

সর্ব্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে॥

তখন তাহারা কি নিষ্ঠুর শক্তির কথা ভাবে, না তাহাদের হৃদয়ে নিখিল জগতের কল্যাণ-বিধায়িনী মাতৃমূর্ত্তি জগিয়া উঠে? "সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে" এই মন্ত্র প্রত্যেক হিন্দু উচ্চারণ করিয়াছে। নিরক্ষর নর-নারী বালক-বালিকা পর্য্যন্ত ইহার সরল অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ। ইহা "শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ" নহে।

যে ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যায়কারিণী, ছলনাময়ী, স্বেচ্ছাচারিণী, ঈর্ষা-পরায়ণা নিষ্ঠুর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, যে শক্তিকে তিনি শিবের ঘোরতর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন মনে করিয়াছেন এবং কল্পনার নেত্রে যাঁহাকে তিনি শিবের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অশোভন ভাবে উদ্যত দেখিয়াছেন, সে শক্তির সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কিরূপ

কাহিনী প্রচলিত? প্রথম জন্মে ইঁহার নাম সতী; ইনি শিবের পত্নী, পিতৃ-মুখে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (সতী-ই কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন)। দেহত্যাগের পর ইনি মেনকার কন্যা গৌরী বা দুর্গা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুর কল্পনায় যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র, স্নেহ-প্রেম-করুণার উৎকর্ষ রূপে হিন্দু যাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছে, সকলই "গৌরী" বা "দুর্গা" এই নামের সহিত বিজড়িত। মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য আমরা গৌরীকে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখিতে পাই; সে তপশ্চরণ এত কঠোর যে, গৌরী তপস্বিদেরও আদর্শ হইয়াছিলেন;—

তপস্বিনা মপ্যুপদেশতাং গতং।

বিবাহের পূর্ব্বেও তিনি মহাদেবের নামে এরূপ তদ্গতচিত্ত যে,

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠাপিতবাহুবন্ধনা॥

রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি ক্ষণকালের জন্য চক্ষুনিমীলন করিয়া সহসা জাগিয়া উঠিয়াছিলেন এবং "হে নীলকণ্ঠ তুমি কোথায় যাইতেছ" এই বলিয়া শূন্যস্থানকে কণ্ঠ মনে করিয়া বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন।

গৌরী পিতার নয়নের মণি। গৌরী পিত্রালয়ে আসিতেছে শুনিয়া মেনকা আনন্দে দিশেহারা। গৌরী স্বামীর আদরের পত্নী, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী। শক্তি বা মহামায়া সম্বন্ধে এই কাহিনী প্রচলিত। ইহা শাস্ত্রিক ব্যাখ্যা বা পুরাণের কথা বলিয়া অবহেলা করা যায় না। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী উভয় গ্রন্থেই এই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু-নরনারী এই কাহিনীর সহিত সুপরিচিত।

"উলঙ্গ নিদারুণতা" উল্লেখ করিয়া সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ কালীমূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যে কালীপূজার কথা বিশেষ কিছু নাই, দুর্গাপূজার প্রচারই মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য। কালীমূর্ত্তির মধ্যে অবশ্য ভয়ঙ্করভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট—যদিও কালীর সেই ভয়ানক ভাবের মধ্যেও তাঁহার দুই হস্ত সন্তানকে বর ও অভয় প্রদান করিবার জন্য প্রসারিত থাকে। ভগবানের মধ্যে যেমন অনন্ত করুণা আছে, সেইরূপ অতি ভয়ানক ভাবও নিহিত আছে। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, আগ্নেয়-গিরি অগ্ন্যুদ্গীরণ, ভীষণ সমরক্ষেত্র, এই সকল প্রলয়ঙ্করী লীলার মধ্যে ভগবানের ভয়ানক রূপ পরিস্ফুট হয়। আবার প্রলয়ের পর নূতন সৌন্দর্য্যে সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠে। একদিন ভেস্থভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল সমৃদ্ধিশালী নগর বিনষ্ট হইল, অসংখ্য নরনারী বালক-বালিকা দুগ্ধপোষ্য শিশু যাহাতে জীবন্ত সমাহিত হইল, সেই স্থানেই আবার কালের আশ্চর্য্য ক্রীড়ায় নূতন গ্রাম নূতন নগরের আবির্ভাব হইল; আবার মানব গৃহ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া বসবাস করিতে লাগিল। শিশুর কলহাস্যে গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইল। ইহারই মধ্যে হয় ত পুনরায় অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া নগরবাসিগণের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—নগর আবার শ্মশান সদৃশ হইল। পরম মঙ্গলময় ভগবানের বিধানে কেন যে ইহা হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। হয় ত তিনি দেখাইতে চাহেন, দেখ, আমার করুণা অনন্ত, আমার সৌন্দর্য্য অনন্ত,—প্রলয়েও তাহা ফুরাইয়া যায় নাই। হয় ত তিনি দেখাইতে চাহেন যে, তাঁহার মধ্যে যে অসীম আনন্দ নিহিত আছে, তাহা সাংসারিক সুখ-দুঃখের অতীত; সংসারের সুখদুঃখ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনিই জানেন, কিন্তু তিনি যে মধ্যে মধ্যে

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ

এইরূপ ধারণ করেন, তাহা নিশ্চিত; তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ভগবানের সম্বন্ধে শুধু—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং
মধুগন্ধি মধুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং

—বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না; বলিতে হয়, তিনি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।"

উপনিষদ ব্রহ্মকে "উদ্যত বজ্রের" ন্যায় ভয়ানক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন;

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

"এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সেই প্রাণ কম্পন করিলে নিঃসৃত হয় (উৎপন্ন হয়), সেই প্রাণ উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক, তাহাকে যাহারা জানে তাহারা অমৃত হয়। [এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, অন্য অর্থ হইতে পারে না—"কম্পনাৎ" এই সূত্রের ভাষ্য দেখুন, ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়, ৩ পাদ, ৩৯ সূত্র শঙ্করভাষ্য]।

'বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ গীতা ১১।২৭

এই লোমহর্ষকর ভয়ানক চিত্র কোন শাক্ত কবি অঙ্কিত করেন নাই, ইহা পরম-ভাগবত বৈষ্ণব কবির অঙ্কিত চিত্র। কালী-মূর্ত্তিতে ভগবানের এই ভয়ানক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাতে

শুধু ভয়ানক ভাব ফুটিয়া উঠে নাই, কালীর দুই হস্তে যেমন খড়্গ ও নরমুণ্ড, সেইরূপ অপর দুই হস্তে তিনি বর ও অভয় দান করিতেছেন। কালী-মূর্ত্তির মধ্যে ভয়ানক ভাব আছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন অন্যায়-কারিণীর ভাব নাই; এবং সাধক ও ভক্তগণ যে কালীর এই ভয়ানক মূর্ত্তির মধ্যে অসীম স্নেহশালিনী জননীর সন্ধান পাইয়াছেন, ইহা বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণের নিকট সুবিদিত। হিন্দু কালীকে জননী বলিয়া সম্বোধন করে। সে বলে, "আমার জননী যত ভয়ানকরূপ ধারণ করুন, তাহাতে আমার ভয় কি? সন্তান কেন জননীর নিকট ভয় পাইবে? আমার স্নেহশালিনী জননী ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন এজন্য, যাহাতে জরা মৃত্যু, বিপদ প্রভৃতি সাংসারিক ভয় নিকটে আসিতে না পারে। আমি যখন এমন মায়ের সন্তান, তখন সংসারে কোন দুঃখ বা বিপদকে আমি ভয় করিব না। আমি সকল ভয়ের অতীত হইয়া জননীর শ্রীচরণে আমার অভয় প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইব।"

"ওরে শমন, কি ভয় দেখাও মিছে
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছ সে মোরে অভয় দিয়েছে"
"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি শমন-ভয় রেখেছি
কালী-নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।"

প্রভৃতি গানে রামপ্রসাদ এইরূপ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন; এই সকল গান বাঙ্গলার পথে ঘাটে গীত হইয়া থাকে; কৃষক, মজুর, মুদি প্রভৃতিও ইহা শুনে এবং ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করে।* যে মূর্ত্তি সাধনা

* উপনিষদে এইরূপ ভাবেরমূল দেখিতে পাওয়া যায়—

ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চমৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ কঠোপনিষদ ৬।৩

করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আধ্যাত্ম জগতের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, আমার অক্ষম লেখনীর দ্বারা সে মূর্ত্তির উপযোগিতা স্থাপন করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস অনার্য্যদের দেবতাকে একদিন আর্য্য ভাবের দ্বারা শোধন করে' স্বীকার করে' নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধু-সমাজে প্রবেশলাভ করেছিলেন, তাদের চরিত্রে অসঙ্গতি একেবার দূর হতে পারেনি, তাদের মধ্যে আজও আর্য্য অনার্য্য দুই ধারা মিশ্রিত হ'য়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্য্য-ধারারই প্রবলতা অধিক।" অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও খৃষ্টান পাদ্রির মত এইরূপ, তাহা আমরা জানি। অনার্য্যদের নিকট হইতে কোন পূজা গ্রহণ করা অন্যায় বা লজ্জাকর, আমরা তাহা বলিতে চাহি না। ভগবানের পূজা যাহারাই করুক,—অনার্য্যই করুক, আর হিন্দুই করুক —সে পূজা ভক্তির সহিত নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তবে একটা কথা— এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্য্যরা ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছিল; আর্য্যদের

এই কথাই আবার,—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৮

এখানে অন্যান্য দেবতার ন্যায় মৃত্যুও ব্রহ্মের ভয়ে নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন বলা হইয়াছে। এই "উদ্যত বজ্রের" ন্যায় ভয়ানক ব্রহ্মকে জানিলে অমৃতত্ব হয়,—

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

হস্তে অনার্য্যদের লাঞ্ছনার আর সীমা ছিল না; আর্য্যরা অনার্য্যদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত; দস্যু, তস্কর রাক্ষস ব্যতীত তাহাদের নাম উল্লেখ করিত না। তাহাদের নিকট আর্য্যরা পূজা গ্রহণ করিবে, ইহা কি সঙ্গত? আর যেমন-তেমন পূজা নহে। শিব-পূজা ও শক্তি-পূজা সকল প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে যতদূর প্রচলিত অন্য কোন পূজা ততদূর প্রচলিত নহে। বস্তুতঃ, অনার্য্যদের নিকট হইতে গৃহীত বলিলে হিন্দুর দেব-দেবীর পূজা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, এই ধারণাতেই কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। নচেৎ ইহার কোন অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই এবং ইহাতে যে তাঁহাদের অপর একটা মতের সহিত অসঙ্গতি হয়, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। বেদে রুদ্রদেবের উপাসনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। (ঋগ্বেদ ১।১১৪ এবং যজুর্বেদ শতরুদ্রীয় দ্রষ্টব্য) আজিও ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যায় "ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ" এই বৈদিক মন্ত্রে রুদ্রদেবকে পরব্রহ্ম-রূপে পূজা করিয়া থাকে। কেনোপনিষদে "হৈমবতী উমার" উল্লেখ রহিয়াছে। তথাপি কি স্বীকার করিতে হইবে, শিবপূজা ও শক্তিপূজা অনার্যদের নিকট হইতে আর্য্যরা গ্রহণ করিয়াছিল?

আর ইহাই বা অনার্য্যদের প্রতি কিরূপ সুবিচার যে, শিব-পূজা ও শক্তি-পূজার মধ্যে যাহা কিছু গর্হিত, তাহার জন্য অনার্য্যরাই দায়ী? অনার্য্যদের এই অপবাদ আর্য্যরা করিতেছেন না; যাঁহারা সর্ব্বদা অনার্য্যদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আর্য্যদের নিন্দা করেন, তাঁহারা করিতেছেন। আর্য্যরা বলিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মে যাহা কিছু দোষের আছে, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অনার্য্যদিগকে মিথ্যা অপবাদ দিতেছ। দেবতাদের নিকট পশু-বলি বেদে বিহিত আছে; তাহাতে যদি কিছু দোষ থাকে (হিন্দু বেদে বিশ্বাস করে, তাহার মতে বেদবিহিত

কর্ম্মে দোষ থাকিতে পারে না) সে দোষ আর্য্যেরই, অনার্য্যদের নিকট হইতে আর্য্যরা পশু-বলিশিখিয়াছে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের শিব এবং শক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক আর একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গল-কাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই।" শাস্ত্রিক ও লৌকিক শক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা যেমন কাল্পনিক, শাস্ত্রিক ও লৌকিক শিবের পার্থক্যও সেইরূপ কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, শাস্ত্রিক শিব যতী বৈরাগী, লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে শিবের যেরূপ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তপস্যা ও বৈরাগ্যের সহিত উন্মত্তবৎ আচরণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে আচরণ বাস্তবিক উন্মত্তের আচরণ নহে, কিন্তু বিধি নিষেধের অতীত অবস্থার আচরণ বলিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে উন্মত্তবৎ প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্রে শিবকে যে কেবল যতী ও বৈরাগীভাবে দেখান হইয়াছে, তাহা নহে ; শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস-কারী ক্রুদ্ধ প্রলয়ঙ্কর রূপও দেখান হইয়াছে, আবার তাঁহাকে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পত্নী-বিয়োগবিধুর অসহ্য শোকাহত উন্মত্তের ন্যায় দেখান হইয়াছে। সে সকল চিত্র যতী বৈরাগীর চরিত্র-অনুযায়ী নহে। অন্য দিকে মঙ্গল-কাব্যে ও বহুস্থানে শিবের কঠোর তপস্যার উল্লেখ দেখা যায় আমরা অন্নদা মঙ্গলে দেখিতে পাই, আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তপস্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মহাদেবের তপস্যাই প্রগাঢ়তম। ভারতচন্দ্র শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

যোগীর অগম্য হ'য়ে সদা থাক যোগ ল'য়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান।
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া।

অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠার সময় শিবকে পুনরায় কঠোর তপস্যানিরত দেখিতে দেখিতে পাই।

এইরূপে তপস্যায় গেল কত কাল
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল॥

যে-সকল বিভিন্ন গুণ সাধারণ মানবের চরিত্রে বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, শিবের মহিমময় চরিত্রে তাহারা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে ইহাই শিবের চরিত্রের মূল তত্ত্ব। তপোবনের প্রভাবে বনের পশুগুলি যেমন পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করে, সমুদ্রে আসিয়া সকল নদ-নদীর বিভিন্ন গতি যেমন এক হইয়া যায়, সেইরূপ মহাদেবের লোকাতীত চরিত্রে বৈরাগ্য ও ভোগ, ক্ষমা ও ক্রোধ প্রশান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাই তিনি মঙ্গলস্বরূপ হইলেও শ্মশানে তাঁহার অবস্থান, সর্প ও নরকপাল তাহায় ভূষণ, ভূতগণ তাঁহার অনুচর, চিতা-ভস্ম তাঁহার অঙ্গরাগ।* এই সকলই ত উন্মত্তবৎ আচরণ। এজন্য

* The serpents whom all the world hates and refuses come to **Kailash**, and **Mahadev** finds room for them in **His Great Heart**. And the tired beasts come, for **He** is the **Refuge**

যখন ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী তপস্যা-নিরত গৌরীর নিকট শিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন রোষ-পরবশা গৌরী ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,

ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাং
অলোকসামান্য মচিন্ত্যহেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং ॥

অর্থাৎ মহাত্মাদের চরিত্র অচিন্ত্যনীয়, তাই মন্দ ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিন্দা করেন। শ্মশান-চিতা-ভস্ম ও নর-কপাল, সর্প ও বিষ, লোকে যাহা কিছু অশুভ ও অমঙ্গল জনক মনে করে,সকলের মধ্যেই যে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপ বর্ত্তমান; জ্ঞানীপুরুষের আচরণ কথনও কথনও উন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে—"জড়োন্মত্তপিশাচবৎ" এই সকল তত্ত্ব শিবের চরিত্রে দেখা যায়। শিবের বর্ণনা শাস্ত্রে যেরূপ, কুমার সম্ভবে কালিদাস যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, মঙ্গল-কাব্যের কবির বর্ণনাও সেইরূপ, সাধারণলোকের ধারণাও তাহা হইতে ভিন্ন নহে। একই বিষয় বিভিন্ন কবি বর্ণনা করিলে সেই সকল বর্ণনার মধ্যে যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়, পুরাণে, সংস্কৃত কাব্যে ও মঙ্গল-কাব্যে শিবের যে সকল বর্ণনা আছে তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বেশী পার্থক্য নাই, শাস্ত্রের যে মূল তত্ত্ব, তাহা সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

of animals—and one of them, a shabby old bull, He specially loves and rides upon. And last of all, come the spirits of all those men and women who are troublesome and queer,—the bad boys and girls of the grown up world you know—Sister Nivedita (Modern Review, September 1919. ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হইয়াও শ্রদ্ধার প্রভাবে যে তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, আমাদের স্বদেশবাসী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা লইয়াও বিদ্বেষবশতঃ তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুর শাস্ত্র ও দর্শনের তত্ত্বগুলি মাত্র কয়েকজন পণ্ডিতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। কবি সেই তত্ত্বগুলি অবলম্বন করিয়া কাব্য নাটক প্রভৃতি রচনা করেন, যাত্রা ও কথকতাচ্ছলে দরিদ্র নিরক্ষর সকলের মধ্যে তাহা প্রচারিত হয়; শিল্পী মন্দির-গাত্রে তাহা উৎকীর্ণ করে; গায়ক সেই সকল বিষয়ে গীত গাহিয়া বেড়ায়; ফলতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট সেই সকল মূল্যবান তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ প্রতিভা প্রয়োগ করে। ইহার ফলে, ভারতের নিরক্ষর কৃষকের নিকট যেরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান ও গভীর ভক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে, সেরূপ অন্য কোন দেশে সম্ভব কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্য জগতে দর্শনের তত্ত্ব পণ্ডিতদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সাধারণে তাহা বোঝে না, সাধারণের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। এবং সেই জন্য তাহার প্রকৃত মূল্য কমিয়া যাইতেছে। দর্শনের তত্ত্বগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করার যদি ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে এরূপ হইতে পারিত না। সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ একটী সহজ জ্ঞান আছে যে, তাহারা খাঁটি জিনিষ হইতে বাজে জিনিষ অনায়াসে পৃথক করিয়া দিতে পারে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি এক নিরীশ্বর দার্শনিক মত প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে এত সূক্ষ্ম বিচার, এমন কৌশল্যের সহিত বাক্যবিন্যাস থাকিতে পারে যে, বিদ্বৎসমাজে ঐ মতের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা হওয়া দুরূহ, কারণ সাধারণ লোক সে সকল সূক্ষ্ম তর্কে ভুলিবে না; তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে এই মতের মূল তত্ত্ব কি? এবং মূল তত্ত্বে নিরীশ্বরবাদ দেখিতে পাইয়া সকল সূক্ষ্ম তর্ক সত্ত্বেও তাহাতে আস্থা স্থাপন করিবে না। পাশ্চাত্য

জগতে দার্শনিক তত্ত্বের উপর সর্ব্বসাধারণের এই প্রভাবটি নাই বলিয়াই সেখানে নাস্তিকতা (Atheism). স্বার্থপরতা (Utilitarianism) ভোগাসক্তি (Materialism) পরজাতিদ্রোহ (তথাকথিত "patriotism)" পাণ্ডিত্যের মুখোস পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পরন্তু, ভারতবর্ষে কতকটা সাধারণের স্বাস্থ্যকর প্রভাবের ফলে চার্ব্বাকপ্রমুখ পণ্ডিতদের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ নিরীশ্বরবাদ। কিন্তু সেভাবে তাহা সাধারণের নিকট আদর পায় নাই। যতক্ষণ না এই সাংখ্য-দর্শনের সহিত ঈশ্বর-বাদ মিলিত হইয়াছিল (যেমন ভগবদ্গীতাতে) ততদিন সাধারণের নিকট তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

শক্তি-পূজার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একটী কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটী ভাব্‌বার কথা আছে, পশু-বলি বা নিজের রক্তপাত এমন কি নর-বলি স্বীকার করে' মানৎ দেবার প্রথা শক্তি-পূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলার জয় থেকে সুরু করে' জ্ঞাতি-শত্রুর বিনাশ-কামনা পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তি-পূজায় স্থান পায়।" চোর বা কলহপ্রিয় ব্যক্তি তাহার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে তাহাতে ভগবানের নাম খারাপ হইয়া যায় না। যতদিন জগতে চোর থাকিবে, মিথ্যা মামলাবাজ লোক থাকিবে, ততদিন তাহারা অনেকেই চুরি করিবার জন্য বা মিথ্যা মামলার জন্য ভগবানকে ডাকিবে। প্রদীপের আলোতে কেহ ভাগবৎ পড়ে, কেহ নোট জাল করে (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)। প্রদীপকে কি তাহার

কৈফিয়ৎ দিতে হইবে? না, সেজন্য আইন হইবে, কেহ প্রদীপ জ্বালিবে না? মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, চোর, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে নাই? এবং কোন ধর্ম্মাবলম্বী দুষ্ট লোক অন্যায় উদ্দেশ্যে কখনও ভগবানকে ডাকে নাই? ইংরাজীতে একটী কথা আছে Devil quoting the scripture অর্থাৎ শয়তান বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করে। ইহা হইতে যদি কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে বাইবেল অতি খারাপ পুস্তক তাহা হইলে তাঁহার যুক্তি অনেকটা রবীন্দ্রনাথের যুক্তির অনুরূপ হইবে। যদি কেহ মনে করেন, কালীর মূর্ত্তি ভয়ানক বলিয়াই দস্যু ও ঠগী ভাবে যে, তাহার ভয়ানক কার্য্যে কালী সাহায্য করিবেন, তাহা হইলে এরূপ আপত্তিও তোলা যাইতে পারে, কেহ যেন প্রচার না করেন যে, ভগবানের অসীম করুণা, কারণ তাহা হইলে পাপী ভাবিবে, "এখন ত যত ইচ্ছা পাপ করিয়া যাই। শেষকালে একবার ভগবানকে ডাকিলেই হইবে; তাঁহার যখন অসীম করুণা, তখন নিশ্চয়ই দয়া করিবেন।" বাস্তবিক পক্ষে, সকল প্রকার শুভ তত্ত্বই দুষ্ট লোকের দ্বারা বিকৃত হইতে পারে; তাহাতে লোকের দুষ্ট প্রকৃতি প্রমাণিত হয়, তত্ত্বটি খারাপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। সাধারণ লোকে শক্তি-পূজার সময় দস্যু ও ঠগীর কথা ভাবে না, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস কেমন করিয়া পূজা করিতেন, তাহাই ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ উপসংহার-কালে বলিয়াছেন, "কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোন ধর্ম্ম-সাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোন বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে, তবে তাকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। এমন কি ভূরি-পরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকেই বড় বলে জানা চাই।" কিন্তু বাতায়নিকের পত্রে শক্তি-পূজার তিনি যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শক্তি-পূজার এই উচ্চ

অর্থটি তিনি বড় বা ছোট কোন ভাবেই স্বীকার করেন নাই। অধিকন্তু ইহা যথার্থ নহে (এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি) যে, শক্তি-পূজার উচ্চ অর্থ কোন বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যেই নিহিত আছে। শাস্ত্র ও সাধক যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন কাব্য, গান, কথার মধ্য দিয়া সেই অর্থই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। অন্য সকল শুভ অনুষ্ঠান যেমন স্থানে স্থানে দুষ্ট লোক দ্বারা বিকৃত হয়, শক্তি-পূজাও সেইরূপ কোথাও কোথাও বিকৃত হইয়াছে মাত্র। হিন্দুরা বড় বেশী শাস্ত্র মানিয়া চলে, বহুকাল পূর্ব্বে শাস্ত্রে যাহা লেখা হইয়াছিল, আজও হিন্দু তাহা ধরিয়া অচল হইয়া বসিয়া আছে, কিছুতেই নড়িতে চাহে না, ইহা রবীন্দ্রনাথেরই অভিযোগ; পুনরায় যদি রবীন্দ্রনাথ বলেন যে ধর্ম্ম-বিষয়ে হিন্দুরা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অর্থের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাঁহার উভয় উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।

নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সমীপেষু,—

অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে আপনার প্রবন্ধ "নারীর কর্ত্তব্য" পাঠ করিলাম।

মা, আপনার বিদ্যাবুদ্ধি সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেই সার্থক হইত, যেমন শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর হইয়াছে। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের এবং দুঃখের বিষয় যে, আপনি কোথায় শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর এই শুভ চেষ্টায় তাঁহার সহায় হইবেন, তাহা না হইয়া

আপনি অতিশয় উষ্ণতার সহিত তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আপনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বাঙ্গালা লিখিতে জানেন না, তাঁহার ভাষা বড়ই শ্রুতিকটু, তাঁহার রচনার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই, তাঁহার জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এ সব কিছুই তিনি জানেন না। বলা বাহুল্য, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে আক্রমণ করিবার আগ্রহে আপনি কতকগুলি ভ্রান্ত বাক্য বলিয়াছেন। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলিয়াছেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন,—এক ভাগ নর, অপর ভাগ নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও এ কথা নাই। এই প্রসঙ্গে আপনি অশোভন উল্লাসের সহিত শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, পূর্ব্বমীমাংসা, এবং শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, ভাস্করাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ও মনীষীর গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কোথাও এই অপরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব দেখা যায় না। অথচ বৃহদারণ্যক উপনিষদেই এই সৃষ্টিতত্ত্ব পাওয়া যায়।

"স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্"

১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

"তিনি (প্রজাপতি) এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিল।"

দেখা যাইতেছে যে, আপনি আপনার প্রবন্ধে বেদবেদান্ত এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন অথচ সে সকল গ্রন্থ পড়েন নাই।

ইহা মনে করিবার আর একটি কারণ এই যে, আপনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিরোধ দেখা যায়। ব্রহ্মসূত্রের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় থাকিলে আপনি এ ভুল করিতেন না। আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসৃষ্টির পর প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত বিরাট দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যে সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ভুল দেখাইতে গিয়া আপনি এইরূপ শোচনীয়ভাবে নিজ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পরই বলিয়াছেন, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর এই ভাবে যেখানে সেখানে বেদান্তবাক্য ভ্রান্তভাবে উদ্ধৃত করা, হোলির সময় বালকদের যেখানে সেখানে অশ্লীল গান গাহিয়া বেড়ানর মতই অশোভন হইয়াছে। বলিতে বাধ্য হইলাম যে, এই উপমাটি বড়ই কুরুচির পরিচয় দিতেছে। অধিকন্তু ভুল শ্রীমতী অনুরূপা দেবী করেন নাই, ভুল আপনিই করিয়াছেন। দুইটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। আর একটি আপনার ভুল দেখাই। আপনি একটি বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"একোঽহং বহু ষ্যাম্"। এরূপ বাক্য বেদান্তে নাই, আছে "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়"।

আপনার বহু অবান্তর-কথায় পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির মধ্যে বক্তব্য বিষয় এই,—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী পরিণতবয়সে বিবাহ, স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং যৌথ-পরিবার-প্রথা লঙ্ঘন করা—এইগুলির নিন্দা করিয়াছেন। ইহাতে আপনার বড় ক্রোধ হইয়াছে। আপনি বলিয়াছেন, "মুসলমান শাসনের মধ্যযুগে তদানীন্তন দেশকালের প্রয়োজনবোধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নবপ্রবর্ত্তিত সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের সনাতন শাস্ত্রীয়

বিধান ব'লে প্রচার" করা হইতেছে। ইহা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যে প্রথাগুলির নিন্দা করিয়াছেন, মনুসংহিতাতে প্রায় সবগুলিরই নিন্দা আছে। অতএব আপনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে, এগুলি মুসলমান যুগের নিদর্শন? মনু বালিকার বিবাহের বয়স ৮ হইতে ১২ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরিণতবয়সে নহে। (৯।৯৪)। স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ (৩।৩২), মনু গান্ধর্ব্ব বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন (৩।৪১)। ইহাকে দুর্ব্বিবাহ বলিয়াছেন। (৩।১২) শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সবর্ণা স্ত্রী প্রশস্তা। ৩।১৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রা স্ত্রী নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৩।১৫ শ্লোকে ৩।১৫ শ্লোকে হীনজাতি হইতে স্ত্রী গ্রহণ করার অত্যন্ত নিন্দা করা হইয়াছে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে ৫।১৬০। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে "সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।" * বিবাহ-বিচ্ছেদের নিন্দা আছে ৫।১৫৬, ৫।১৬৩। অবশ্য মনুর বিধান আপনি মান্য করিবেন, এরূপ আশা করি না। তথাকথিত প্রগতিশীল দলের মধ্যে অনেকে হয় ত মনে করেন, বিবাহ একটা অনুন্নত যুগের প্রথা, উহা উঠাইয়া দিয়া অস্থায়ী চুক্তি প্রবর্ত্তন করাই উচিত। সুতরাং মনুর বচন তুলিয়া আপনাদের মত-পরিবর্ত্তন করা যাইবে, এ আশা নাই। তথাপি যে তুলিলাম—তাহার কারণ, আপনার ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া; আপনি যে বলিয়াছেন, হিন্দুর বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা-সমূহ প্রাচীন প্রথা নহে, মুসলমান যুগে এই সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, আপনার এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

---

* ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। মনু ৯।৬৫

"বিবাহবিধিতে বিধবার পুনরায় বিবাহের কথা কোথাও নাই।"

ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ-মৃতে পরস্য তু। মনু ৫।১৫৭

"পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না।"

পুরাণে ও সংস্কৃত সাহিত্যে কয়েকটি স্বয়ম্বরের দৃষ্টান্ত আছে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে যুগে বালিকা-বিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। অধিকন্তু সে সকল স্থলেও মনুর অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করা হয় নাই। মনুর অভিপ্রায় এইরূপ যে, ঋতুর পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ হইবে (৯।৯৪)। বড় জোর ঋতুর পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যায় (৯।৯০)। যদি তাহার মধ্যে কন্যার পিতা বা অভিভাবকগণ তাহার বিবাহ না দিতে পারেন, তাহা হইলে কন্যা আর অপেক্ষা করিবেন না, স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিবেন। স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করা, নিন্দনীয় (মনু ৩।৪১)। কিন্তু বিলম্বে বিবাহ আরও নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে যাহা কম নিন্দনীয়, মনু তাহারও বিধান দিয়াছেন। ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহই সাধারণ নিয়ম, (৯।৯৪)। বিলম্বে বিবাহ এবং স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত বিবাহ ইহার ব্যতিক্রম। *

আপনি লিখিয়াছেন, সীতা স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত পতি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই আশ্চর্য্য তত্ত্ব আপনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? সীতার পতি তাঁহার পিতা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রীতিমত বাল্যবিবাহই হইয়াছিল। তখন শ্রীরামচন্দ্রের বয়স ছিল পনের "উনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ" এবং সীতার বয়স ছিল সাত।

* মনু ৯।৮৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

"কন্যা ঋতুমতী হইলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত গৃহে থাকুক, ইহাও ভাল, কিন্তু গুণহীন পাত্রে ইহাকে কখনও অর্পণ করিবে না।" এই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সাধারণতঃ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সদ্‌গুণসম্পন্ন পাত্র না পাওয়া গেলে ঋতুর পরেও বিলম্ব করা যায়। ৯।৯০ শ্লোকে মনু বলেন,

অরণ্যকাণ্ড, ৪৭ অধ্যায়, ৪, ১০, ১১ শ্লোক দেখুন।

আপনি পরাশরের শ্লোক তুলিয়াছেন,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্ব নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

আপনি বলিয়াছেন যে, এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ বা divorceএর বিধান পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। পরাশর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যেরই প্রশংসা করিয়াছেন, বলিয়াছেন,—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥"

"স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি ব্রহ্মচারীর ন্যায় মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন।" মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থেও স্বামী জীবিত থাকুন, অথবা মৃত হউন, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের নিন্দা আছে। সেই সকল

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥

কুমারী ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, পরে স্বজাতীয় পতি স্বয়ং বরণ করিবে।

ইহার পরের শ্লোক এই :—

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি ॥

"পিতা প্রভৃতির দ্বারা বিবাহ দেওয়া না হইলে, কন্যা যদি স্বয়ং পতিবরণ করে, তাহা হইলে তাহার কোনও পাপ হয় না, বরেরও কোন পাপ হয় না।"

এই শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সচরাচর পিতা বা অন্য অভিভাবকই পাত্র মনোনয়ন করিবেন; পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কন্যা স্বয়ং পাত্র মনোনয়ন করিলে পাপ হইবে। কিন্তু ঋতুর পর তিন বৎসরের মধ্যেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে কন্যা স্বয়ং পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন, তাহাতে দোষ হইবে না।

বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আপনার উদ্ধৃত পরাশরবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নচেৎ যেরূপ ব্যাখ্যায় পরাশরের নিজের বাক্যগুলিই পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যে মনুস্মৃতিতে পরাশরের গ্রন্থের প্রারম্ভে অত্যন্ত প্রশংসা করা হইয়াছে, সে মনুস্মৃতির সহিত বিরোধ হয়, সেরূপ ব্যাখ্যা কখনও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এইভাবে সামঞ্জস্যবিধান পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হইবে যে, উক্ত শ্লোকে "পতি" অর্থে বিবাহিত স্বামী নহে, যাহার সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া বাগ্‌দান করা হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি। এ ব্যাখ্যা আপনার বোধ হয় মনঃপূত হইবে না। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা সমর্থন জন্য আপনি প্রাচীন ভারতে আর্য্য জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত দিতে পারেন কি? অতএব আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন;—তাহাতে দুইটি দোষ হইতেছে (১) পরাশরের অন্য বাক্যের সহিত এবং মন্বাদি প্রসিদ্ধ স্মৃতিকারের বাক্যের সহিত বিরোধ হইতেছে, (২) আপনার ব্যাখ্যানুযায়ী কোনও দৃষ্টান্ত প্রাচীন আর্য্য সমাজে পাওয়া যায় না। অপর ব্যাখ্যার কেবল এইমাত্র দোষ যে, পতি শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিতে হইতেছে। সুতরাং কাহার ব্যাখ্যার দোষ বেশী? অপর বাক্যের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য শব্দবিশেষের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যায়, ইহা সুবিদিত। ব্রহ্মসূত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আপনি নব্য তান্ত্রিকদের ধর্ম্মগুরুরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি-প্রতিপাদিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মেই আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, বিধবা-বিচ্ছেদ, অসবর্ণ-বিবাহ, এ সকল কোথাও সমর্থন করেন নাই। তিনি বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন,—পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়েদের লজ্জা ও ভক্তির

প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং প্রগতিশীল যে সকল নারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি যা কিছু ভক্তি দেখান, তাহা কেবলমাত্র মৌখিক ভক্তি, উহা কখনই আন্তরিক ভক্তি নহে।

আপনি বলিয়াছেন, "ভারতের তপোবনবাসী ঋষিগণের দীর্ঘসাধনলব্ধ যে অধ্যাত্মতত্ত্ব, তা শাশ্বত সত্য।" কিন্তু আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে সকল ঋষি এইরূপ দীর্ঘসাধন দ্বারা অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সমাজের কল্যাণের জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থ উপনিষদুক্ত জ্ঞান এবং উপনিষদ্‌বাক্যে পরিপূর্ণ। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে ঋষিদের সাধনালব্ধ দিব্যজ্ঞান বিদ্যমান আছে, আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া বলিয়াছেন, সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক বিধি যুগে যুগেই পরিবর্ত্তনশীল। সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা সকল পরিবর্ত্তনশীল, আপনার এই উক্তি যথার্থ নহে। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিধবা-বিবাহ নিষেধ, বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষেধ, অসমর্ণ-বিবাহ নিষেধ এ সকল মনুর সময় হইতে প্রচলিত আছে, রঘুনন্দনের নূতন ব্যবস্থা নহে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। পরবর্ত্তী স্মার্ত্তকার কেবলমাত্র স্থানবিশেষে অধিকার সঙ্কোচ করিয়াছেন, কোথাও নূতন অধিকার দেন নাই। যেমন পূর্ব্বে নিয়োগপ্রথার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে উহা নিষিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, কলির মানব দুর্ব্বলচিত্ত, পূর্ব্বে যে কার্য্য করিলে পাপস্পর্শের আশঙ্কা ছিল না, এক্ষণে সে কার্য্য করিলে চিত্ত মলিন হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল কোনও কোনও স্থলে পরিবর্জ্জন হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ কিছু পরিবর্জ্জন হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, তাহার কিছুই মানিবার প্রয়োজন নাই, যেরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকেই যুগোচিত পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে করিতে হইবে,—

এ সকল বাক্য স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। এইরূপ পথে চলিলে সমাজের সমূহ অকল্যাণ হইবে। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা স্মৃতিগ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সাধু পুরুষগণ কেহই সে সামাজিক ব্যবস্থার নিন্দা করেন নাই। দার্শনিক সিদ্ধান্ত লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা-বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। সকলেই গীতার বাক্য মানিয়াছেন, গীতা বলিয়াছেন, "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" "কোন্ কার্য্য করা উচিত, কোন্ কার্য্য করা উচিত নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ"—নিজ নিজ বুদ্ধি প্রমাণ হইতে পারে না।

যে সকল ব্যবস্থার ফলে আত্মসংযম, পরোপকার, ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি হয়, বিলাস, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সঙ্কুচিত হয়, প্রাচীন ঋষিগণ গভীর চিন্তা সহকারে সেইরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ সকল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন কখনই প্রয়োজন হয় না। খৃষ্টান ধর্ম্মে যে দশটি অনুশাসন আছে (ten Commandmants). তাহা যুগে যুগে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। আজকাল কোনও কোনও জনপ্রিয় পাশ্চাত্য লেখক প্রচার করিতেছেন বটে যে, এই সকল আদেশ মানিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহারা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী * । খৃষ্টানধর্ম্মের দশটি অনুশাসন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে।

* এক জন বিখ্যাত আধুনিক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, যেখানে শাস্ত্রের আদেশ আছে Thou Shalt, সেখানে আধুনিক নরনারী প্রশ্ন করিবে Why should I ? যেখানে আদেশ আছে Thou Shalt not, সেখানে তাহারা প্রশ্ন করিবে—why Should I not ?

আমাদের ঋষিগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ, উহা এক দিকে বিপথে যাইবার প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবে, অপর দিকে পদস্খলনের সম্ভাবনা কমাইয়া দিবে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সকল সাধুপুরুষ এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন। সামাজিক বিধি-নিষেধ মানুষকে জড় করিয়া দেয় না, বাহ্যবিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি কমাইয়া দিয়া অসীম আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ উপস্থিত করিয়া দেয়।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলিয়াছিলেন, "আর কোনও দেশ এমন ক'রে মতবিরোধের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে পায় নি।" আপনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বিবিধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিবিধ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ত শ্রীমতী অনুরূপা দেবী অস্বীকার করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এত বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকিবার কারণ এই যে, বিভিন্ন মানবের প্রবৃত্তি বিভিন্ন, এক সাধনপথ সকলের উপযোগী নহে। শাস্ত্রকারগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই বিভিন্ন পথ—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে "কোলাহল মারামারি দাঙ্গার" কথা আপনি বড়ই অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। দেশী বিদেশী সকল সমালোচকই হিন্দুজাতির শান্তিপ্রিয়তা ও পরমত-সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছেন। অথচ তাহা আপনার দৃষ্টিতে পড়ে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

আপনি লিখিয়াছেন, "যে দেশে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র ও ষড়্‌দর্শনের মত উচ্চ অধ্যাত্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হয়েছিল, সে দেশে অস্পৃশ্যতাবাদের মত হীন সংকীর্ণতার অস্তিত্ব কি বিস্ময় ও বেদনাকর নয়?" আপনার এই মত, আপনার প্রবল হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষের পরিচায়কমাত্র। অস্পৃশ্যতাবাদ হীন সংকীর্ণতা নহে। ইহা সমগ্র সমাজের পক্ষে কল্যাণকর স্বাভাবিক নিয়ম। ইহার ফলে উচ্চ জাতির পক্ষে শৌচাচার রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা

নীচজাতিকে পূর্ব্বজন্মের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ করিয়াছে। বিলাতী হোটেলের ভোজনপাত্রগুলি আপাততঃ পরিষ্কার দেখায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সেগুলি উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণায় পরিপূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। প্রত্যহ ধৌতবস্ত্র পরিত্যাগ করা, মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচাচার পালন করা, প্রাতঃকালে দন্তমঞ্জন করা, প্রত্যহ স্নান করা, এই সকল বিষয়ে হিন্দুদের প্রথা পাশ্চাত্যদেশীয় প্রথা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আচারহীন ব্যক্তিদিগের সহিত অবাধে মেলামেশা করিলে উচ্চ-বর্ণের ব্যক্তিদের পক্ষে এই সকল শৌচাচার রক্ষা করা সম্ভব হইত না। যে ব্যক্তি বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করে না, তাহার হাতে যদি জল খাই, তাহা হইলে আমার নিজের পক্ষে মলত্যাগের পর বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের কোনও সার্থকতা থাকে না। অস্পৃশ্যতা ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক বন্যজাতীয় লোক জীবন ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছে। পাশ্চাত্যে অস্পৃশ্যতা নাই, কিন্তু lynch law আছে, অস্পৃশ্যতা নাই, কিন্তু Red Indian, Hottentot প্রভৃতি আদিম জাতি বন্যপশুর ন্যায় নিহত হইয়া প্রায় সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা তুলিয়া দিলেই যে lynch law আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমি ইহা বলিতেছি না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অস্পৃশ্যতা থাকা সত্ত্বেও আদিম জাতির প্রতি হিন্দুর ব্যবহার পাশ্চাত্য-জাতির ব্যবহার অপেক্ষা ভাল। অসভ্য লোকদের কতকগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, তাঁহাদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিলে সেই দোষগুলি বড় উগ্রভাবে দেখা যায়, তাহার ফলে সমাজে তাহাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ পায়। সম্প্রতি Bernard Shaw বলিয়াছেন, বিলাতেও ধনিগণ শ্রমজীবিগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু অস্পৃশ্যকে ঘৃণা করিবে না; নিজ শৌচাচার-রক্ষার জন্য তাহার স্পর্শ এড়াইয়া চলিবে। অবশ্য অস্পৃশ্যতার বিকৃতি হইলে ঘৃণার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু বিকৃত হইলে

সকল ভাল দ্রব্যই ত' খারাপ হইয়া থাকেন। অস্পৃশ্যতা প্রথা বিকৃত হইলে যে খারাপ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। অস্পৃশ্যতা না থাকিলে মুসলমান-বিজয়ের পর বিজিত হিন্দুজাতি মুসলমানের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইত—ইংলণ্ডে যেরূপ হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠীত নহে, হইলে স্ত্রী রজঃস্বলা হইলে স্পর্শ করিবার নিষেধ থাকিত না; স্নান করিয়া শুচি বস্ত্র পরিয়া ব্রাহ্মণ পূজা করিতে যান, তখন তিনি পুত্রকের স্পর্শ কবেন না, তাহার কারণ ঘৃণা নহে; বিধবা ভোজনের সময় নিকটতম আত্মীয়কেও স্পর্শ করেন না, তাহাও ঘৃণাপ্রসূত নহে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন,—হরিদাস, রূপ ও সনাতন মহাপ্রভুর অপর ভক্তদের সহিত একত্র বসিতেন না, "পিণ্ডার তলে" বসিতেন, অপর ভক্তগণ "পিণ্ডার উপরে" বসিতেন। অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে আছে, যে শ্রীচৈতন্যদেব—

"পিণ্ডার উপরে বসিলা লৈয়া ভক্তগণ॥
রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে॥"

মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে আছে—

"হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥

*   *   *   *

এই কথা লোকে গিয়া প্রভুকে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥"

অস্পৃশ্যতা যদি "হীন সংকীর্ণতা" হইত, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে "অস্পৃশ্যতার" অস্তিত্ব দেখিয়া সুখী হইতেন

না। বলা বাহুল্য, হরিদাস, রূপ, সনাতনের মন্দিরপ্রবেশ নিষেধ হইলেও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু কম হয় নাই।

ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের ভিন্ন মন্দির, নিম্নবর্ণের ভিন্ন মন্দির ; পাশ্চাত্যদেশে ধনীর ভিন্ন ভজনালয়, দরিদ্রের ভিন্ন ভজনালয়। জন্মকৃত অধিকারভেদ তুলিয়া দিলে অর্থগত অধিকারভেদ আসিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। ধর্ম্ম-বিষয়ে অর্থকৃত ভেদ সুশোভন নহে। নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া যে হীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তাহার মন্দিরপ্রবেশ-নিষেধ ঘৃণার পরিচায়ক নহে।

আপনি লিখিয়াছেন, "চৈতন্যদেব যদি যবন হরিদাসকে না কোল দিতেন, অস্পৃশ্যদের না বুকে টেনে নিতেন, তা হলে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ আজ মুসলমান হ'য়ে যেত।" ইহা লিখিবার সময় আপনার ধারণা ছিল যে, শ্রীচৈতন্যদেব অস্পৃশ্যতা-প্রথা সমর্থন করিতেন না। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, আপনার এই ধারণা ভ্রান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নীচ-জাতির ভক্তকে স্পর্শ করিতেন, আলিঙ্গন করিতেন, কারণ, তিনি সন্ন্যাসী ; অতএব বিধিনিষেধের অতীত। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-প্রথার অস্তিত্ব দেখিয়া তিনি এই প্রথার নিন্দা করেন নাই, সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব সমর্থন করিয়াছিলেন। তার পর আপনি বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবেই সমস্ত বাঙ্গালা দেশ মুসলমান হইয়া যায় নাই। যদি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা কম হইত এবং অন্য প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ও পঞ্জাব ভিন্ন ভারতের অন্য প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যাই অনেক বেশী, মুসলমানের সংখ্যা কম ; বাঙ্গালা ও পঞ্জাবে হিন্দুর সংখ্যা কম, মুসলমানের সংখ্যা বেশী। অতএব আপনার যে ধারণা শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশের লোক মুসলমান হয় নাই, ইহাও সম্পূর্ণ ভুল।

আপনি এক স্থানে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের প্রশংসা করিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রশংসা করিয়াছেন ; আবার অন্যত্র বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, আদি, নববিধান, ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি "বর্ষার ভেক-ছত্রের মত নিয়ত ভারতবর্ষের বুকে গজিয়ে উঠেছে।" আপনার মতির স্থিরতা দেখা যায় না।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ভারত-নারীকে "জগৎপূজ্যা" বলাতে আপনি যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতের কোনও নারী জগৎপূজ্যা হন নাই। আপনি বলিয়াছেন, "জগৎপূজ্যা হ'তে হ'লে প্রাণটা বিশাল হওয়া চাই, * * * জগতের সঙ্গে তাঁর মনের আদান-প্রদান হওয়া দরকার।" আপনি আরও বলিয়াছেন যে, "শ্রীমতী অনুরূপা দেবী দেশপূজ্যা এবং জগৎপূজ্যার গোলমাল ক'রে ফেলেছেন।" গোলমাল তিনি কিছু করেন নাই। আপনিই জগৎপূজ্য এবং জগৎপূজিত এই দুইটি কথায় গোলমাল করিয়াছেন। পূজ্যা অর্থাৎ পূজার যোগ্যা পূজামর্হতীতি পূজ্যঃ—অর্হার্থে ণ্যৎপ্রত্যয় ; সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক আর্য্য-রমণীগণ যে জগতের পূজার যোগ্যা ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যিনি নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, ধর্ম্মের জন্য শত দুঃখ, কষ্ট, নির্য্যাতন সানন্দচিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারেন, তিনিই জগতের পূজার যেগ্য হইয়া থাকেন। জগৎপূজ্যের দৃষ্টান্তরূপ আপনি খৃষ্টের নাম করিয়াছেন। কিন্তু আপনি বলিতে পারেন কি, তাঁহার জীবিতকালে তিনি জগতের কত বিভিন্ন দেশের, কত বেশী লোকের সহিত তাঁর "মনের আদান প্রদান" করিতে পারিয়াছিলেন? বুদ্ধদেবেই বা তাঁহার জীবিতকালে ভারতের বাহিরে জগতের কত লোকের সহিত তাঁর মনের আদান-প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন? তথাপি ইঁহারা জগৎপূজ্য হইলেন কেন? কারণ

ইঁহারা ধর্ম্মের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। সীতা ও সাবিত্রী ধর্ম্মের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ অপরূপ সৃষ্টি দেখাইতে পারেন কি? রামায়ণের সীতা এবং ইলিয়ডের হেলেন উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ নাই কি? হেলেনকে অন্য পুরুষ ধরিয়া লইয়া গেল। হেলেন স্বচ্ছন্দে তাহাকে বিবাহ করিল। আর সীতা সহস্র নির্য্যাতন এবং প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্র শ্রীরামচন্দ্রেরই চিন্তা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার এ সকল কথা বোধ হয় আপনার অভিমত হইবে না। আপনার ন্যায় নব্যতান্ত্রিকার দৃষ্টিতে বোধ হয় সীতা অপেক্ষা হেলেনের আদর্শই বড় বলিয়া বোধ হইবে। কারণ, আপনাদের দলের লোকের মুখে আজকাল শোনা যায়—সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্ব বড়। সতীত্ব অপেক্ষা যদি নারীত্ব শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নারীত্ব অপেক্ষা পশুত্বকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কারণ, যেমন সতী অপেক্ষা নারী বড় জাতি (genus), সেইরূপ নারী অপেক্ষা পশু বড় জাতি। সীতা ও সাবিত্রীর একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য আপনার চোখে বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। তাই আপনি স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিয়াছেন, "ভারতনারী আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও কায করিতে পারেন নি—যার জন্য সমস্ত জগৎ তাঁকে পূজা দিতে পারে। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে সতীর প্রাণত্যাগ আমাদের কাছে হয় ত খুব বড় আদর্শ; কিন্তু জগৎ আজও এটাকে মনে করে অমানুষিক বর্ব্বরতা।" আপনার মতটা বোধ হয়, "তথাকথিত" জগতের মতেরই অনুকূল। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুশোকে সকল সুখ আশা বিসর্জ্জন দেন, যে পৃথিবীতে স্বামী নাই, সেখানে জীবনধারণ করাও অসম্ভব মনে করেন, যাহার মন স্বামীর চিন্তায় এরূপ তন্ময় হইয়া যায় যে আগুনের মধ্যে হাত দিয়া হাত পুড়িয়া গেলেও

ভ্রূক্ষেপ করেন না তাঁহার মধ্যে বর্ব্বরতা কোথায়? বর্ব্বর ত কেবল ইন্দ্রিয়সুখভোগ চাহে। সহমৃতা সতী স্ত্রীর ইন্দ্রিয়সুখভোগাকাঙ্খা সম্পূর্ণ-ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, কল্পনাতীত অসহ্য দুঃখভোগকে তিনি গ্রাহ্য করেন না; তাঁহাকে বর্ব্বর বলা যায় কোন্ কারণে? আপনি বলিয়াছেন, "জগৎ আজও ওটাকে মনে করে অমানুষিক বর্ব্বরতা।" আমরা ত জানি, বহু বিদেশী ব্যক্তি সহমৃতা রমণীর অলৌকিক সহ্যশক্তি এবং তন্ময়ভাব দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ত' ইহা বর্ব্বরতা বোধ হয় নাই, আপনাদের ন্যায় নব্য তান্ত্রিকদের চক্ষুতেই এরূপ বোধ হয়।

আপনি লিখিয়াছেন, "আজ যুগদেবতার দুর্নিবার গতিবেগে দেশ-কালের প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটেছে।" আমরা ত জানিতাম যে, কুসংস্কার-গ্রস্ত হিন্দুই বহু দেবতার কল্পনা করে, এবং আপনাদের ন্যায় আলোকপ্রাপ্ত নরনারী "একমেবাদ্বিতীয়ং" একমাত্র ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এখন দেখিতেছি, আপনাদেরও মতে ভিন্ন যুগের ভিন্ন দেবতা। আরও দেখিতেছি, বর্ত্তমান যুগের যিনি দেবতা, তাঁহার "গতিবেগ" দুর্নিবার"—অর্থাৎ তিনি ভয়ঙ্কর রকমের ছুটাছুটি করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহাকে থামান যাইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আধুনিক যুগের এই আস্থির যুগদেবতাটি কে? ইহারই কি অপর নাম পাশ্চাত্য-সভ্যতা-জনিত মোহ, যিনি নিত্য নূতন বিলাসের উপকরণ দিয়া এবং স্বেচ্ছাচারিতার নূতন নূতন পথ দেখাইয়া ইংরাজী শিক্ষিত আধুনিক যুবক-যুবতীকে উন্মার্গগামী করিতেছেন, এবং "মাতেব হিতকারিণী" মাতার ন্যায় মঙ্গল-কারিণী শ্রুতি, এবং শ্রুতির অনুগামিনী স্মৃতি ভারতের তপোবনের তাপস-কুটীরে যে স্নিগ্ধ প্রদীপালোক জ্বালিয়া পরিপূর্ণ স্নেহ ও কল্যাণকামনা লইয়া বসিয়া আছেন, কিছুতেই সে দিকে নব্যযুবক-যুবতীকে ফিরিতে

দিতেছেন না ?—নিজেও ছুটাছুটি করিতেছেন, অনুচর তরুণ-তরুণীদিগকে ছুটাছুটি করাইতেছেন ? এই অস্থির যুগদেবতার অনুসরণ করিয়া পরিণামে কি ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না ? শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

আগুনের উপর ঘি ঢালিলে যেমন আগুন নিবে না; বেশী জ্বলে, সেইরূপ উপভোগের দ্বারা কামনার তৃপ্তি হয় না, কামনা বাড়িয়া যায়।

এখনও আপনারা সময় থাকিতে সাবধান হউন; ঐ অস্থির যুগদেবতার পশ্চাতে মিথ্যা সুখের আশায় ছুটীয়া ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিবেন না।

আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ আজ চরম অবনতির পঙ্কে নেমে এসেছে।" আপনি কেন আপনার উপাস্য যুগদেবতার অপমানকর এ কথা বলিলেন, তাহা বুঝিলাম না। প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া আপনাদের যুগদেবতার কল্যাণে ভারতের ত প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। সকলেই জানেন, বায়স্কোপের দুর্নীতিপরায়ণ চিত্র দেখিতে কি অসম্ভব ভীড় জমা হয়; গলিতে গলিতে রেস্তরাঁ, চা-বিস্কুট, চপ-কাটলেটের দোকান খোলা হইয়াছে; আধুনিক যুগদেবতার বরপুত্র তরুণ কবি ঔপন্যাসিকগণের প্রচারের ফলে শিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তিদের ত আর কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রাচীন শাস্ত্র-সমূহ কুসংস্কার, অত্যাচার অবিচারে পরিপূর্ণ, যে সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্বই বড়, সদাচার মানবকে জড়ে পরিণত করে, কদাচার মানবের মহত্ত্ব বাড়াইয়া দেয়; নামাবলী এবং শিখা ত আজকাল উপহাসের বস্তু; মন্ত্রজপ ত বুজরুকি; সিভিল ম্যারেজ এক্ট, সর্দ্দা এক্ট পাশ হইয়াছে; বিবাহবিচ্ছেদ এক্টও ব্যবস্থাপক

সভায় উপস্থিত হইয়াছে; রামায়ণ মহাভারত না পড়িয়াই আমাদের কুললক্ষ্মীগণ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সভা করিয়া, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিয়া, দ্বিপ্রহর নিশীথে তরুণ বন্ধুর সহিত গড়ের মাঠের নৈশ নীরবতা উপভোগ করিয়া' 'বাসে' উঠিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন; মন্দিরে যাওয়া আমাদের শিক্ষিত লোকরা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, তবে আজকাল অস্পৃশ্যদের লইয়া হয় ত মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের যাইতে হইবে; ধর্ম্মগ্রন্থের আজকাল আদর নাই, ব্যাভিচারের কাহিনীপূর্ণ উপন্যাসগুলি বড়ই জনপ্রিয়; এত উন্নতি, এত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, তবুও আপনি বলিবেন, "ভারতবর্ষ আজ চরম অবনতির পঙ্কে নেমে এসেছে" ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

আপনি বলিয়াছেন, "কৃতী সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য সে কালের মায়েদের কারুরই স্বোপার্জ্জিত গৌরব নয়। ওটা তাঁহাদের পক্ষে ছিল তখন একেবারেই ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা!" আপনি এখানে ভ্রমবশতঃ মনে করিয়াছেন যে, পুস্তকপাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় না করিলে কাহারও চরিত্র মহৎ হয় না, এবং এইরূপ শিক্ষা না পাইলে জননীরা সন্তানদের চরিত্রগঠন বিষয়ে কোনও প্রভাব প্রয়োগ করিতে পারে না। এত পুস্তক পাঠ করিয়াও যদি আপনার প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে এরূপ শোচনীয় অজ্ঞতা থাকে তাহা হইলে আধুনিক উচ্চশিক্ষার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা হয়। আপনি কি ইহা জানেন না যে; চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব কে কয়খানি পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বা কয়খানি গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করে না,—করে, ধর্ম্মভাবের উপর? আপনি কি ইহা জানেন না যে, পুস্তক পাঠ না করিয়াও মানব-চরিত্রে উচ্চ ধর্ম্মভাব বিকশিত হইতে পারে? পুস্তক পাঠ করেন নাই অথচ শান্ত, সংযত শুদ্ধচিত্ত, বিলাসহীন, সেবানিরত, কর্ম্মকুশল, গৃহের সকলের শ্রদ্ধা ও

স্নেহের পাত্র,—এরূপ হিন্দু রমণী আপনার দৃষ্টিতে পড়ে নাই ইহাই কি সত্য? আপনি কি ইহাও লক্ষ্য করেন নাই যে, এইরূপ আদর্শ-চরিত্র রমণী আধুনিক অপেক্ষা সেকেলে যুগেই বেশী ছিল, উচ্চশিক্ষিত রমণী অপেক্ষা অশিক্ষিত রমণীর মধ্যেই বেশী ছিল? আপনি কি ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইতিহাস মুখস্থ না থাকিলেও পুরাণের ধর্ম্মোপদেশগুলি কিরূপে ইহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকে এবং জীবনের প্রতিকার্য্যে বিকশিত হইয়া থাকে? আপনি কি ইহাও লক্ষ্য করেন নাই যে, Political Economy না পড়িলেও ইহারা কত অল্পব্যয়ে কত নিপুণতা সহকারে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন? এবং যাঁহারা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমোদ প্রমোদে অনর্থক এবং অনিষ্টকর ভাবে কত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন? অহল্যা বাঈ ও রাণীভবানী যে ক্ষমতা ও পবিত্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া অর্জ্জন করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের পত্নী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, ভারতীয় বা পাশ্চাত্য কয়জন বিদুষী মহিলা তাহা আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে পরদুঃখমোচনের আগ্রহ সঞ্চার করিতে তাঁহার নিরক্ষর জননীর কি কোনই প্রভাব ছিল না? ইংরাজী পড়িয়া আপনি জাতীয় আত্মসম্মান এরূপ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছেন যে মাতৃকুলকে অবজ্ঞা করিয়া ইহা বলিতে আপনার একটুও সঙ্কোচ হইল না যে, কৃতী সন্তানের জননী হওয়া তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত গৌরব নয়, ইহা একেবারে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা?

———

শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ

(ভারতবর্ষ আশ্বিন ১৩৪২)

ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। কারণ ইংরাজি শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি জাতিভেদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন। তাঁহাদের ধারণা যে জাতিভেদ ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য যেরূপ প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, তিনি কখনও জাতিভেদ সমর্থন করিতে পারেন না। হরিদাস যবন হইয়াও তাঁহার প্রিয় শিষ্য হইয়াছিলেন, রূপ-সনাতন পতিত হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এইরূপ দুই একটা কথা শুনিয়া তাঁহাদের ভুল ধারণা হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ ভুল ধারণা হইবার আর একটি কারণ এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোনও পাঠ্যপুস্তকে এই ভুল কথা লেখা আছে। যথা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা হইয়াছে Chaitanya did away with distinction of caste (page 202); অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন।" কথাটি যে কত ভুল তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। দুঃখের বিষয়, আজকাল ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তির এই দুই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে রুচি দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, জাতিভেদের প্রকৃত তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেব জানিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পূর্বকৃত কর্ম্মানুসারে অধিকার ভেদের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত। সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ঘৃণার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে।

জাতিভেদ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবেব প্রকৃত মত কি ছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে গয়া যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যদেবের জ্বর হইয়াছিল। তাহার পর শিষ্যগণ—

পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর হেন ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে॥
বিপ্র-পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপন সাক্ষাতে॥

আদি খণ্ড, ১২ অধ্যায়।

তাঁহার জন্মের সময় জ্যোতিষিগণ এই ভাবে তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন;—

ভাগবত ধর্ম্মময় ইঁহার শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর॥

বলা বাহুল্য যে শ্রীচৈতন্যদেব ভবিষ্যতে যেরূপ হইবেন, জন্মের সময় জ্যোতিষী ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাই কবির অভিপ্রায়।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণ ধারণ করিবে এবং ব্রাহ্মণের বিহিত কর্ম্ম করিবে এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেব খুব প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

প্রভু বোলে "কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার?
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
তব তারে শ্মশান সদৃশ বেদে বোলে॥
বুঝিলাঙ আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।

আজি তাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পঢ়িবার ॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড, ১০ অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন কটক হইতে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং বলভদ্রের ভৃত্য সঙ্গে গিয়াছিলেন। সে ভৃত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

ইহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ।

পথে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে গ্রামে ব্রাহ্মণদের অন্ন শ্রীচৈতন্যদেব গ্রহণ করিয়াছিলেন; যেখানে ব্রাহ্মণ ছিলেন না সেখানে বলভদ্র রন্ধন করিতেন।

যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহ দুগ্ধ দধি কেহ ঘৃত খণ্ড আনে ॥
যাঁহা বিপ্র নাহি শূদ্র মহাজন।
আসি তবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥

শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রথম পুরী যাইতেছিলেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ ছিলেন। সাক্ষিগোপালে আসিয়া নিত্যানন্দ সাক্ষিগোপালের কাহিনী বলিতেছেন, মহাপ্রভু শুনিতেছেন। বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন।

সেই সময় "ছোট বিপ্রের" সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া "বড় বিপ্র" বলিলেন, "গৃহে ফিরিয়া আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।" ছোট বিপ্র বলিলেন "তোমার জামাতা হইবার উপযুক্ত বিদ্যা, ধন বা কৌলীন্য আমার নাই। আমি কন্যার লোভে তোমার সেবা করিতেছি না। তোমাকে সেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইবেন এজন্যই সেবা করিতেছি। কারণ,—

"ব্রাহ্মণ সেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যদেবের যাহা ধর্ম মত ছিল তাহা আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে, যে, জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার কখনও অভিপ্রেত হইতে পারে না। বেদ, পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র অভ্রান্ত ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের মত ছিল। যথা, শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখানে শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন যে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ প্রামাণিক। পুনশ্চ,—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

ঐ ঐ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখানে বলিলেন যে পুরাণও প্রামাণিক। পুনশ্চ শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক বাদ বৌদ্ধেতে অধিক ॥
ঐ ঐ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে যখন তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন তখন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে বেদ ও পুরাণ ঈশ্বরের রচনা।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥
ঐ ঐ ২০ পরিচ্ছেদ।

মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এবং আরও অনেক স্থলে বেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে। সংহিতা এবং উপনিষদ উভয়ই বেদের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যেই জাতিভেদের কথা আছে, উপনিষদের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে আছে। পুরাণের মধ্যেও যে জাতিভেদের কথা যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট ইহা সুবিদিত। শ্রীমদ্ভাগবতে জাতিভেদের কথা অনেক স্থলেই আছে। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ঈশ্বর জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে তত্ত্ব উপদেশ দিবার সময় ভাগবতের এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে ইহা আছে।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

ভাগবত ১১।৫।১২

ঈশ্বরের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ আশ্রমের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে এবং গুণের দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ভাগবতের এই শ্লোকের মূল বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত।

শ্রীচৈতন্যদেব যে জাতিভেদ মানিতেন এ সম্বন্ধে বোধ হয় আর প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। ব্রাহ্মণাদি চারি বিভিন্ন জাতি থাকিবে শুধু ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের মত ছিল না। অস্পৃশ্যদের জন্য শাস্ত্র যে সকল বিধান দিয়াছেন সেই সকল বিধান পালন করা উচিত ইহাও শ্রীচৈতন্যদেবের মত ছিল। এ জন্য দেখিতে পাই,—

হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে নাহি যায় তিনজন॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ

এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণ পুরীতে আসিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের মধ্যে হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন "হরিদাস কোথায় ?" হরিদাস দূরে রাজপথপ্রান্তে পড়িয়া ছিলেন। ভক্তগণ সেখানে আসিয়া বলিলেন "হরিদাস, চল, প্রভু তোমায় ডাকিতে-ছেন।" তখন,

"হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥

* * *

এই কথা লোকে গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১১ পরিচ্ছেদ

উদ্যানের এক পার্শ্বে হরিদাসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন

মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥ ঐ ঐ

শ্রীচৈতন্যদেবের এই ব্যবস্থাও শাস্ত্রানুযায়ী।

"দর্শনং দেব-চুড়ায়াঃ দর্শনং গোপুরস্য চ। অন্ত্যজানাং তথান্যানাং বিজ্ঞেয়ং দেবদর্শনং ॥„—শৈবাগম। "দেবমন্দিরের চূড়া এবং গোপুরম দর্শন করিলেই অন্ত্যজগণের দেব দর্শন হইবে।"

মহাপ্রভু অবশ্য বলিয়াছিলেন "হরিদাস, তুমি অস্পৃশ্য নহ, পরম পবিত্র, কারণ তুমি অতিশয় ভক্ত" এবং শাস্ত্রের শ্লোক তুলিয়া এই উক্তি সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি পরম ভক্ত হইলেও অস্পৃশ্যদের নিমিত্ত শাস্ত্র যে আচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পালন করিবে ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়।

এই অভিপ্রায় অন্যত্র মহাপ্রভু স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সনাতন প্রভুর নিকট গিয়াছেন। সনাতনের পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "তুমি কোন পথে আসিয়াছ ?" সনাতন বলিলেন "সমুদ্র পথে"। প্রভু বলিলেন "তুমি মন্দির পথে কেন আসিলে না ? সমুদ্র পথে তপ্ত বালুতে তোমার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে।" তখন সনাতন বলিলেন,

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাহে সেবক প্রচার ॥
সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হৈবে মোর ॥"

তখন মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"যদ্যপি তুমি হও জগৎ পালন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥"

এখানে মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলিলেন যে অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি যদি মর্য্যাদা পালন না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে, এবং জগন্নাথের সেবকগণকে স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহার পরলোক নষ্ট হয়।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি এবং আচরণ দেখিলে ইহা প্রতীতি হয় যে তাঁহার মতে অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি যদি প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অস্পৃশ্যতা তিরোহিত হয়, সে পরম পবিত্র ব্যক্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক তুলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সে ব্যক্তি ইহা বলিবে না "আমি ঈশ্বর-ভক্ত, অতএব আমার দেবালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার আছে।" সে বলিবে "আমি অস্পৃশ্য, দেবালয়ে যাইবার অধিকার আমার নাই।" উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিকেও সে স্পর্শ করিবে না। অতএব শ্রীচৈতন্যদেবের মতে ভক্ত এবং অভক্ত সকল অস্পৃশ্যই দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি অস্পৃশ্য জাতীয় প্রকৃত ভক্তকে স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইবে না, ইহা সত্য, কিন্তু অস্পৃশ্য জাতীয় ভক্ত ইহাতে আপত্তি করিবে, কারণ তাহার মনে হইবে যে তাহার অপরাধ হইতেছে। এ জন্য আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই যে শ্রীচৈতন্যদেব যখন শিষ্যগণকে লইয়া বসিতেন তখন উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ "পিণ্ডার উপরে" বসিতেন, এবং রূপ সনাতন ও হরিদাস "পিণ্ডার তলে" বসিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অস্পৃশ্য জাতির জন্য এই সকল কষ্টকর ব্যবস্থা শাস্ত্রই বা কেন দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবই বা কেন অনুমোদন করিয়াছেন? সমাজ সংস্কারকগণ বলেন যে শাস্ত্রকারগণ উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা নিম্ন বর্ণের ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিতেন, তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য তাঁহারা এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ, যাঁহারা সর্ব ভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া-

ছিলেন, তাঁহারা যে এইরূপ ঘৃণা ও অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা দিবেন ইহা কোনও শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু স্বীকার করিবে না। শ্রীচৈতন্যদেবও স্বীকার করেন নাই। বৈদ্য রোগ সারাইবার জন্য রোগীকে তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন, এবং কষ্টকর ব্যবস্থা দেন, শাস্ত্রকারগণ অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতের প্রয়শ্চিত্ত স্বরূপ এই প্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা শ্রদ্ধা পূর্বক পালন করিলে তাহার পূর্বজন্মকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব ইহা জানিতেন। এ জন্য তিনি এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং এইরূপ ব্যবস্থা পালন করিয়াই রূপ সনাতন হরিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজনমান্য সাধু হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থা ঘৃণা এবং অত্যাচারমূলক হইলে শ্রীচৈতন্যদেব ইহা সমর্থন করিতেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের মত সকলের অনুসরণ করা উচিত কি না ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি নিন্দা বা অমান্য করেন নাই এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবসর নাই। যে সকল ঐতিহাসিক পুস্তকে,—বিশেষতঃ পাঠ্য পুস্তকে,—এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি আছে সেগুলির সংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য ও জাতিভেদ (২)

(ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪২)

আশ্বিনের ভারতবর্ষে আমি 'শ্রীচৈতন্য ও জাতিভেদ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম মাঘের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার প্রতিবাদ, করিয়াছেন। ফাল্গুনের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রথমে বন্ধুবর রমেশ বাবুর প্রবন্ধটি আলোচনা করা যাক।

রমেশবাবু যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের কোনও সন্দেহ নাই যে শ্রীচৈন্যদেব "জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মানিতেন না।" আমাদেরও এ বিষয়ে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইত—যদি রমেশবাবু নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন।

(১) শ্রীচৈতন্যদেব যদি জাতিভেদ না মানিতেন তাহা হইলে যখন তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, তখন কেন বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণের পাদোদক আন, উহা পান করিলে আমার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে?"

(২) চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন দেব ও দ্বিজে ভক্তিমান বলা হইয়াছে?

(৩) তিনি কেন শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না, কেবল ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিতেন?

(৪) শ্রীসনাতন যখন বলিয়াছেন যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার তখন শ্রীচৈতন্যদেব কেন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

আশ্বিনের ভারতবর্ষে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহাতে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু রমেশবাবু এ সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন নাই। এ জন্য মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে তিনি অসমর্থ।

রমেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে প্রথমেই বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছেন—ইহা স্যর গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও বলিয়াছেন। ইহাদের নজির দেখাইয়া রমেশবাবু নিজের

ভ্রম লঘু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অধিকাংশ জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হইয়াছে। স্যর রামকৃষ্ণ বাঙ্গালী নহেন। তাঁহার ভ্রম মার্জনীয়। কিন্তু বাঙ্গালী ঐতিহাসিক রমেশবাবু কেন এ ভ্রম করিলেন?

রমেশবাবু দীনেশবাবুর নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি (শ্রীচৈতন্য) হীন শূদ্র রামানন্দ রায়কে দিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" কিন্তু চৈতন্যভাগবতে একথা বলা হয় নাই। অধিকন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই রামানন্দ রায় বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের আচার পালন করাই ধর্মজীবনের প্রথম সোপান।

প্রভু কহে পড় শ্লোক শাস্ত্রের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥
তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—
বর্ণাশ্রমাচারবা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ)। সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ—"বর্ণাশ্রমবিহিত আচারবান্ পুরুষের দ্বারা পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন—তাঁহার সন্তোষের অপর কোনও কারণ নাই।"

সুতরাং দীনেশবাবু ও রমেশবাবু যে বলিয়াছেন—রামানন্দ রায় দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের অসারতা দেখাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি?

জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম অনুসারে শূদ্রের বেদ পাঠ নিষেধ অতএব বেদ ব্যাখ্যাও নিষেধ। কিন্তু পুরাণ পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিতে সকলের সম্পূর্ণ অধিকার আছে—শূদ্রেরও আছে। রামানন্দ রায়ের

নিকট চৈতন্যদেব যদি বেদের ব্যাখ্যা শুনিতেন তাহা হইলে রমেশবাবু ও দীনেশবাবু বলিতে পারিতেন যে চৈতন্যদেব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিয়ম মানেন নাই। কিন্তু রামানন্দ রায় বেদের ব্যাখ্যা করেন নাই, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামানন্দ রায়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব জাতিভেদের নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই।

নিম্নবর্ণের নিকট ব্রাহ্মণগণ পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন ইহা হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বহুস্থানে উল্লেখ আছে। নৈমিষারণ্যে প্রতিলোমজ সূতের নিকট ব্রাহ্মণগণ ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সূতবংশোদ্ভব সৌতির নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্মব্যাধ ব্যাধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন যে জাতিভেদ মানিলে নিম্নবর্ণের লোকের নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণ করা যায় না, তাঁহারা জাতিভেদের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহারা জাতিভেদের যে নিন্দা করেন তাহা অজ্ঞতাপ্রসূত বলিতে হইবে।

রমেশবাবু অপর যে সকল যুক্তি দিয়াছিলেন নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথম যুক্তি,—শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দ নামক শূদ্রকে ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা হইতে রমেশবাবু যে কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন—চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না—তাহা রমেশবাবুই বলিতে পারেন। জাতিভেদ সংক্রান্ত শাস্ত্রে একথা কোথাও বলা হয় নাই যে ব্রাহ্মণ প্রভু শূদ্র ভৃত্য রাখিবে না? আমি পূর্ব প্রবন্ধে ইহা কোথাও বলি নাই যে চৈতন্যদেব কখনও শূদ্র ভৃত্য রাখেন নাই। রমেশবাবু এই প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃত

হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের কৃপা কেবল উচ্চবর্ণের ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয় না, নিম্নবর্ণের ব্যক্তিও ঈশ্বরের কৃপা পাইতে পারে। অতি সত্য কথা এবং ইহা দ্বারা মোটেই প্রতিপন্ন হয় না যে চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না।

এই প্রসঙ্গে এবং অন্য স্থলেও রমেশবাবু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এবং শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহার অর্থ এই যে—নিম্ন জাতির লোক যদি ঈশ্বরভক্ত হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে ; পরন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঈশ্বরভক্ত না হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বরের কৃপালাভে সমর্থ হয় না, তাহার জীবন ব্যর্থ হয়। সুতরাং ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জাতি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। রমেশবাবু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জাতিভেদ অসার, কিন্তু রমেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত ভুল। কেহ যদি বলেন রমেশবাবু অপেক্ষা রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন, তাহা হইলে কি ঐতিহাসিক হিসাবে রমেশবাবুর অসারতা প্রমান করা হয়? কখনই নহে। সেইরূপ কেহ যদি জাতি অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন—তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যদেব শূদ্র গোবিন্দকে এবং শূদ্র ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়াও ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে—"জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করাই"—চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য ছিল। যদি জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তিনি কখনও ব্রাহ্মণের পাদোদক পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না এবং অব্রাহ্মণের অন্ন খাইতে আপত্তি করিতেন না। শ্রীচৈতন্যের জীবনীর সে ঘটনাগুলি রমেশবাবুর মত সমর্থন করিতে পারে,

রমেশবাবু কেবল সেগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর মতের বিরোধী কয়েকটি ঘটনা আমি পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। রমেশবাবু সেগুলি চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ওকালতী হিসাবে রমেশ বাবুর আচরণ প্রশংসার্হ হইলেও ইহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সকল উক্তি এবং আচরণগুলি আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। এই ভাবে সিদ্ধান্ত করিলে দেখা যায় যে চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন, কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে জাতি অপেক্ষা ভক্তিকে উচ্চ স্থান দিতেন এবং সেজন্য নিম্নজাতির ভক্তকে আলিঙ্গন করিতেন।

দ্বিতীয় যুক্তি—চৈতন্যদেব আহার করিতে বসিয়া রূপ, সনাতন ও হরিদাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন সুতরাং—"নীচজাতীয় লোকের সহিত আহার করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না।"

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে পরম ভক্তদিগকে চৈতন্যদেব অতিশয় পবিত্র বিবেচনা করিতেন। এজন্য তিনি আহারের সময় রূপ, সনাতন ও হরিদাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহারা ভক্ত নহে এরূপ শূদ্রকে একত্র আহারের জন্য আহ্বান করেন নাই। যদি জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবিচারে সকল জাতির লোকের সহিত একত্র ভোজন করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই।

তৃতীয় যুক্তি—তিনি যবন হরিদাস এবং আরও কয়েকটি মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

জাতিভেদের মধ্যে এমন কোনও নিয়ম নাই যে মুসলমানকে শিষ্য করা যায় না। মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন, অতএব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছেন এই যুক্তি অতুলনীয়।

এই প্রসঙ্গে রমেশবাবুর একটি বড় রকম ভুল করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে মুসলমান ভক্তগণ মন্দিরে প্রবেশ করিবে ইহাতে চৈতন্যদেবর কোনও আপত্তি ছিল না এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে চৈতন্যদেব হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। চৈতন্যদেব কখনও হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করেন নাই। রমেশবাবু যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। রমেশবাবু একটু ধীরভাবে ইহা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কাশী মিশ্রের গৃহে বসিয়া চৈতন্যদেব হরিদাসকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। হরিদাসও সে সময়ে "মন্দির মধ্যে" যাইবার কথা বলেন নাই, "মন্দিরের নিকটে" যাইবার কথাই বলিয়াছেন।

অতএব রমেশবাবু যে এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন— চৈতন্যদেবের মতে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ দূষণীয় নহে—তাহা শূন্যে নির্মিত সৌধমালার ন্যায় অলীক। বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের মতে অস্পৃশ্যদের পক্ষে মন্দির প্রবেশ দূষণীয় ছিল। তাই সনাতন যখন বলিয়াছিলেন "সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার" তখন চৈতন্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির মন্দির প্রবেশ শাস্ত্রনিষিদ্ধ সে যদি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার দ্বারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় এবং সে ইহলোক ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে রমেশবাবু আমার কয়েকটি যুক্তির কোনও উত্তর দেন নাই। কিন্তু রমেশবাবু আমার একটি যুক্তির উত্তর দিয়াছেন ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার যুক্তি ছিল—শ্রীচৈতন্য বেদ ও পুরাণ মানিতেন, বেদ ও পুরাণে জাতিভেদ আছে, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন। ইহার উত্তরে রমেশবাবু বলিয়াছেন—"প্রাচীন হিন্দুধর্মসংস্কারকগণ মুখে কখনও বেদ ও পুরাণের অপ্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন না, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের মত ও প্রদর্শিত পথ অনেক স্থলেই সনাতন ধর্ম্ম ও আচার হইতে ভিন্ন।"

অর্থাৎ তাঁহাদের মনে একরূপ এবং কার্য্যে অন্যরূপ; সহজ কথায় তাঁহারা কপটাচারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপর এবং যাবতীয় সাধু পুরুষদের উপর—কি সুগভীর ভক্তি! শ্রীচৈতন্য যে বেদকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না তাহার প্রমাণস্বরূপ রমেশবাবু বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়াছেন।" ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করিলে বেদকে ভুল বলিয়া স্বীকার করা হয়, ইহা রমেশ বাবুর আর এক অদ্ভুত যুক্তি। যদি কেহ বলেন ধর্মজীবনের তুলনায় ধর্মপুস্তকের জ্ঞান তুচ্ছ, তাহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ধর্মপুস্তকগুলি মিথ্যা?

ভক্তির তুলনায় বেদের জ্ঞান তুচ্ছ—ইহা বলিয়া যে শ্রীচৈতন্য বেদের বিরোধিতা করেন নাই তাহার আর একটি কারণ এই যে—বেদেই এই কথা আছে। মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং॥

এখানে বলা হইল যে বেদে এবং অন্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেই

ব্রহ্মলাভ হয় না। ব্রহ্ম যাঁহাকে কৃপা করেন তাঁহারই ব্রহ্মলাভ হয়। অবশ্য যাঁহার ভক্তি আছে তাঁহাকেই ব্রহ্ম কৃপা করেন। সুতরাং বেদেই আছে যে ভক্তির নিকট বেদের জ্ঞান তুচ্ছ।

গীতাতেও ভগবান এই কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা॥১১।৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহম্ এবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥১১।৫৪

"হে অর্জ্জুন, তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞ দ্বারা আমার সে রূপ দেখা যায় না। কেবল আমার প্রতি অনন্য ভক্তি থাকিলে আমাকে এই ভাবে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়।"

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের এই মত হিন্দুর বেদ-পুরাণ-ইতিহাস সকল ধর্মশাস্ত্রেই আছে। এই মত প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিরোধিতা করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য তাঁহার সকল মত এবং আচরণ বেদ পুরাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যে ভগবদ্ভক্ত শূদ্র এবং পতিতদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, ইহাও পুরাণবাক্য দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন। তথাপি রমেশবাবু কিরূপে এই গূঢ় রহস্য জানিতে পারিলেন যে বেদ ও পুরাণের প্রতি শ্রীচৈতন্যের আন্তরিক আস্থা ছিল না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

রমেশবাবু আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বলিয়াছেন:

চৈতন্যদেব যাহা যাহা করিয়াছিলেন আমি এবং আমার দলভুক্ত শাস্ত্রীয় আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ তাহা করিতে প্রস্তুত আছি কি? আমি শূদ্র ও মুসলমানকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষা দিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে

প্রস্তুত আছি কি? তাঁহাদিগকে লইয়া একসঙ্গে ভোজনে ও মন্দির প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে কোনও আপত্তি আছে কি? ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ—ইহা কি আমি বিশ্বাস করি?

আমাদের মীমাংসার বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত। এই প্রসঙ্গে আমার দলভুক্ত ব্যক্তিগণের (?) আচরণ নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক। রমেশ বাবুর এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যে যুক্তি নিহিত আছে তাহা এইরূপ ঃ

শ্রীচৈতন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, বসন্তবাবু সে সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন; বসন্তবাবু জাতিভেদ মানেন; অতএব শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না।

সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে অথবা পাশ্চাত্য Logicএ এবম্বিধ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ করি রমেশবাবু গবেষণা বলে সুমাত্রা বা জাভা দ্বীপ হইতে এই অপূর্ব যুক্তি আঙ্কিার করিয়াছেন।

রমেশবাবুর এই নবাবিষ্কৃত যুক্তি অনুসরণ করিয়া (এবং মহর্ষি গৌতমের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া) আমরা বলিতে পারি,—

শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না, রমেশবাবু জাতিভেদ মানেন না, সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, রমেশবাবুর সেই সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক খাইয়াছিলেন, রবেশবাবু খাইতে প্রস্তুত আছেন ত?

অবশ্য শ্রীচৈতন্য যাহা যাহা করিয়াঝিলেন, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত নাহি, ইহা রমেশবাবুর অনুমান মাত্র। হরিদাস, রূপ ও সনাতন সকলেরই পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন—কোনও কারণে ইঁহাদের পাতিত্য জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের আচার ব্যবহার পরম পবিত্র, ইঁহাদের ভক্তি ও সাধনা অতুলনীয়। এরূপ মহাপুরুষগণের পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে

অথবা ইঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আমার কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না—অথবা আপত্তি এই যে, আমি তাঁহাদের আলিঙ্গনের যোগ্য নহি। শ্রীচৈতন্য যে ইঁহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করেন নাই তাহা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি! ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল যে সম্মানার্হ তাহাও আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কোনও কোনও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের হরিদাস প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিতে আপত্তি থাকিতে পারে ইহা সত্য। কিন্তু যত লোক জাতিভেদ বিশ্বাস করে সকলের আচরণ একরূপ হইবে, এই মতটি যুক্তিসিদ্ধও নহে, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়কও নহে। রমেশবাবুর ইহা বোঝা উচিত যে জাতিভেদে আস্থা থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। শাস্ত্রে জাতিভেদের বিধান আছে, আবার ইহাও লিখিত আছে যে কোনও ব্যক্তি যদি অস্পৃশ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তিমান হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে পবিত্র বলিয়া মনে করা উচিত। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিধান অক্ষরে অক্ষরে (literally) পালন করিতেন। কিন্তু এই বিধানের এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে ভক্তির প্রশংসা করিবার জন্যই শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নজাতীয় ভক্তের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিলেই শাস্ত্রের এই বিধানটি পালন করা হইবে, তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিবারও প্রয়োজন নাই; কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত, কোন্ ব্যক্তি নহে—তাহা সকল ক্ষেত্রে নিশ্চয় করাও সম্ভবপর নহে।, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ে এইপ্রকার মতভেদ থাকিলেও জাতিভেদের প্রধান নিয়মগুলি সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই—সকলেই স্বীকার করেন যে প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ পাপকার্য্য, শূদ্রের অন্ন

ব্রাহ্মণের ভোজন করা উচিত নহে, চণ্ডাল নিজেকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিবে, মন্দিরে প্রবেশ করিবে না। এই সকল বিষয়ে নিষ্ঠাবান হিন্দুর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের যখন কোনও মতভেদ নাই—তখন ভক্ত-চণ্ডালকে আলিঙ্গন করা উচিত কি না, এই প্রকার ক্ষুদ্র বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এক সম্প্রদায় জাতিভেদ মানেন এবং এক সম্প্রদায় মানেন না। অথচ রমেশবাবু ঠিক এই অপসিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

অতঃপর রমাপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। সুখের বিষয় যে রমাপ্রসাদবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়কে "জাতিভেদের বিরোধী বলা যায় না।" কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল কথাও আছে। তিনি বলিয়াছেন—"ভক্তিমার্গে জাতিভেদ অনুসারে অধিকারী ভেদ নাই।" তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব কেন সনাতনকে বলিলেন—"তুমি মন্দিরের নিকট না গিয়া ভাল কাজ করিয়াছ, সকল ব্যক্তিরই মর্য্যাদা পালন করা উচিত?" রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন, বৈষ্ণবধর্মে পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করিয়া লৌকিক ব্যাপারে তাহার অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করা হয় নাই। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন.—

মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এই "মর্য্যাদা" হইতেছে জাতিভেদ অনুসারে অধিকারভেদ। শ্রীচৈতন্যের মতে ইহা লঙ্ঘন করিলে পরলোকে সর্বনাশ হয়। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করা হইয়াছে।

রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য একটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—যাহার অর্থ "হরিভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ দ্বিজরূপে গণনীয়।" কিন্তু এই বাক্য হরিভক্তির প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। সত্য সত্যই এইরূপ ভক্ত চণ্ডালের জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। ভক্ত চণ্ডালকে কোনও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কন্যা-সম্প্রদান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির বংশ জন্মগত-ব্রাহ্মণবংশের সহিতই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণেতর ভক্তবংশের সহিত করেন নাই। রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন যে কোনও একটি মন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে —সকল জাতির এই মন্ত্রে অধিকার আছে। এই মন্ত্রটিতে সকল জাতির অধিকার থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অন্য কোনও বিষয়ে জাতি অনুসারে অধিকারভেদ নাই। বৈষ্ণবদের মন্দিরে ব্রাহ্মণগণই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকে, অন্য জাতির ভক্তদের স্বহস্তে সেবা করিবার অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভক্তিমার্গেও জাতি অনুসারে অধিকার ভেদ আছে। বস্তুতঃ জ্ঞান কর্ম-ভক্তি যে মার্গই গ্রহণ করা হউক, যদি বেদের প্রতি আস্থা থাকে, তাহা হইলে জাতিভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ জাতিভেদ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি যে বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, প্রভৃতি ভক্তিমার্গের অনেক সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছেন। ভক্তিমার্গে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই ইহা ভুল।

রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন যে হরিদাস ঠাকুরের—"জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের বাধা ছিল না।" কিন্তু ইহা শ্রীচৈতন্যের মত নহে। কারণ তিনি বলিয়াছেন—শাস্ত্রে যে জাতির লোককে মন্দির প্রবেশের অধিকার

দেওয়া হয় নাই তিনি মন্দির প্রবেশ করিলে "মর্য্যাদা লঙ্ঘন" হয় এবং তাহাতে "ইহলোক পরলোক" নষ্ট হয়। রমাপ্রসাদবাবু ভক্তিরত্নাকর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীসনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু নীচ জাতির সহিত ব্যবহার করিতেন বলিয়া নিজদিগকে নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। আমি এ বিষয়ে শ্রাবণ ১৩৪১এর ভারতবর্ষে এবং পৌষ ১৩৪২এর বঙ্গশ্রীতে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ থাকিলেও তাঁহার পিতা শ্রীকুমার কোনও কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন—"জাতিভেদজনিত অনৈক্য যে হিন্দুদিগের অধঃপতনের একটি কারণ এই তথ্য বোধ হয় প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়।" ইহার কারণ এই যে রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টধর্মকে সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। Digby সাহেবকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি একথা প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম এবং সমাজকে খৃষ্টানধর্ম এবং সমাজের অনুকরণে গঠিত করিবার জন্য তিনি প্রতিমা পূজা এবং জাতিভেদের নিন্দা করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ রাজা রামমোহন বুঝিতে পারেন নাই যে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ ঐক্যের কারণ, অনৈক্যের নহে। জাতিভেদের মূলশ্রুতি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিকে বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ বলা হইয়াছে। বিভিন্ন অঙ্গের কর্ম বিভিন্ন হইলেও সকল অঙ্গই এক উদ্দেশ্যের সহায়ক, এজন্য সকলের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সেইরূপ বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন কর্ম নির্দ্দিষ্ট হইলেও, সকলেরই উদ্দেশ্য সমাজদেহের কল্যাণ সাধন—এ জন্য সকলের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সকল ব্যক্তির সকল কাজে সমান অধিকার থাকিলে প্রবল প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী।

প্রবল প্রতিযোগিতা হইতে দ্বন্দ্ব এবং অনৈক্যের উদ্ভব হয়। হিন্দু-সমাজে ধর্ম্ম অনুসারে অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিযোগিতাকে মৃদুতর করা হইয়াছে। তাহাতে অনৈক্যের সম্ভাবনাও কম হয়। প্রত্যেক হিন্দু জানে যে অপর সকল জাতির সাহায্য ব্যতীত তাহার পক্ষে জীবনযাত্রা করা দুরূহ, এ জন্য সকল জাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন থাকে। যাঁহারা প্রাচীন পল্লী-সমাজ দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সদ্ভাব এবং ঐক্য থাকে। পাশ্চাত্য সমাজে জাতিভেদ নাই, কিন্তু ধনিকে এবং শ্রমিকে যেরূপ চিরন্তন বিবাদ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ বিবাদ কখনও ছিল না। হিন্দুসমাজ হইতে জন্মগত জাতিভেদ তুলিয়া দিলে পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় হিন্দুসমাজেও ধন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইবে এবং ধনের আধিপত্য উগ্রভাবে প্রকাশিত হইবে। জন্ম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা (heredity and environment) অনুসারে কর্মভেদ স্বাভাবিক। অপর উপায়ে কর্মভেদ করিলে সমাজে সুব্যবস্থা থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজে এইরূপ সুব্যবস্থা নাই বলিয়া বেকার সমস্যা প্রবল হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট বিদ্বেষ দেখা যায়।

জাতিভেদ যদি হিন্দুর জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইত তাহা হইলে সুদূর অতীত কাল হইতে জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও ভারত সর্বাগ্রে ধর্ম, দর্শন, কাব্য, শিল্প—সকল বিষয়ে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিত না। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় হিন্দুর বিভিন্ন জাতি কলহ করিয়াছিল এরূপ দেখা যায় নাই। কলহ হইয়াছিল স্বজাতির মধ্যেই এবং তাহাই হিন্দুর পতনের অন্যতম কারণ। বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হইল যে সকল অবস্থায় অহিংসা পরম ধর্ম—দেশ রক্ষার জন্য শত্রু হিংসাও

যে ধর্ম—ইহা বৌদ্ধধর্মে বলা হইল না। এই অতি-অহিংসাবাদের প্রভাবও পতনের অন্যতম কারণ। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত—সকল ধর্মগ্রন্থেই জাতিভেদকে সমাজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর-প্রণীত ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য সকলেই ইহার সমর্থন করিয়াছেন। ইহাদের সর্ববাদিসম্মত মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টানধর্মভক্ত রাজা রামমোহনের মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

অভিভাষণ

সভাপতি মহাশয় এবং ভদ্র মহোদয়গণ,

হিন্দু দর্শনের একটা মূলতত্ত্ব হইতেছে কর্ম্মফলবাদ। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিবে, সে তদনুরূপ ফল পাইবে। আপনারা আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে দর্শনশাখার সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। ইহার কর্ম্মফল আপনাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। একটি অপকৃষ্ট অভিভাষণ শুনিবার যে দুঃখ, তাহা হইতে আপনাদের উদ্ধারের আমিত কোন আশাই দেখিতেছি না। আপনারা যদি মনে করেন যে, এ দুঃখভোগের কারণ আমার অক্ষমতা, তাহা হইলে আপনাদের ভুল হইবে। আপনারা নিজকৃত কর্ম্মফলই ভোগ করিতেছেন। ইহার জন্য আমাকে দায়ী করিবেন না।

* কাঁটাল পাড়া বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলনে দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ আষাঢ় ১৩৩৯

উপক্রমণিকা স্বরূপ এইটুকু বলিয়া আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। প্রথমতঃ আমি হিন্দুদর্শনের কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করিব। একটা বিশেষত্ব এই যে, হিন্দুদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে। দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারলাভ করে প্রাচীন হিন্দুসমাজে তাহার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকলেই জানিত যে, সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী, সংসার অনিত্য, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন এবং অমর, জীবনের চরম সার্থকতা ভোগৈশ্বর্য্যে নহে ঈশ্বরলাভে এবং ঈশ্বরলাভের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় একান্তভাবে তাঁহার শরণ লওয়া। এই সকল সত্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার বিবিধ উপায় ছিল। কাব্য ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া এই সকল দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। কথক ঠাকুর সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় পুরাণ ইতিহাসের কাহিনীর সহিত দার্শনিক তত্ত্ব সকল নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও প্রচার করিতেন। ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্যে এই সকল দার্শনিক তত্ত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিত। রাখাল গরু চরাইবার সময়, কৃষক চাষ করিবার সময়, মাঝি দাঁড় টানিবার সময় দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ সঙ্গীত আলাপ করিয়া শ্রমবিনোদ করিত, ভিখারী একমুষ্টি চাউলের পরিবর্ত্তে গৃহে গৃহে হিন্দুদর্শনের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি বিতরণ করিয়া যাইত; শিল্পী মন্দিরগাত্রে এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক কাহিনী সকল উৎকীর্ণ করিয়া রাখিত। ফলে দেশের সাধারণ নর-নারী কেবল যে এই সকল তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইত তাহা নহে, এই সকল তত্ত্ব তাহাদের অস্থিমজ্জাগত হইত, তাহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীতে প্রকাশিত হইত,

এমন কি তাহাদের চেহারাতেও আধ্যাত্মিকতার একটা ছাপ দিয়া যাইত। ভারতের দরিদ্র নর-নারী নিরক্ষর হইলেও আধ্যাত্মিক সম্পদযুক্ত এবং সে জন্য মানুষ হিসাবে স্বাধীন জাতিসমূহের সাধারণ লোকের অপেক্ষা ছোট নহে একথা স্বদেশী বহু মনীষী স্বীকার করিয়াছেন। একজন বিখ্যাত পর্য্যটক ইংলণ্ডে একটা কয়লার খনির কুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যিশু খৃষ্টের নাম শুনিয়াছ কি?" সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, "তাহার নম্বর কত?" অর্থাৎ "তুমিত একটা কুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? নম্বর জানিলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়।" সে ব্যক্তি লেখাপড়া জানিত নিশ্চয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদে কত বেশী দরিদ্র! এজন্য মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন, "I ask you to accept the testimony given by Sir Thomas Munro, and I confirm that testimony, that the masses of India are really more cultured than any in the world." (৭ই এপ্রিল ১৯২১ সালে মান্দ্রাজের সমুদ্রতটের বক্তৃতা।)

"সার টমাস্ মনরো যে সাক্ষ্য দিয়াছেন আমি তাহা আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, এবং আমি তাঁহার উক্তি সমর্থন করি যে, ভারতের সাধারণ নর নারী অন্য যে কোনও দেশের সাধারণ নর্ নারী অপেক্ষা মনুষ্যত্ব হিসাবে শ্রেষ্ঠ।"

এই প্রসঙ্গে কথকঠাকুর দ্বারা কি ভাবে লোকশিক্ষা হইত এবং আজকাল ইংরাজি শিক্ষিত লোকদের রুচির পরিবর্ত্তনহেতু লোকশিক্ষার এই সুন্দর উপায় কি ভাবে দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক লেখনীর রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বেদী-পীড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট

সম্মুখে পাতিয়া সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কারসংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন বিশ্ব সৃজন পালন ও ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম্ম যে লোকহিত পরমকার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বাঙ্গালী নব্য যুবকের কুরুচির দোষ।" কথক ঠাকুরের মুখে ধর্ম্মকথা শোনা অপেক্ষা তাহারা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের গান শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে ভালবাসে। * * অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল।" পুরাণ ইতিহাসে দার্শনিক তত্ত্বের প্রাচুর্য্য সুবিদিত। জগতের একটী শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ ভগবদগীতা মহাভারতেব মধ্যে কয়েকটী অধ্যায়রূপে রচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে এত বেশী পরিমাণে দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, এই অলৌকিক কাব্য গ্রন্থকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হয়। কিন্তু দর্শনের কথা বেশী আছে বলিয়া এই সকল গ্রন্থে কাব্যরসের কিছুমাত্র অসদ্ভাব হয় নাই। ইহাতেই গ্রন্থকর্ত্তাদের কৃতিত্ব দেখা যায়। পরবর্ত্তীযুগের সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতির মধ্যে কালিদাস ভবভূতির লেখার মধ্যেও দার্শনিক কথা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস তাঁহার বিখ্যাত উপমাগুলি সৃষ্টি করিবার সময় যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে উপকরণ

আহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইতেও বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। যেরূপ দক্ষতার সহিত তিনি এই সকল উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দার্শনিক পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। আবার যেখানে তিনি ভগবানের স্তব করিয়াছেন, সেখানেও কিরূপ সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তিনি দর্শনের চরমসত্যগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চিত্ত যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়। মুসলমানযুগে কৃত্তিবাস, দাশরথি রায়, ভারতচন্দ্রের লেখাতেও দার্শনিক ভাবধারা অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নদামঙ্গল হইতে কয়েক ছত্র তুলিয়া দিতেছি ঃ—

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার ছায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনা আপনি সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রকৃতি।
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি।
বিনা চন্দ্রানল রবি প্রকাশে আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ-জলে বসি স্থলবিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা।”

এখানে আমরা উপনিষদের নানা বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাই। যথা—

“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণঃ।"
"ন তত্র স্থর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং"
"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

রমাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সাধক কবিদের অধিকাংশ সঙ্গীত উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বসম্বলিত। আধুনিক তরুণ বাঙ্গালী কবিদের রচনায় হিন্দুদর্শনের তত্ত্বকথা দেখা যায় না, বিশ্বসাহিত্যের সহিত যোগ স্থাপন করিতে তাঁহারা অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। ইহা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, পূর্ব্বপুরুষদের সহিত সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া প্রতিবেশীদের সহিত মিলিত হওয়াই উন্নতির লক্ষণ; সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশ্বমানবের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা কল্যাণজনক হইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার নানা অংশ প্রাচীন হিন্দুদর্শনের কথায় সমুজ্জ্বল। তিনি দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের আখ্যানভাগেও গীতা হইতে নানা শ্লোক তুলিয়া নিষ্কামধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দেবী চৌধুরাণীকে যেখানে ইংরাজের সিপাহী ধরিতে আসিয়াছে, সেখানে দেখিতে পাই দেবী চৌধুরাণী নিশি ও দিবাকে হিন্দুদর্শনের তত্ত্ব সরলভাবে বুঝাইতেছেন, সে ব্যখ্যা যেমন স্থন্দর, দেবী চৌধুরাণীর উপস্থিত বিপদের মধ্যে শান্ত সমাহিত ভাবও সেইরূপ মনোহর। সীতারামের প্রারম্ভে তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে বহুশ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন, আসক্তিবশতঃ মহৎ ব্যক্তিরও কিরূপ অধঃপতন হইতে পারে। আনন্দমঠেও তিনি গীতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং হিন্দুধর্ম্মের বহু দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকের মন হিন্দু দর্শনের উৎকর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু আমি যে বলিলাম, হিন্দুরা সকলেই তাহাদের দার্শনিক তত্ত্ব-গুলির সহিত সুপরিচিত এই অবস্থা আজকাল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুর যে সাধনা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, শক, যবন, পাঠান, মোগল, পারসিকদের অসংখ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন-অভিযান সত্ত্বেও আমরা যাহা হারাই নাই রাষ্ট্রবিপ্লবের শোণিতপ্লাবনের মধ্যেও যাহা আমরা উচ্চে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, আজ বুঝি আমরা স্বেচ্ছায় সেই সাধনা অতল কালজলধিতে নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। আজকাল বাংলা ভাষায় যাঁহারা গল্প উপন্যাস লিখেন, তাঁহারা সাধারণতঃ প্রথম হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিকে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এজন্য তাঁহারা অনেকে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, এমন কি কেহ কেহ হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। এই সব লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে যে বাঙ্গলা সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছেন তাহার মধ্যে হিন্দু দর্শনের স্থান কোথায়? এই সাহিত্য যাঁহারা পড়িতেছেন এবং ইংরাজী বিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ বা উদাসীন থাকিয়া যাইতেছেন। তাহার পর চিত্তবিনোদনের জন্য আমরা আর কথক ঠাকুরের কথা শুনি না, বায়স্কোপে গিয়া পাশ্চাত্য ভোগ লালসার চিত্র দেখি, না হয় রেডিওর গান শুনি। মন্দিরগুলি পৌত্তলিকতার আশ্রয় বলিয়া ইংরাজি শিক্ষিতের দ্বারা উপেক্ষিত। ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া Indiscriminate charity বা নির্ব্বিচারে দান বলিয়া আমরা অনাদর করি। এই সকল কারণে হিন্দুদর্শনের যে সকল তত্ত্বের সহিত পূর্ব্বে আমাদের নিরক্ষর নর-নারীরাও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল, সেই সকল তত্ত্বগুলি আমাদের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ বিস্মৃত হইয়া পড়িতেছেন। আমরা শিশুদিগকে মাতৃস্তন্য ছাড়াইয়া হরলিক্ মিল্ক

ধরাইয়াছি, এবং শিক্ষার্থীদিগকে প্রাচীন ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবধাবার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেছি। একজন ইংরেজ যদি পাশ্চাত্য দর্শনের তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত না থাকে তাহা হইলে তাহার বিশেষ কিছু আসে না। তাহাদের দর্শনগ্রন্থগুলি সৌখীন চিন্তার সমষ্টি মাত্র, পণ্ডিত সমাজের মধ্যেই উহা আবদ্ধ, সাধারণ লোকের জীবনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ আছে? একজন একটা ভাল দর্শনের বহি লিখিলেন, পণ্ডিতেরা প্রশংসা করিলেন, কলেজের কতকগুলি ছাত্র তাহা পড়িলেন এই পর্য্যন্ত। তাঁহার চিন্তাতরঙ্গ দার্শনিক পণ্ডিতসমাজের গণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারিল না। কিন্তু হিন্দুর দর্শন হিন্দুর জীবনে ওতপ্রোত। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দুদর্শনের যে ঘনিষ্ঠযোগ, খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের সে ঘনিষ্ঠযোগ নাই। হিন্দু পূজা করে, ধ্যান করে তাহার প্রণালী হিন্দুদর্শন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়; স্তব পাঠ করে তাহার মধ্যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব; তীর্থযাত্রী নদীতীরে বসিয়া সংকল্পের মন্ত্র পড়িতেছে, একটু দাঁড়াইয়া শুনুন, দর্শনের কথা শুনিবেন; হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তক দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ; হিন্দুর সাধুপুরুষদের উপদেশের মধ্যে বহুপরিমাণে দর্শনের কথা; হিন্দুর সমাজগঠন দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; হিন্দুর বর্ণ-ভেদ, আশ্রমব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিধি নিষেধ হিন্দুর দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর অতিথিসেবা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, জীবে দয়া সকলের মধ্যে দার্শনিক ভাব বিদ্যমান। শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি পাঠ করুন দর্শনের কথা পাইবেন, বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধের অনুসন্ধান করুন, দর্শনের তত্ত্ব দেখিবেন। যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিন্দুর জীবনের সহিত এইভাবে বিজড়িত, আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট তরণীর ন্যায় বায়ুভরে ইতস্ততঃ চালিত হইতেছেন।

আজ তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীন,—পূজা করেন না, স্তব পাঠ করেন না। সামাজিক ব্যবস্থার তাঁহারা কোনও প্রয়োজন দেখেন না, তাহার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। অতিথিসেবা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা উঠিয়া গিয়াছে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে গঠিত ভোগবিলাসপূর্ণ জীবন তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষধ এই যে হিন্দুদর্শন আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এইভাবে অবজ্ঞা করিতেছেন, পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাহার ভুয়সী প্রপংসা করিয়াছেন। যে সকল পাশ্চাত্যদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত হিন্দুদর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার মধ্যে গভীর জ্ঞান এবং প্রগাঢ় চিন্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন। কাব্যে ও ললিতকলায় প্রাচীন হিন্দুগণের উৎকর্ষ যদিও সর্ব্ববাদিসম্মত, তথাপি এই সকল বিষয়ে হিন্দুর কীর্ত্তি যে অতুলনীয় ইহা সকল পণ্ডিত বলেন না। কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় যে প্রাচীন হিন্দু জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও দর্শনই যে তাহার সহিত তুলনীয় নহে, একথা প্রায় সকল নিরপেক্ষ সমালোচক এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম যে, আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর যাঁহারা গুরুস্থানীয়, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে দর্শনের উৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন, যে দর্শনের সিদ্ধান্ত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পণ্ডিত মূর্খ নর-নারীর মধ্যে জাতি নির্ব্বিশেষে প্রচারিত হইয়া হিন্দুর জাতীয় জীবন গঠিত করিয়াছে, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর দৈনন্দিন জীবন যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই দর্শনশাস্ত্রকে আধুনিক হিন্দু অবহেলা করিতেছেন ইহা বড়ই দুঃখ এবং আশ্চর্য্যের বিষয়। আপত্তি হইতে পারে, আধুনিক জীবনসংগ্রামে হিন্দুদর্শনের স্থান কোথায়? পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির মধ্যে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইতেছে, কত নূতন যন্ত্র নূতন বাহন আবিষ্কার হইতেছে, মানুষ আজ কেবল জলে স্থলে

নহে অন্তরীক্ষেও স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আজকার এই বৈজ্ঞানিক যুগে হিন্দু যদি দুই তিন হাজার বৎসরের পুরাতন দর্শনশাস্ত্রগুলি ধরিয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে সভ্যজগতে তাহার স্থান কোথায়? ইহার উত্তরে আমি বলিব, জীবন সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাতেই আধুনিক হিন্দুর কি সমগ্র উদ্যম নিযুক্ত হইতেছে? একবার বায়স্কোপের দোকানের ভিড় দেখিয়া আন। পাশ্চাত্য সমাজের ভোগবিলাসপঙ্কিল চিত্রগুলি দেখিবার কি আকুল আগ্রহ, কি অজস্র ধারায় অর্থব্যয়! জীবন সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা করিবার পর আমাদের যে সময় ও উদ্যম উদ্বৃত থাকে তাহা আমরা কিভাবে ব্যয় করি? শুধু বায়স্কোপ দেখিয়া নহে, দুর্নীতিপূর্ণ গল্প, উপন্যাস পাঠ করিয়া, থিয়েটার দেখিয়া গ্রামোফোন ও রেডিওর গান শুনিয়া ব্রিজ খেলিয়া, বাজে গল্প করিয়া আমাদের কতখানি উদ্যম ব্যয় হয়? কেহ আপত্তি করিতে পারেন চিত্তবিনোদন করাওত প্রয়োজন, recreation চাই. জীবিকার জন্য পরিশ্রমের পর লঘু সাহিত্য প্রভৃতি প্রয়োজন। স্বীকার করি প্রয়োজন। কিন্তু চিত্তবিনোদনের জন্য এরূপ অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের অনুকরণ না করিলে কি চলে না? যাহাতে চিত্তবিনোদনও হয়, অথচ জাতীয়ভাবের পুষ্টিও হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, এরূপ উপায়ের সন্ধান করিয়া দিলেন কি? আধুনিক দেশী ও বিলাতী দুর্নীতিপূর্ণ উপন্যাস পাঠ করিলে চিত্তবিনোদন হয়, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ কালিদাস ভবভূতির কাব্য নাটক এ সকল পড়িলে কি চিত্তবিনোদন হয় না? রেডিওর গান না শুনিয়া কথকতা ও ধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্গীত শুনিলে কি চিত্তবিনোদন হয়, না? চিত্তবিনোদন ছাড়া জ্ঞানার্জ্জন জন্যও আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়া থাকি। পাশ্চাত্য দেশ হইতে জ্ঞান আহরণের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতেছি না। জ্ঞানের আলোক সবদিক

দিয়াই আসিতে দিন। কিন্তু আগে আমাদের দেশের দর্শন পড়ুন, তাহার পর পাশ্চাত্য দর্শন পড়ুন। আমাদের দর্শনশাস্ত্র না পড়িয়া পাশ্চাত্য দর্শন পড়া, আর দিবালোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া কৃত্রিম আলোকের সাহায্য গ্রহণ করা একই কথা।

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে, সংস্কৃত জানি না; সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণ দর্শন শাস্ত্র পড়িব কি করিয়া? লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি, অথচ যে ভাষা হইতে আমাদের মাতৃভাষার উৎপত্তি তাহা শিখি নাই, যে ভাষায় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জগতের বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সে ভাষা জানি না। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে সে বাধা অতিক্রম করা কিছু বেশী দুরূহ নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বহু দূরদেশে বাস করিয়া উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অপরিচিত সংস্কৃতভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতেছেন, আর আমাদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা দুরূহ বলিয়া সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন না পড়া লজ্জার বিষয় ইহাতে সন্দেহ কি? শিক্ষক রাখিয়া একটু চেষ্টা করিলেই সহজে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করা যায়। অধিকন্তু আজকাল সকল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ হইয়াছে। সেই সকল বাঙ্গালা পুস্তকের সাহায্যেও হিন্দুদর্শনের সহিত পরিচিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু শিক্ষক রাখিয়া মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়াই ভাল।

পাশ্চাত্য জাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চায় জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ নিযুক্ত করা উচিত কিনা এবিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবসর আছে। নব্যবিজ্ঞান জীবনের অনেক আবশ্যকীয় কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে ইহা স্বীকার করিতেছি, যথা—রোগের চিকিৎসা, দূরদেশে গমন, দ্রুত সংবাদ প্রেরণ। কিন্তু মোটের উপর বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার জগতের উপকার বেশী করিয়াছে, না অপকার বেশী

করিয়াছে ইহা ভাবিবার বিষয়। মানবের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই বিষয়ভোগ বাসনা করে। নব্য বিজ্ঞান ভোগবিলাসের অজস্র উপকরণ প্রস্তুত করিয়া বিলাস প্রবৃত্তি ভয়ঙ্কর রকমে বাড়াইয়া দিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

"বিষয়ভোগ দ্বারা ভোগবাসনা প্রশমিত হয় না। অগ্নিতে ঘৃত ফেলিলে যেমন অগ্নি বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ উপভোগ দ্বারা বাসনা বাড়িয়া উঠে।"

এই নিয়তবর্দ্ধমান ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টায় মানুষের দুঃখের অন্ত নাই। পূর্ব্বে অল্প আয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত। এক্ষণে যাহার আয় বাড়িয়াছে তাহারও অনেক বেশী অভাব। ভোগ যতই বাড়ুক, বাসনা আরও অনেক দ্রুতভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং তৃপ্তি কিছুতেই নাই। অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় ন্যায় অন্যায় বিচারের মধ্যে আসে না; প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে পীড়ন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। নব্য-বিজ্ঞান প্রবলের হাতে বহুবিধ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়া দেয়। প্রবলের ভোগস্পৃহা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। দুর্ব্বল জাতি সমূহের পীড়নলব্ধ ঐশ্বর্য্যেও সে ভোগস্পৃহা পরিপূর্ণ হয় না। তখন প্রবলে প্রবলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এইরূপ একটা প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষ কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়া গেল। তাহাতে সকল য়ুরোপীয় জাতিই অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে। এখন তাহারা রুধিরাক্ত ক্লান্ত দেহে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে পরস্পরের দিকে বিষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের উন্নতির অর্থ পশুবলের উৎকর্ষ। তাহার সহিত হৃদয়ের উন্নতি না হইলে তাহা উপকারী নহে, অনিষ্টকর। যে মহাপুরুষের স্মৃতি লইয়া আজ আমরা এখানে সমবেত

হইয়াছি তাঁহার দূরদৃষ্টি বহুকাল পূর্ব্বে আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞানের ব্যর্থতা অনুভব করিয়াছিল, তাই তিনি বিজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিজ্ঞান, তুমিত অনেক কল বাহির করিয়াছ, মানুষে মানুষে প্রীতি বাড়ে এরূপ কোনও কল বাহির করিতে পার কি ?"

হিন্দু দর্শন অনুসারে মানব জীবনের চরম সফলতা ঈশ্বরলাভে। ঈশ্বরলাভ করিলেই মানবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, অন্য উপায়ে হয় না। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া বিবিধ ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাদ্বারা মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারা যায় না। ভারতের সাধক বলিয়াছেন, "কিমহং তেন কুর্যাং যেনাহম্ অমৃতা ন স্যাম" যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারি তাহার দ্বারা আমি কি করিব ? "ভূমা এব সুখং নাল্প সুখমস্তি।"—অনন্তকে (ব্রহ্ম) পাইলেই সুখ হইতে পারে, অল্প (ক্ষুদ্র বিষয়ভোগ) দ্বারা সুখ হয় না। পৃথিবীর সমগ্র ভোগ-ঐশ্বর্য্য ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, এজন্য তাহারা অল্প।

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

"যদুপতির মথুরাপুরী আজ কোথায় ? রঘুপতির উত্তর কোশল কোথায় ? ইহা ভাবিয়া মন স্থির কর। এই জগৎ সত্য নহে ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিবে।"

আধুনিক জগতের স্বাধীন জাতিসকল বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া রাশি রাশি নবাবিষ্কৃত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করিতেছে ; দ্রুতবেগে প্রভূতপরিমাণে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য অসংখ্য কলকারখানায় তাহাদের দেশ ছাইয়া গিয়াছে। টাকা—আরও

টাকা,—এবং বিষয়ভোগ লইয়া সভ্যদেশের অধিবাসিগণ যেন পাগল হইয়া গিয়াছে, একদণ্ড বিশ্রাম করিবার অবসর নাই, সকলেরই সময়াভাব। পাশ্চাত্য দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এই অবস্থা দেখিয়া যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই কি সভ্যতা ও উন্নতি? বিদ্যাবুদ্ধির সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতি কই? ইহার পরিণাম কোথায়? কেন এমন হইল?—হইল, তাহার কারণ পাশ্চাত্য জাতি সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির উপযোগী সাধন করে নাই। ঐহিক ঐশ্বর্য্যের জন্য তাহারা সাধনা করিতেছে, ঐহিক ঐশ্বর্য্য পাইতেছে, "যাদৃশী ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যাহার যেরূপ সাধনা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয়,—সেই কর্ম্মফল বাদের কথা। য়ুরোপ মধ্যযুগে ধর্ম্মের জন্য সাধনা করিয়াছিল, ধর্ম্মের উন্নতিও হইয়াছিল। তাহার পর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ভোগসুখের আশায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। ইহার প্রতিকার ভোগবাসনা কমান, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার করা, দম্ভের পরিবর্ত্তে বিনয়, আত্মসুখের পরিবর্ত্তে পরোপকার, বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম। ইহার প্রতিকার উপনিষদের উপদেশ—

"ঈশাবাস্যমিদংসর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্য স্বিৎধনম্‌॥"

"জগতে যাহা কিছু আছে সকলই ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত। ঈশ্বর যাহা দেন তাহাই ভোগ করিও। পরের ধন গ্রহণ করিও না।"

য়ুরোপীয় জাতির কর্ত্তব্য তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন, আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাই আমাদের কাজ। আমাদের কর্ত্তব্য ভোগ-ঐশ্বর্য্যের আশায় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন না করা, বিজ্ঞানের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মকে অবহেলা না করা—যে পথে ভারত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, যাহা অবলম্বন করিয়া ভারত প্রলয়ের মধ্যে ভাসিয়া যায় নাই।

ঈজিপ্ট, বাবিলন, এসিরিয়া প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন সহযাত্রী ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াও ধর্ম্মকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করে নাই বলিয়া কালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল ভারত ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া টিকিয়া গিয়াছে। আজ এই ভীষণ দুর্দিনে ভারত যদি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সে সহস্র বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, নচেৎ পৃথিবীব্যাপী প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া সে, চূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমার এই সকল কথা শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন যে আমি বিজ্ঞানের বিরোধী, অথবা দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা চাহি না, তাহা হইলে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারে ; সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চ্চা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের স্থানে বসাইয়া, বিজ্ঞানচর্চ্চাকে ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা আপত্তিজনক, আমি ইহাই উল্লেখ করিতেছিলাম। ধর্ম্মের সহায়ক বা ভৃত্যরূপে জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানের একটি উচ্চ স্থান আছে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। প্রাচীন ভারতে এই ভাবে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াই ভারত বিবিধ বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আশা করি, ভবিষ্যতের ভারত এই ভাবেই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে এবং জগতকে বহু নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপহার দিতে সমর্থ হইবে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, হিন্দুর দর্শন ছয়টি,—ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও বেদান্ত। তন্মধ্যে বেদান্ত দর্শনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, বেদান্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁহাকে পাইবার উপায় নির্দ্দেশ। যে

উপাদানের দ্বারা বেদান্তদর্শনরূপ অপরূপ সৌধটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে উপনিষদের বাক্যাবলী। উপনিষদের বাক্যাবলীর শব্দার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেও ইহাদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা অতিশয় দুরূহ; বিশেষতঃ কতকগুলি বাক্য আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধার্থদ্যোতক বলিয়া মনে হইতে পারে। যে আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি বেদব্যাস উপনিষদের আপাতবিরোধী বাক্য সমূহ বিচার করিয়া তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, এবং একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ দার্শনিক মত স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হিন্দুর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় উপনিষদ বা বেদকে প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করেন, অধিকন্তু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের বাক্যাবলী যে ভাবে বিচার করা হইয়াছে, তাহাই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত স্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ ব্রহ্মসূত্রের একটা নিজস্ব ভাষ্য না থাকিলে কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় শিষ্ট সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। এই জন্য চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের একটা নিজস্ব বেদান্তভাষ্য প্রয়োজন হয় এবং পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার গোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করেন। একজন বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে কোনটি সত্য কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যায়?" তিনি বলিলেন, "গুরু যেরূপ বলিবেন তাহাই সত্য বলিয়া জানিও।" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহার পক্ষে সেইরূপ সাধনমার্গ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "মা কোন ছেলেকে মাছের ঝোল খাইতে দেন, কাহাকেও মাছের পোলাও,—যার পেটে যা সয়।" অর্থাৎ কোন সাধকের

পক্ষে অদ্বৈতবাদ উপযোগী, কাহারও পক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কাহারও পক্ষে দ্বৈতবাদ। পরমহংসদেব এইসকল মতের মধ্যে একটা অপরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন।

ষড় দর্শনের মধ্যে যদিও বেদান্ত দর্শনই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, তথাপি অপর দর্শনগুলিরও যথেষ্ট গৌরব আছে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, প্রভৃতি দর্শনের যে সিদ্ধান্তগুলি উপনিষদের বিরোধী নহে, সে সকল সিদ্ধান্ত বেদান্তদর্শনেও গ্রহণ করা যায়। এই সকল দর্শনের যে সিদ্ধান্তগুলি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সেগুলি উপনিষদের বিরোধী নহে। জগতে স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় তত্ত্বের নির্ণয় এবং বিচার এবং পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ সাংখ্যদর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহাই সাংখ্যদর্শনের শ্রেষ্ঠ অংশ, এবং ইহা গ্রহণ করিতে বেদান্তদর্শনের কোনও আপত্তি নাই। চিত্তবৃত্তি নিরোধ, মনঃসংযম, এবং একাগ্রচিত্তে ধ্যানের দ্বারা মনের যাবতীয় মলিনতা দূর করা যায়; চিত্তের মলিনতা দূর হইলে জ্ঞানের আবরক বিদূরিত হয়, এই ভাবে যোগসিদ্ধ পুরুষ নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী অতীত বা ভবিষ্যৎ যে কোনও ঘটনা জানিতে পারেন। যোগদর্শনের ইহাই শ্রেষ্ঠ অংশ, ইহার সহিতও উপনিষদের কোনও বিরোধ নাই, এবং ইহা গ্রহণ করিতেও বেদান্তদর্শনের কোনও আপত্তি নাই। বস্তুতঃ সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শনের যে অংশ উপনিষদের বিরোধী, সে অংশ অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের এবং তাহা বাদ দিলেও ঐ ঐ দর্শনের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেবল চার্বাক দর্শন উপনিষদের সহিত একান্ত বিরোধী। এই দর্শন ধর্ম্ম অধর্ম্ম মানে না, পরলোক মানে না, ঈশ্বর মানে না, ইহলোকের ভোগৈশ্বর্য্যই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বলা বাহুল্য, বেদান্তদর্শনের মধ্যে এইরূপ নাস্তিক দর্শনের কোনও স্থান নাই।

হিন্দুদর্শনের সকল সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। মাত্র দুই একটি প্রধান সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব। একটি সিদ্ধান্ত এই যে, জগতে দুঃখের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক এবং সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে না পারিলে দুঃখের অত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥"

"মহাত্মাগণ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আমাকে লাভ করিতে পারেন, আমাকে লাভ করিলে দুঃখের আগার অনিত্য সংসারে তাহাদিগকে আর আসিতে হয় না।" শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন, যাহাতে মন সংসারের দিক হইতে ফিরিয়া ভগবদভিমুখী হয় সে জন্য সাধকের সর্ব্বদা চিন্তা করা উচিত যে, সংসার অনিত্য এবং দুঃখ-বহুল। জগতে কত অভাব; যাহার অর্থের অভাব নাই তাহারও রোগ শোক প্রভৃতি কত দুঃখ; ইহা ভাবিলে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, সংসারে দুঃখ খুব বেশী। সংসারে দুঃখ এত বেশী হইলেও, আমাদের সংসারের প্রতি আসক্তি যায় না কেন? কারণ, দুঃখ পাইলেও আমরা সর্ব্বদা আশা করি যে, ভবিষ্যতে সুখ পাইব। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, বৈরাগ্য অতি প্রয়োজনীয়। সুখের আশা ত্যাগ না করিলে সংসারের প্রতি আসক্তি যাইবে না। সংসারের প্রতি আসক্তি না গেলে, মন ভগবদভিমুখী হইবে না, ভগবানকে পাওয়া যাইবে না।

আজকাল একটা কথা শোনা যায় যে, বৈরাগ্যের জন্য ভারতের বহু অনিষ্ট হইয়াছে। বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করিয়া ভারতের কিয়ৎপরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু যে পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, সেই পরিমাণে বা ততোধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, এবং যাঁহারা আর্থিক লাভ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি বেশী মূল্যবান মনে করেন, তাঁহারা ইহাতে

ক্ষুব্ধ হইতে পারেন না। এই ধরুন শঙ্করাচার্য্য বা রামানুজ, শ্রীচৈতন্য বা পরমহংসদেব যদি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পারমার্থিক জ্ঞান লাভ এবং *তাহা প্রচারবিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ উদ্যম নিযুক্ত না করিয়া নূতন বৈজ্ঞানিক* যন্ত্র উদ্ভাবন এবং কল কারখানা স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিভা নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে ভারত হয়ত আরও কিছু অধিক পরিমাণে আর্থিক সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করাতে ভারতের ক্ষতি হইয়াছে ইহা বলা যায় না। কারণ, তাঁহাদের সাধনার ফলে কেবল তাঁহারা নহে, হিন্দুমাত্রেই ধন্য হইয়াছেন। কেবল মাত্র আর্থিক লাভের দিক দিয়া দেখিলেও ভারতের ক্ষতি হইয়াছে ইহাও বোধ হয় বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ, আধ্যাত্মিকতার উপর যে পার্থিব সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই চিরস্থায়ী হয়; অধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধি কিছুকালের জন্য স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণামে অধঃপতন অনিবার্য্য।

প্রশ্ন হইতে পারে ঈশ্বর যদি দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান হন, তাহা হইলে জগতে এত দুঃখ কেন? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর কেবল মাত্র দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান নহেন, অধিকন্তু তিনি ন্যায়বিচারপরায়ণ। যে ব্যক্তি যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে তাহাকে ঠিক সেইরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন। জগতে কত দুঃখ ইহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করি, কিন্তু আমরা যে কত অন্যায় কার্য্য করি, তাহা আমরা সচরাচর লক্ষ্য করি না। জীবিকানির্ব্বাহের জন্যই আমরা কত লক্ষ লক্ষ মূক প্রাণী বধ করি বা পীড়ন করি তাহার সীমা নাই। মানুষের উপর মানুষের যে অত্যাচার তাহাও বিশেষ কম নহে। যদি একদিকে সমগ্র মানবকৃত অন্যায়ের পরিমাণ করা এবং অপর দিকে সমগ্র মানবের দুঃখের পরিমাণ করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে দুঃখের পরিমাণ বেশী বলিয়া বোধ

হইত না। কেহ বলিতে পারেন যে, ঈশ্বর যদি দয়াময় হইতেন তাহা হইলে মানব অন্যায় করিলেও তাহাকে দুঃখ দিতেন না। কিন্তু মানব-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্যই যে তাহাকে দুঃখ দেওয়া প্রয়োজন। বহু সহস্র জন্ম ধরিয়া মানব কেবল বিষয়ভোগে নিমগ্ন থাকে, এ জন্য তাহার বিষয়ভোগের জন্য অতিরিক্ত লালসা হয়, বিষয়-ভোগের চেষ্টায় দুঃখ পাইয়াও কিছুতেই বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে না। পরমহংসদেব বলিতেন, "কাঁটা চিবাইয়া উটের ঠোঁট ক্ষত বিক্ষত এবং রক্তাক্ত হইয়া যায়, তথাপি উট কাঁটা চিবান ছাড়ে না।" আমাদের ন্যায় সংসারী জীবের অবস্থাও সেইরূপ। সংসারে এত দুঃখ পাইয়াও আমরা যখন সংসারের জন্য এত লালায়িত, তখন সহজেই অনুমান হয় যে, সংসারে দুঃখভোগ না থাকিলে আমরা ভুলিয়াও ভগবানকে ডাকিতাম না। দুঃখ ও ভয় পাইয়া মধ্যে মধ্যে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, এবং "হে ভগবান, রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার শরণ লই ;—এইভাবে দুঃখ হইতে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হইতে পারি। অতএব ঈশ্বর দয়াময় হইলেও জীবের দুঃখভোগ অসঙ্গত নহে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য স্নেহময়ী জননীকেও মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে হয়। যে মাতা প্রয়োজন হইলেও সন্তানকে তাড়না করেন না, তিনি যথার্থই সন্তানের মঙ্গলবিধায়িনী নহেন।

আর এক কথা, জগতের দুঃখকষ্ট মানবের কেবলমাত্র দেহ ও মনকে স্পর্শ করিতে পারে, তাহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। দেহ মন ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী। যাহা একদিন ধ্বংস হইবেই তাহা দুইদিন পূর্ব্বে ধ্বংস হইলে বিশেষ দুঃখের বিষয় নহে।

যেহেতু সংসারে অনেক দুঃখ এবং অন্য কোনও উপায়ে সকল প্রকার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না, কেবল ঈশ্বরলাভ হইলে সকল দুঃখ অনন্তকালের জন্য নিবৃত্ত হয়, অতএব ঈশ্বরলাভই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। যাহা

কিছু ঈশ্বরলাভের সহায়ক, তাহাই যত্নপূর্ব্বক অনুশীলন করা উচিত। যাহা বিরোধী তাহা পরিত্যাজ্য। ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনার বিস্তারিত উপদেশ হিন্দুদর্শনে দেওয়া হইয়াছে; প্রবৃত্তি ভেদে বিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই উপায়গুলি গীতায় প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এবং এই তিন প্রকার উপায়ের মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের কারণ বলিয়া কেহ কেহ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বলেন; কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান্ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায় না। কারণ, মনের মধ্যে আসক্তি থাকিলেই বন্ধন হয়। অধিকন্তু গীতায় ভগবান্ এরূপ একটি কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন যে, সেই কৌশল অনুসারে কার্য্য করিলে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। সে কৌশল হইতেছে,—

(১) কর্ম্মের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা।

(২) কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা।

সৎকার্য্য তিন প্রকার—

(১) যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবানের পূজা।

(২) দান অর্থাৎ পরোপকার।

(৩) তপস্যা।

পূর্ব্বোক্ত কৌশল অনুসারে এই তিন প্রকার কর্ম্ম করাই ভগবানের উপদেশ। তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চিত্তের মলিনতা কাটিয়া যায়। মলিনতাই জ্ঞানের আবরক। মলিনতা কাটিয়া গেলে জ্ঞান চিত্তমধ্যে স্বতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করে। জ্ঞান হইতে ভক্তি হয়, ভক্তি হইলে ভগবানকে লাভ করা যায়। সৎকর্ম্মও উপরি উক্ত কৌশল অনুসারে না করিলে বন্ধনের কারণ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাঁহারা

দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি এবং কলহ হইতে দেখা যায়। পরোপকারার্থ কোনও কার্য্য করিবার সময়ও মনে রাখিতে হইবে যে, এই ভাবে কার্য্য করিলে ভগবান প্রীত হইবেন তাহা হইলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। ইহাই এইরূপ কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক যে, কর্ম্মে ব্রতী হইয়া যেন আমাদের চিত্তমধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব না হয়। সে জন্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের ক্ষমতা অতি অল্প, এবং ভগবান ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সকলের দুঃখ-মোচন করিতে পারেন।

অতঃপর জ্ঞানযোগের কথা। যিনি জ্ঞানী তাঁহার মনে কোনও বিষয়ে আসক্তি হয় না। সংসারের অনিত্যতা এবং বিষয়ভোগের অকিঞ্চিৎ-কারিতার কথা তিনি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এ জন্য কোনও বস্তু পাইলে তিনি উৎফুল্ল হন না, কোনও বস্তু না পাইলেও তিনি দুঃখিত হন না। তাঁহার রাগদ্বেষহীন স্থির চিত্ত সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে।

ভক্তিযোগের উৎকর্ষ এই যে, এই পথ অবলম্বন করা সকলের পক্ষেই সহজ এবং ইহার ফলও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার জন্য বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান শক্তির বড় বেশী প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয়—সরল মনে একান্তভাবে ভগবানের শরণ লওয়া। "আমার ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র, তোমার দয়া না হইলে এই দুস্তর ভব-সাগর পার হইবার কোনও উপায় নাই," ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া সর্ব্বদা সকল কার্য্যে ভগবানকে স্মরণ করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক ভগবান নিজ হইতেই তাহা প্রদান করিবেন। এই ভাবে ভারতের অনেক নিরক্ষর নরনারী ভগবানকে লাভ করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিয়াছেন এবং মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ভারতের দার্শনিক চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার জন্য

আমি নব্যশিক্ষিত যুবকগণকে আহ্বান করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহা বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল; সুতরাং ইহা যে জাতীয় চরিত্র গঠনের অনুকূল হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অতীতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বহু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। উৎপত্তি-স্থানের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলে নদীর যেরূপ অবস্থা হয়, অতীতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে জাতির সেইরূপ অবস্থা হয়; তাহাতে বহির্দ্দেশ হইতে আগত নানাবিধ বীজ হইতে নানারকম আগাছা জন্মায় এবং জল অপেয় হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজে এইরূপ নানাবিধ আগাছা জন্মিয়া সামাজিক জীবন বিষাক্ত করিয়া ফেলিতেছে,—যাহাদের বীজ অনেক পরিমাণে বাহির হইতেই আসিয়াছে। এস্থলে আমি দুইটি আগাছার নাম করিব,—সাহিত্যে দুর্নীতি এবং সমাজে যথেচ্ছাচার। জাতীয় জীবন সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকিলে এ আগাছাগুলি বাড়িতে পারিত না।

আমি ইংরাজি শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি, যে বাধা অতীতের সহিত তাঁহাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, সে বাধা তাঁহারা অপসারিত করিয়া দিন, এবং যে আগাছাগুলি সামাজিক জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, সে আগাছাগুলি নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলুন। সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালায় যে কাব্য ও সাহিত্য ভারতের নিজস্ব ভাবধারার দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়াছিল, তাঁহারা যেন তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্বারা তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাবের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত হইয়া থাকেন; তাহার জন্য আর বিশেষ যত্ন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভারতের বিশিষ্ট ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। এই সকল যুবকবৃন্দ ভবিষ্যৎ জীবনে নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন। কেহ কবি হইবেন, কেহ উপন্যাস লিখিবেন,

কেহ শিক্ষক হইবেন, কেহ সংবাদপত্রলেখক হইবেন, কেহ ধর্ম্মপ্রচারক হইবেন, কেহ সমাজ-সংস্কারক হইবেন, কেহ রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, কেহ পরোপকারব্রত অবলম্বন করিবেন, কেহ বা জীবিকার জন্য নগণ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু সকলের পক্ষেই ভারতের প্রাচীন ও বিশিষ্ট ভাবধারার সহিত সংস্পর্শ প্রয়োজনীয়। সাহিত্যসেবী এবং সংবাদপত্রসেবীকে আমি বলিব, এ বিষয়ে আপনাদের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বগুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চিত্তাকর্ষকভাবে প্রচার করিয়া ভারতের প্রাচীন সাহিত্যিকগণ অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক সাহিত্যিকগণের উপরেও সে ভার ন্যস্ত আছে; তাঁহারা যেন ইহা অবহেলা না করেন। সংবাদপত্রসেবিগণ এ বিষয়ে একটি নূতন সুযোগ পাইয়াছেন। পূর্ব্বে দেশে সংবাদপত্রের এরূপ প্রচলন ছিল না, এবং সংবাদপত্র দ্বারা সহজে সাধারণের মধ্যে যে শিক্ষা প্রচার করা যায় আমাদের প্রাচীনগণ সে সুযোগের ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রে যে সকল মন্তব্য প্রচারিত হয়, তাহার মধ্যে ভারতীয় ভাবধারার বিশিষ্টতা যেন ফুটিয়া উঠে—লেখকগণ স্বয়ং সে ভাবধারার সহিত পরিচিত হইলে তাঁহাদের রচনার মধ্যে এই বিশিষ্টতা সহজেই ফুটিয়া উঠিবে,—এবং ধর্ম্ম ও দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি অবলম্বন করিয়া সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, অথবা পৌরাণিক কাহিনী প্রকাশিত করিয়া তাঁহারা যেন এ বিষয়ে সহায়তা করেন। সাধারণ সংবাদ প্রকাশেও কেবল মাত্র সাধারণের প্রিয় বস্তু চয়ন না করিয়া যেন সমাজের কল্যাণকর বস্তুগুলিই সংগ্রহ করেন। আমাদের সংবাদপত্রগুলি অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সংবাদপত্রের পদ্ধতি অনুকরণ করিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে, এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রের গৌরবের বিষয়ও নহে। পাঠকের চরিত্রগঠন অথবা সুশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মাত্র সাধারণের চিত্তাকর্ষক বস্তু

পরিবেষণ,—উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে শ্রেয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র প্রেয়বস্তু পরিবেষণ, সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সাধারণ লোকে যাহা চাহে আমাদিগকে তাহাই দিতে হয় একথা বলিলে চলিবে না। সাধারণের রুচি গঠন করিবার ভারও আপনাদের উপর। চরিত্রের উৎকর্ষসাধক বস্তুগুলিও এভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে যে, তাহারা চিত্তাকর্ষক হইবে। ইহাই প্রকৃত কৌশল—true art. গল্প বলিবার ছলে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব এবং বিবিধ শিক্ষা ও উপদেশ কিরূপে প্রদান করিতে হয়, পুরাণ এবং ইতিহাসের লেখকগণ তাহার পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে সেই পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে মাত্র।

সাধারণ জীবনে আমাদের অনেক দোষ বা ত্রুটি হয়, দার্শনিক জ্ঞান যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাঁহা হইলে সে দোষ এবং ত্রুটি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। ইহা পরস্পরের মধ্যে দ্বেষকলহ কমাইয়া শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করা সহজতর করিয়া দেয়। ইহা জানা থাকিলে প্রাচীন বয়সে অনেককে বলিতে হইবে না,—হায়, আগে যদি জানিতাম তাহা হইলে এ ভুল করিতাম না। পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার উপর এবং ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের পথের উপর ইহা এমন একটি নূতন আলোকপাত করে, যাহা সংসারের বহু অশান্তি দূর করে এবং একটি নূতন তৃপ্তির ভাবে জীবন পরিপূর্ণ করিয়া তুলে।

———

রূপসনাতনের জাতি (১)

(ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৪১)

শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষিণী টীকার উপসংহারে রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব স্বীয় বংশের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে ইঁহারা ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। এ জন্য রূপসনাতনের জাতি সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে তাঁহারা ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছ অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা নিজদিগকে পতিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন; ইহা তাঁহাদের দৈন্য ও বিনয়ের পরিচায়ক। কিন্তু এই মত যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কেহ যদি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কুকর্মবশতঃ জাতি হইতে পতিত হয়েন, অথবা নিজেকে পতিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইল তিনি "নীচবংশে জন্ম" বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারেন না,—তাঁহাকে বলিতে হইবে "আমার ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, কিন্তু কুকর্ম করিয়া আমার জাতিনাশ হইয়াছে।" বিনয়বশতঃ সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজদের আচরণের অযথা নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু "নীচবংশে জন্ম" বলিতে পারেন না। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে সনাতন একাধিক স্থলে "নীচ জাতি" "নীচবংশে জন্ম" বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছদ হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

> সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
> পাছেভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥
> "মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
> একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায়॥"
> বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
> কণ্ডু ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥

তাহার পরেই আছে,—

ভক্তগণ লৈয়া প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥

ঐ পরিচ্ছদেই কিঞ্চিৎ পরে আছে,—

"নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম অন্যায় যত মোর কুলধর্ম।"

* * * *

পুনশ্চ,—সনাতন বলিতেছেন,—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার"

* * * *

সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥"

(সনাতনের উক্তি)

কেবল যে সনাতন 'নীচবংশে জন্ম' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন যে, ইঁহারা নীচজাতি হইতে উৎপন্ন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে আছে, শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় যখন প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি বল্লভভট্টের সহিত রূপ এবং রূপের ভ্রাতা অনুপমের আলাপ করাইয়া দেন। তখন বল্লভভট্ট রূপ ও অনুপমকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহারা দূরে সরিয়া গেলেন, বলিলেন "আমরা অস্পৃশ্য, আমাদিগকে ছুঁইবেন না।" শ্রীচৈতন্যদেব ভট্টকে বলিলেন, "ইঁহাদের জাতি অতি নীচ, আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ, ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না।"

"ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥"

ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ॥
"ইহা না স্পর্শিহ ইহা জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥"

বাস্তবিক ইঁহারা নীচজাতি না হইলে শ্রীচৈতন্যদেব কেন ইঁহাদিগকে নীচজাতি বলিবেন?

কিন্তু যদি তাঁহারা সত্যই নীচ জাতীয় ছিলেন, তাহা হইলে শ্রীজীব-গোস্বামী কেন বলিলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন? আমার বোধ হয় এ সমস্যার এই ভাবে সমাধান করা যায় যে, রূপসনাতনের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পিতা অথবা পিতামহ কেহ অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা অন্য কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহাদের বংশধরগণ আর নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই। রূপসনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের নাম—দবীর খাস এবং সাকর মল্লিক,—এই অনুমান সমর্থন করিতেছে।

রূপসনাতনের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব্বে পিরালি খাঁ নামক একজন মুসলমান পীরধর্ম প্রচারার্থ যশোহর জেলায় আসেন। রূপসনাতনের পিতা এই সময় যশোহর জেলায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি পিরালি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে যবন হরিদাসও সম্ভবতঃ পিরালি ছিলেন। হরিদাসের পিতার নাম ছিল মনোহর চক্রবর্ত্তী। হরিদাসের পিতার মৃত্যু হইলে হরিদাসের মাতাও সহমৃতা হন। শিশু হরিদাস যবনের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হরিদাসের পিতা পিরালি হইয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার হিন্দু আত্মীয়গণ শিশু হরিদাসের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, রূপ ও সনাতন হরিদাসের সহিত বাস করিতেন, একত্র বসিতেন, একত্র আহার করিতেন,—শ্রীচৈতন্যদেবের অপর ভক্তগণের সহিত একত্র বসিতেন না, একত্র আহার করিতেন না। রূপসনাতন যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হইতেন তাহা হইলে হরিদাস তাঁহাদের সহিত একত্র আহার-বিহার করিতে কিছুতেই রাজি হইতেন না,—যেমন হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের অপর উচ্চবংশসম্ভূত ভক্তদের সহিত একত্র আহার-বিহার করিতে রাজি হন নাই। রূপ, সনাতন, হরিদাস তিনজনে একত্র আহার-বিহার করিতেন; ইহা হইতে অনুমান হয়, তাঁহাদের জাতি এক ছিল।

যশোহরের চাঙ্গে পরগণায় পিরালিবংশ এখনও আছে। ব্রাহ্মণ মুচি ধোপা প্রভৃতি সব জাতি এই পিরালি জাতির মধ্যে আছে। গোমাংস ঘ্রাণ করিয়া পিরালি জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, এই মত যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে মুচি পিরালি হইবে কেন? বোধ হয় পিরালি খাঁ মনে করিয়াছিলেন যে, হিন্দুদের জাতিভেদ রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিলে, সেরূপ চেষ্টা অধিক সফল হওয়া সম্ভব।

রূপসনাতনের জাতি (২)

বঙ্গশ্রী—পৌষ ১৩৪২

অগ্রহায়ণের বঙ্গশ্রীতে "সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যা" নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় রূপ-সনাতনের জাতিবিচার করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রূপসনাতন নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, মুসলমানের চাকুরি করিতেন বলিয়া বিনয় করিয়া নিজদিগকে নীচ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কেহ নীচ কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া নিজ জাতি বা বংশকে নীচ বলিতে পারে না। শুধু

তাহাই নহে। যদিও স্বীকার করা যায় যে, সনাতন দৈন্যবশতঃ নিজের জাতিকে নীচ জাতি বলিয়াছেন তথাপি এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ইহাদিগকে নীচ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সত্য সত্যই ইহাদের জাতিতে কোনও দোষ না থাকিলে শ্রীচৈতন্য দেব কখনও ইহাদিগকে নীচ জাতি বলিতে পারিতেন না।

১৩৪১ এর শ্রাবণ সংখ্যার ভারতবর্ষে আমি এই সকল কথা আলোচনা করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের পিতা বা পিতামহ হয় পীরালি ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, নচেৎ অন্য কোনও কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুর্ব্বপুরুষ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিমানবাবু বলিয়াছেন যে, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের পিতা বা পিতামহ যে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে পারেনা। কারণ তাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন ও বাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত আলোচনা করিতেন। তাঁহারা মুসলমান হইলে এই সকল কার্য্যের জন্য কোনও ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত না; এবং শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি তাঁহাদের যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে একথা বলেন নাই যে, তাঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান হইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বলা যায় যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান না হইলেও কোনও কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে কোনও আপত্তি দেখা যায় না। কোনও ব্যক্তি জাতিচ্যুত হইলেও পুরশ্চরণের জন্য এবং ভাগবত আলোচনার জন্য ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। পীরালি ব্রাহ্মণের বংশধর যদি হিন্দু হইতে চাহেন, তাহা হইলেও পৌরোহিত্য প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মণ পাইতে পারেন। যবন হরিদাসও হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। পুর্ব্বপুরুষের ত্রুটী উল্লেখ করিতে সকলেই সঙ্কোচ

অনুভব করেন। তথাপি শ্রীরূপ, শ্রীসমাতন ও শ্রীজীবের গ্রন্থে যে, তাঁহাদের বংশের দোষের কথা একেবারেই উল্লেখ করা হয় নাই তাহা বলা যায় না। শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবতের লঘুতোষণী টীকায় যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাপয়া যায় —

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীকুমারাভিধঃ
কঞ্চিৎদ্রোহমাসাদ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ বৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠাস্ত্রয়োজজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চ্চিতম্॥

শ্রীরূপের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট হইতে আসিয়া নৈহাটীতে বাস করিয়াছিলেন সেখানে মুকুন্দের পুত্র শ্রীকুমার নামক দ্বিজবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সৎকুলজাত হইলেও কোনও দ্রোহ অর্থাৎ অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশ যশোহর জেলায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে মহৎ বৈষ্ণব-গণের প্রিয়তম তিনজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীঅনুপম। যাঁহারা "পুনঃ" (পুনরায়) নিজবংশ পরলোকে এবং ইহলোকে পূজনীয় করিয়াছিলেন।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীকুমার কোনও "দ্রোহ প্রাপ্ত হইয়া" দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, ইহা কি কোনও জাতিভ্রংশকর ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে? পরবর্ত্তী পুনঃ শব্দ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবসর রাখিতেছে না। যে বংশ পূর্ব্বে পূজনীয় হইয়াছিল, কোনও কারণবশতঃ —দ্রোহ প্রাপ্তি হেতু—আর পুজনীয় ছিল না, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅনুপমের পুণ্যচরিত্রে সে বংশ পুনরায় পুজনীয় হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য দেব এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী কেন বারবার শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে নীচ জাতি এবং নীচবংশ বলিয়াছেন; লঘুতোষণীর এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়।

ব্রহ্মবাদ

(ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৪২)

১৩৪২ বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' শ্রীমান্ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস "উপনিষদের ব্রহ্ম" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে আদিমতম মানুষ যখন জন্ম লইল তখন তাহার চিন্তাশক্তি বোধশক্তি কোনও শক্তিরই উদয় হয় নাই, এবং মানব ক্রমশঃ উচ্চ ভাবের চিন্তা করিতে থাকে, অবশেষে ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তা করে। কিন্তু হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বলে যে অসভ্য বন্য মানব সৃষ্টির পূর্বে মহর্ষিদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ঈশ্বর কর্তৃক তাঁহাদের চিত্তে বেদজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং অবিচ্ছিন্ন গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়ের ধারায় আমরা সে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। বুনো জঙ্গলি মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বেদ রচনা করিয়াছিল এরূপ কল্পনা করিবার পক্ষে বাধা এই যে উপনিষদে যে সকল জ্ঞানের কথা আছে সেগুলি অলৌকিক,—অন্য কোনও দেশে অন্য কোনও সুসভ্য জাতির মধ্যেও সেরূপ জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং এই অলৌকিক জ্ঞানরাশি কত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ইতিহাস আজিও তাহার কোনও সন্ধান পায় নাই। চিন্তা করিয়া বিচার করিয়া এই জ্ঞান লাভ করা যায় না, "নৈষাতর্কেন মতিরাপনেয়া", স্বয়ং ঈশ্বর এই জ্ঞান সঞ্চারিত না করিলে ইহা লাভ করা সম্ভব নহে। আমাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া আমরা যে পক্ষপাত হেতু এ কথা বলিতেছি তাহা নহে। বিদেশী মনীষিগণও উপনিষদের অলৌকিক জ্ঞানের আলোচনা করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বিখ্যাত দার্শনিক Schopenhauer বলিয়াছেন "almost superhuman conceptions" "whose originators can hardly be regarded as mere men" অর্থাৎ প্রায় অলৌকিক ধারণা সকল

যাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে কেবল মানুষ বলিয়া মনে করা যায় না। তাঁহার টেবিলে সর্বদা উপনিষদ খোলা থাকিত এবং তিনি শয়ন করিবার পূর্বে উপনিষদকে প্রণাম করিতেন। Deussen বলিয়াছেন যে উপনিষদের মধ্যে "There are philosophical conceptions unequalled in India or perhaps anywhere else in the world"—এই দার্শনিক ধারণাগুলির সমতুল্য ধারণা ভারতের কুত্রাপি নাই, পৃথিবীরও কুত্রাপি নাই। আপত্তি হইতে পারে যে ভারতবর্ষেই প্রথম প্রচার হইল, অপর দেশে হইল না, ইহার কারণ কি? উত্তরে আমরা কেবল বলিতে পারি—ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরের সকল ইচ্ছার কারণ নির্দ্দেশ করা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই অলৌকিক জ্ঞান যে সুদূর অতীত কালে ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, অন্য দেশে প্রচারিত হয় নাই, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হইয়া এই সকল উচ্চ জ্ঞান আহরণ করিয়াছিল এ কথা এই সকল পাশ্চাত্য মনীষিগণও স্বীকার করেন নাই। আমাদের পক্ষে ইহা স্বীকার করা অসম্ভব।

শ্রীমান হিরন্ময়বাবু বলিয়াছেন যে উপনিষদে ব্রহ্মকে সত্য-শিব-সুন্দর বলা হয় নাই। কথাটি ঠিক। এই বাক্যটি ব্রাহ্ম সমাজ পাশ্চাত্য দর্শন হইতে ধার করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে কেন ব্রহ্মকে সত্য-শিব-সুন্দর বলা হয় নাই, ইহার কারণ হিরণ্ময়বাবু যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে। হিরণ্ময়বাবু বলিয়াছেন যে উপনিষদে ব্রহ্মকে জগতের সহিত এক বলা হইয়াছে; কিন্তু জগতে যেমন শিব এবং সুন্দর আছে সেইরূপ অশিব এবং কুৎসিতও আছে; এ জন্যই ব্রহ্মকে শিব ও সুন্দর বলা হয় নাই। আমরা পরে দেখাইতেছি যে উপনিষদে ব্রহ্মকে জগতের সহিত এক বলা হয় নাই,—জগৎ অপেক্ষা অনেক বড় এবং জগতের দোষ দ্বারা লিপ্ত নহেন এরূপ বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জগতে অশিব-অসুন্দর

আছে বলিয়া যদি ব্রহ্মকে শিব-সুন্দর বলিতে বাধা হয়, তাহা হইলে জগতে জ্ঞানহীন অচেতন পদার্থ এবং দুঃখী জীব আছে বলিয়া ব্রহ্মকে জ্ঞানময় এবং আনন্দময় বলিতেও বাধা হইত। কিন্তু উপনিষদ্ ব্রহ্মকে জ্ঞানময় ও আনন্দময় বলিয়াছে,—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত; "আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিল। ব্রহ্ম যদিও জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আছেন তথাপি জগতের পদার্থ সকলের দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না; কারণ তিনি সূক্ষ্ম ও সঙ্গরহিত। "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক-দুঃখেন বাহ্যঃ"—ব্রহ্ম এক, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান; তথাপি লোকের দুঃখে তিনি লিপ্ত হন না; কারণ তিনি বাহিরেও অবস্থিত। জগতে দুঃখ থাকিলেও যদি ব্রহ্মকে আনন্দ বলা যায়, তাহা হইলে জগতে অসুন্দর বস্তু থাকিলেও ব্রহ্মকে সুন্দর বলিতে বাধা হইত না। বাধা এই যে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরাকার, সাধকের অন্তর মধ্যে অনুভবগম্য, বাহ্য বস্তুর ন্যায় তাঁহার স্বরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না, এ জন্য তাঁহাকে সুন্দর বলা যায় না। ব্রাহ্ম সমাজ নিরাকার ব্রহ্মকে কিরূপে সুন্দর বলেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

শ্রীমান হিরণ্ময়বাবু বলিয়াছেন, "উপনিষদের ব্রহ্ম সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টির সঙ্গে এক" ইহা যথার্থ নহে। সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার অংশ মাত্র,—সৃষ্টি ছাড়াইয়াও তাঁহার অনন্ত স্বরূপ বিদ্যমান আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

পাদঃ অস্য বিশ্বা ভুতানি
ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি।

সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার এক চতুর্থ অংশ, (অর্থাৎ তাঁহার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র)। তাঁহার তিন চতুর্থ অংশ (অর্থাৎ অধিকাংশ) অমৃতরূপে উর্দ্ধে (সৃষ্টির বাহিরে) অবস্থান করে।

পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায়
পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে।

অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্ম হইতে অনন্ত জগতের উৎপত্তি হইলেও অনন্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

অগ্নিঃ যথা একঃ ভূবনং প্রবিষ্টঃ
রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব।
একঃ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিশ্চ॥

এক অগ্নি যেমন জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক বস্তুর রূপ গ্রহণ করে, সেই প্রকার এক ব্রহ্ম সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইয়া অবস্থান করেন, প্রতি প্রাণীর রূপ গ্রহণ করেন, এবং "বহিশ্চ" অর্থাৎ সৃষ্টির বাহিরেও অবস্থান করেন।

এই "বহিশ্চ" কথাটির প্রতি আমরা মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকেও এই ভাবে "বহিশ্চ" "বাহ্য" কথার প্রয়োগ আছে। তাহা হইতে বুঝা যায় যে শ্রুতি ইহার উপর জোর দিয়াছেন। সুতরাং "ব্রহ্ম এবং সৃষ্টি উভয়ে অভিন্ন" এই কল্পনা ভ্রান্ত। "তিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে এঁক, তিনি সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টি" এই যে হিরণ্ময়বাবু বলিয়াছেন ইহা যথার্থ নহে। কারণ ব্রহ্ম সমস্ত সৃষ্টির সমষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক এবং সৃষ্টির দোষগুণ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। হিরণ্ময়বাবু উপনিষদের বাদকে Pantheistic বলিয়াছেন। ইহাও ঠিক নহে। কারণ ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যে কেবল অন্তর্নিহিত (immanent) নহেন, তিনি সৃষ্টির বাহিরেও অবস্থিত (transcendent)। ব্রহ্মবাদকে Pantheistic না বলিয়া Pan-en-theistic বলিলে অনেকটা ঠিক হয়।

কঠোপনিষদের বাক্য আলোচনা প্রসঙ্গে হিরণ্ময়বাবু বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তখনকার দিনে ব্রহ্মচর্য্য ছিল না, কারণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে তাঁরা কখন বড় করে ভাব্‌তে দেখেন নি।" পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ এই কঠোপনিষদেই আছে

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যক্-আত্মানম্ ঐক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্

অর্থাৎ ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এ জন্য বাহিরের দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি চক্ষুঃ প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অমৃতত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্তরাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই যে ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা ইহাই ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অথবা ব্রহ্মচর্য্য। ইহাকে সত্য দর্শন করিবার উপায় বলিয়া স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা ব্রহ্মচর্য্য যে উপনিষদের পরবর্ত্তী যুগের কল্পনা হিরণ্ময়বাবুর এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

হিরণ্ময়বাবু এই প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে উপনিষদে দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত আছে,—একটি মায়াবাদ, একটি রসবাদ। বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ঋষির পরস্পর-বিরোধী মত লিপিবদ্ধ আছে—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদব্যাস হইতে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি কোনও আচার্য্যই এরূপ বলেন নাই। আচার্য্যগণের মতে উপনিষদের প্রতি অংশই সত্য, সুতরাং কোথাও পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না। যেখানে মনে হয় যে পরস্পর বিরোধ আছে, সেখানে বিচারপূর্ব্বক আপাতবিরোধের সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

হিরণ্ময়বাবু যে শ্রুতিবাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার সে কল্পনা যে ভ্রান্ত ইহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। মায়াবাদ যথার্থ; কিন্তু রসবাদ হিরণ্ময় বাবুর কল্পনা মাত্র।

প্রথমে মায়াবাদের সমর্থন করিয়া তিনি কতকগুলি উপনিষদ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। পার্থিব জীবনে বহু দুঃখ, জীবন ক্ষণস্থায়ী, ভূমা বা অনন্তকে না পাইলে সুখ নাই, এই সব কথা তিনি উপনিষদ্-বাক্য হইতে প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা হইল মায়াবাদ। তাহার পর তিনি উপনিষদ বাক্য হইতে একটি "রসবাদ" প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে রসবাদ হইতেছে এই যে ঈশ্বর ভাল ও মন্দ মিশ্রিত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টির দ্বারা "নিজের পূর্ণতর প্রকাশ" নহিলে তাঁহার "রসোপলব্ধি হয় না, আনন্দের উৎস শুকিয়ে যায়।" জগৎ সৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরের প্রকাশ পূর্ণতর হইয়াছে ইহা উপনিষদে কোথাও নাই। বরং উপনিষদের মত এই যে জগতের দ্রব্য সকলের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে "হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।" তিনি স্বপ্রকাশ, কোনও বাহ্য বস্তুর উপর তাঁহার প্রকাশ নির্ভর করে না, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং" সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকা প্রকাশ পায় না, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তাঁহার আলোকেই সকলে প্রকাশ পায়। প্রলয়ের সময়, যখন জগৎ সৃষ্টি হয় নাই, তখন যে ব্রহ্মের আনন্দের উৎস শুষ্ক হইয়াছিল, ইহাও বলা যায় না। কারণ আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। আনন্দ শুকাইয়া গেলে ব্রহ্মের স্বরূপ-বিচ্যুতি হইবে। তাহা অসম্ভব। অতএব তাঁহার আনন্দ কখনও শুষ্ক হইতে পারে না। জগৎ থাকুক বা না থাকুক তিনি সর্ব্বদা পূর্ণানন্দময়রূপে অবস্থান করেন। তিনি আত্মারাম, আত্মানন্দ,—বাহ্য বিষয়ের উপর তাঁহার আনন্দ নির্ভর করে না। কিন্তু জীব ব্রহ্মকে না পাইলে প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারে না। এই কথা বুঝাই-

বার জন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ রসং হি এব অয়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি" তিনি আনন্দ স্বরূপ, জীব তাঁহাকে পাইলে আনন্দিত হয় (উদ্দেশ্য এই যে জগতে প্রকৃত সুখ নাই)। কিন্তু হিরণ্ময়বাবু ইহার উল্টা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম জগৎ হইতে রস পান, আনন্দ পান। তাঁহার এই ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। ব্রহ্ম জগৎ হইতে আনন্দ পান না, ব্রহ্ম হইতেই জগৎ আনন্দ পায়। তিনি যে উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি, ইহার অর্থ এই যে বায়ু, নদী সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম নিহিত আছেন, এই সকলের মধ্যেই তাঁহার রূপ দেখিতে পাইলে সকলই মধুময় বোধ হয়। শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়রস ভোগ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্যই নয়।

হিরণ্ময়বাবু তাঁহার কল্পিত রসবাদ প্রসঙ্গে আর একটি শ্রুতি বাক্যের ভুল অর্থ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত আছে যে সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা এক ছিলেন, তাঁহার একা থাকিতে ভাল লাগে নাই, ভয় পাইয়াছিল, এ জন্য তিনি বহুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিরণ্ময়বাবু প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সে সময় একা ছিলেন বলিয়া ভাল লাগে নাই, ভয় পাইয়াছিলেন। ব্রহ্ম খোকা নহেন, তিনি কখন ভয় পাইতে পারেন না। এবং বাহ্য বিষয়ের উপর তাঁহাব সুখ নির্ভর করে না।

জগতে সুখ দুঃখের কারণ রস সৃষ্টি নহে, কারণ জীবের পুণ্যাপুণ্য কর্ম। জীব ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে যে পুণ্য করে তাহার ফলে সুখ পায়, যে পাপ করে তাহার ফলে দুঃখ পায়। কথাটি তেমন Artistic না হইতে পারে, কিন্তু ইহাই হিন্দু ধর্মের (এবং উপনিষদের) নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। এবং ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের পরিচয় প্রদান করে।

মায়াবাদ সম্বন্ধে হিরণ্ময়বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মোটামুটি তাহা

ঠিক। ইহা উপনিষদের "সাম্প্রদায়িক" মত নহে, সমগ্র উপনিষদের ইহাই মত। রসবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মত কাল্পনিক, এরূপ মত উপনিষদে কোথাও নাই। সুতরাং উপনিষদ বাক্যের মধ্যে তিনি যে পরস্পর বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন তাহা অলীক।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে হিরণ্ময়বাবু বলিয়াছেন যে শঙ্করের মতে "ব্রহ্ম জ্ঞাতা মাত্র, তাঁহার জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য কিছু নাই।" ইহা ঠিক নহে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ,—জ্ঞাতা নহেন। জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতা থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। শঙ্কর এই স্বতঃসিদ্ধ কথা অস্বীকার করেন নাই।

হিন্দুর আদর্শ

(ভারতবর্ষ চৈত্র ১৩৪১)

১৩৪১ মাঘের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন,—অনিলবাবু ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উপনিষদ ও গীতায় এ কথা নাই।

কিন্তু গীতায় আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাই :—

না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। ২।১৬

"অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব হইতে পারে না ; সৎবস্তুর বিনাশ হইতে পারে না।"

জগতের বিনাশ হয় এ কথা গীতায় উল্লিখিত আছে। গীতা বলিয়াছেন,

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥ ৮।১৮

(ব্রহ্মার) যখন দিবস হয় তখন অব্যক্ত হইতে জগতের আবির্ভাব হয়; যখন রাত্রি হয় তখন অব্যক্তের মধ্যে জগতের প্রলয় বা বিনাশ হয়।

জগৎ যদি সত্য বস্তু হইত তাহা হইলে জগতের ধ্বংস হইতে পারিত না। কিন্তু জগতের ধ্বংস হয়। অতএব, গীতার মতে, জগৎ মিথ্যা।

বলা বাহুল্য, উপনিষদেরও এই মত।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং
তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো"
(ছান্দোগ্য উপনিষৎ)

"এই ব্রহ্মই জগতের আত্মা; তাহাই সত্য; হে শ্বেতকেতো তুমি তাহাই।"

"তাহাই সত্য"—ব্রহ্মই সত্য। সুতরাং জগৎ মিথ্যা। "হে শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্ম" ইহার অর্থ এই যে, শ্বেতকেতুর দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সবই মিথ্যা। এই সব বাদ দিলে যাহা থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম,—তাহার সহিত শ্বেতকেতু অভিন্ন।

জগৎ মিথ্যা, কারণ ইহা ক্ষণস্থায়ী। ইহা কেবল শঙ্কর বলেন নাই। সকল ধর্মগ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। সকল সাধু পুরুষই ইহা বলিয়াছেন। অনিলবাবু নিজেই বলিয়াছেন "খ্রীষ্টানধর্মের মধ্যেও এই মায়াবাদের প্রভাব রহিয়াছে।" কেবল খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ নহে। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য লেখকেরাও এই কথা বলিয়াছেন। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন,—

We are such stuff as dreams are made of. "স্বপ্ন সকল যে বস্তুতে রচিত, আমরা তাহাই।"

কার্লাইল তাঁহার Past and Present নামক পুস্তকে বলিয়াছেন:—

"this earthly life with its riches and possessions and good and evil hap are not intrinsically a reality at all

but are a shadow of realities. (Book II, chap VI.) "পৃথিবীর এই জীবন—ইহার অর্থ সম্পদ্ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য,—বাস্তবিক পক্ষে সত্য বস্তু নহে,—সত্য বস্তুর ছায়া মাত্র"।

পুনশ্চ, Brother, this planet I find is but an inconsiderable sand grain in the continents of Being : this Planet's poor temporary interests, thy interests and my interests there, when I look fixedly into that eternal Light sea and Flame sea with *its* eternal interests dwindle literally into nothing. (Book III, Chap XV.)

"ভ্রাতঃ, আমাদের এই গ্রহটি (পৃথিবী) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাদেশের তুলনায় একটী বালুকণা মাত্র (হিন্দু দর্শনেও বলে বিষ্ণুর লোমকূপে লক্ষ লক্ষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণার ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায়)। এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারগুলি,—তোমার এবং আমার স্বার্থের ব্যাপারগুলি,—যখন আমি সেই শাশ্বত আলোকসমুদ্র এবং তেজঃসমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি,—সত্য সত্যই শূন্যে পরিণত হয়।"

পৃথিবীর যে কোনও বস্তু বিবেচনা করুন। অনন্ত আকাশের তুলনায় ইহার পরিমাণ নগণ্য (infinitesimal); অতএব ইহা শূন্য (Zero)। ইহা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে অনন্ত কালের তুলনায় তাহা নগণ্য। সুতরাং জগৎ মিথ্যা ইহা গণিতের সত্য (Mathematical truth)—ইহা শঙ্করের কল্পনা নহে।

শঙ্কর "অর্থমনর্থং" বলিয়াছেন বলিয়া অনিলবাবু রাগ করিয়াছেন, বলিয়াছেন "সকল সাধু ব্যক্তি, ধার্মিক ব্যক্তি যদি অর্থকে অনর্থ বলিয়া দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করে তাহা হইলে অধার্মিক ও অসাধু ব্যক্তিদের হস্তেই জগতের সমস্ত অর্থ সঞ্চিত হইবে।"

এ যুক্তি কতকটা এইরূপ :—সাধু ব্যক্তিরা যদি পুলিসের দারোগা না হয়, তাহা হইলে অধার্মিক ও অসাধু ব্যক্তিরাই পুলিসের দারোগা হইবে এবং দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিবে। সাধু ব্যক্তিরা দারোগা হইলে দরিদ্রের অনেক উপকার করিতে পারে। অতএব সকল সাধু ও ধার্মিক ব্যক্তিরই দারোগা হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা অর্থ সঞ্চয় করিয়া জগতের যে উপকার করিতে পারেন, অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকার করিতে পারেন। প্রাচীন ভারতে সাধু পুরুষরা সংসার ছাড়িয়াছিলেন বলিয়া রাজা মহারাজা এবং ধনীরা তাঁহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেন ; রাজশক্তি এবং ধনীর ঐশ্বর্য্য জগতের উপকারে নিযুক্ত হইত। রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণে আমরা ইহা দেখিতে পাই।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "ধর্মভাবের বশে বহু প্রতিভাশালী শক্তিশালী মানুষ যে সংসার-বিরাগী হন, বর্ত্তমান সভ্যতা-সঙ্কটের যে মূল কোথায় সে সন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন, এইটাই আজকাল মানব সভ্যতার একটা পরম বিপদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।" পাশ্চাত্য দেশে যে অনেক বেশী প্রতিভাশালী লোক সংসার বিরাগী হইয়া পড়িতেছেন এবং তজ্জন্যই যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা ত নূতন শুনিলাম। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য দেশে কোনও কোনও প্রতিভাশালী লোক সংসারবিরাগী হইতেন ইহা সত্য, কিন্তু আজকাল খুব কমই হন। "বর্ত্তমান সভ্যতা সঙ্কটের মূল" হইতেছে ইহলোকের ভোগ-সুখকে জীবনের সার করা এবং পরলোকে অবিশ্বাস। আশ্চর্য্যের বিষয় অনিলবাবু গীতা ও উপনিষদের দোহাই দিয়া ইহলোক-সর্বস্বতাকে দৃঢ় করিবার এবং পরলোকে বিশ্বাসকে শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই তিনি নীটশের বাণী "যাহারা তোমাদিগকে পরলোকের আশা দিয়া রাখে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও

না” ইহাকে আধুনিক যুগবাণী, কালপুরুষের ইঙ্গিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। “কালপুরুষের ইঙ্গিত” এক হিসাবে সত্য বটে, কারণ ইহা সর্বনাশের নিশ্চিত পথ!

অনিলবাবু বলিয়াছেন “সংসারের দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের দুইটি পথ আছে। একটি পন্থা মন প্রাণকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে সংসারের কোনও দুঃখ-যন্ত্রণাই আর বিচলিত করিতে না পারে। আর একটি পন্থা সংসারে দুঃখের কারণ সমুদয় দূর করা।” হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে যে বিধিনিষেধগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য এই দ্বিবিধ কল্যাণ। বিধিনিষেধ পালন করিতে হইলে স্বেচ্ছাচারিতা নিরস্ত হয়, আত্মসংযম বৃদ্ধি পায়, তাহাতে “মন প্রাণকে এমন ভাবে, গড়িয়া তোলা হয় যাহাতে সংসারের কোনও দুঃখ-যন্ত্রণা আর বিচলিত করিতে পারে না।” অপর পক্ষে বিধিনিষেধগুলি পালন করিলে পাপ নিবারিত হয়, সুতরাং সংসারে দুঃখের কারণ দূর করা হয়, কারণ পাপই সংসারের দুঃখের কারণ। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনিলবাবু বিধিনিষেধগুলির মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। বলিয়াছেন “তখন হইতেই (শঙ্কর কর্ত্তৃক মায়াবাদ প্রচারের পর হইতেই) ঐহিক জীবনে ভারতের প্রকৃত অধঃ-পতনের সূত্রপাত হইল। গার্হস্থ্যজীবনকে অতি হীন চক্ষে দেখা হইল, তাহাকে বিধিনিষেধের অসংখ্য বন্ধনে পিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।” আমাদের শাস্ত্রের বিধিনিষেধগুলি সংযমের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। সংযমের পথ ছাড়িয়া সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবর্ত্তন করিলে দেশের উন্নতি হইবে,—অনিলবাবুর এই মতটি বড়ই অদ্ভুত, সন্দেহ নাই।

শঙ্করের মায়াবাদ প্রচারের পর স্মৃতির বিধিনিষেধগুলি, প্রবর্ত্তিত হইল—ইহাই বা অনিলবাবু কিরূপে বলিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছিল। মনুসংহিতা খৃষ্টীয় প্রথম

শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই মনুসংহিতাই সমাজে বিধিনিষেধ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ। গৃহস্থ জীবনের যে সকল বিধিনিষেধের প্রতি অনিলবাবু কটাক্ষপাত করিয়াছেন, সে সকল মনুসংহিতাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই বিধি-নিষেধগুলি শঙ্করের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তাহাদের জন্য শঙ্করকে দায়ী করা যায় কিরূপে? স্মৃতির বিধিনিষেধ সম্বন্ধে শঙ্কর খুব কমই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে বিধিনিষেধগুলি মানিবার প্রয়োজন আছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আর সেগুলি মানিবার প্রয়োজন হয় না। শেষোক্ত বাক্যটির উপরই শঙ্কর বেশী জোর দিয়াছেন। দেওয়াই স্বাভাবিক। যিনি জগৎকে মিথ্যা বলিবেন, তিনি বিধিনিষেধগুলিকেও মিথ্যা বলিবেন। যিনি জগৎকে সত্য মনে করিবেন, তিনিই বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিবেন। অনিলবাবু শঙ্করের দুই তরফা নিন্দা করিয়াছেন। এক, শঙ্কর মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। দুই, শঙ্কর সমাজে বিধিনিষেধের ব্যবস্থাগুলির জন্য দায়ী। অনিলবাবুর অভিযোগ দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ; শেষোক্ত অভিযোগটি ইতিহাস-বিরুদ্ধও বটে।

অনিলবাবু ভারতের যে গৌরবময় যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, যখন "ভারত কৃষ্টি ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল, রাষ্ট্রে সমাজে শিল্পে বাণিজ্যে সাহিত্যে অপূর্ব কর্মশক্তি অপূর্ব সৃষ্টিশক্তি দেখাইয়াছিল" তখন যে ভারতের সমাজ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল সে কথা অনিলবাবু বিস্মৃত হইলেন কিরূপে? উপনিষদের যুগে, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে, যে যুগে কালিদাস ও ভবভূতি, আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির, চরক ও সুশ্রুতের প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল,— সকল যুগেই ভারতের সমাজ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে বর্ণাশ্রম ধর্মের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্মই হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বিধিনিষেধগুলি রচিত হইয়াছে।

মনুসংহিতাতে এ কথা বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই গ্রন্থে বৈদিক নিয়মগুলিই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এ কথার অপর স্মৃতিগ্রন্থেও উল্লেখ আছে। মনু বেদপাঠের উপর খুব বেশী জোর দিয়াছেন। অনেক স্থলে বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। মনুর বিধানগুলি অবশ্য পালনীয় এ কথার বেদেও উল্লেখ আছে—

'মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিৎ অবদৎ তৎ ভেষজং' (ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

"মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী।"

মহাভারতেও মনুসংহিতার উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা যে অতি প্রাচীন এবং বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবসর নাই।

বর্ণাশ্রম ধর্মের মূল কথাগুলির গীতাতেও উল্লেখ আছে। পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে বর্ত্তমান জন্ম হয়, জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দ্ধারিত হয়, বর্ণ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে,—এ সকল কথাই গীতাতে সুস্পষ্ট। এবং শাস্ত্রের যে বিধিনিষেধগুলির উপর অনিলবাবু খড়্গহস্ত তাহাদের সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—"

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।

অতএব কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের বিধানগুলি জানিয়া তোমার কার্য্য করা উচিত।"

হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে অনিলবাবু কেবল বেদ ও গীতাকে আমল দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ইহাও দেখা যাইতেছে যে বেদ এবং গীতা উভয়ই শাস্ত্রীয়

বিধিনিষেধগুলির প্রশংসা করিয়াছে। অনিলবাবু বেদ ও গীতার অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে কিরূপে নিন্দা করিতে পারেন তাহা অনিলবাবুই বলিতে পারেন।

স্মৃতিগ্রন্থের প্রতি আধুনিক বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি অনিলবাবু একটু শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আলোচনা করেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে সেগুলি "বৈদিক ঋষিগণের অধ্যাত্ম সাধনালব্ধ গভীরতর সত্যের" উপরেই প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের সুমহান সত্যগুলি যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহারাই বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থাগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; ইহারা ভারতের অধঃপতনের কারণ নহে, প্রত্যুত ভারত যে সকল বিষয়ে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার কারণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা। এ জন্য শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ স্মৃতির বিধানগুলি সাক্ষাৎ ভগবানের আদেশ বলিয়া মান্য করিয়াছেন। কেবল আধুনিক বিজাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত কতকগুলি ব্যক্তি স্মৃতিশাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছেন। তাহার কারণ শাস্ত্রের দোষ নহে, তাহার কারণ বিজাতীয় শিক্ষাপ্রসূত বিদ্বেষবুদ্ধি।

অন্য সকল ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মে যে পরলোকের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে ইহা অনিলবাবু পছন্দ করেন না। তিনি ইহলোকের উপর জোর দিতে চাহেন। কিন্তু গীতা ও উপনিষদেও অনেক স্থলেই যে পরলোকের কথা আছে সে সম্বন্ধে অনিলবাবু কি বলেন? ইহলোক সম্বন্ধে অধিক আগ্রহ এবং পরলোক সম্বন্ধে উদাসীনতার উপনিষদে নিন্দা করা হইয়াছে তাহা কি অনিলবাবু লক্ষ্য করেন নাই?

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতিবালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।
অয়ং লোকোনাস্তিপর ইতি মানী পুনঃপুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

কঠোপনিষদ

"যে ব্যক্তি বালকের ন্যায় অজ্ঞ প্রমাদগ্রস্ত এবং বিত্তমোহে মুগ্ধ তাহার নিকট পরলোক প্রকাশ পায় না। সে মনে করে 'ইহলোকই আছে, পরলোক নাই' এবং পুনঃ পুনঃ যমের বশীভূত হয়।"

পরলোক বাদ দিয়া অনিলবাবু যদি একটা up to date (আধুনিক) ধর্ম গড়িতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে গীতা ও উপনিষদের ধর্ম কিছুতেই বলা যাইবে না।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন "গীতা স্পষ্টই এই জগৎকে ভোগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে.—

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বাশত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্বরাজ্যং সমৃদ্ধং

ইহা কি দারিদ্র্যব্রতের শিক্ষা, সংসার ত্যাগের শিক্ষা?"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সংসার ত্যাগ করিতে বলেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা দ্বারা কি ইহা প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণের মতে কাহারও সংসার ত্যাগ করা উচিত নহে? হিন্দুধর্মে অধিকার ভেদ যে একটি মূল তত্ত্ব তাহা অনিলবাবু ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? অর্জ্জুনের অধিকার যুদ্ধ করা, রাজ্যপালন করা, তাই তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যে সন্ন্যাসের অধিকারী তাহার পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণই কর্ত্তব্য।

বিষয়সুখভোগকে অনিলবাবু খুব উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিন্তু গীতা ও উপনিষদ উভয় গ্রন্থই বিষয় সুখভোগের নিন্দা করিয়াছেন।

যে হি সংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ গীতা.

"সংস্পর্শ হইতে যে সকল ভোগ হয় তাহারা দুঃখের কারণ। তাহারা আদি অন্তযুক্ত। পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে আনন্দ পায় না।"

গীতা ইহাকে রাজসিক সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন

"বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতং ॥" গীতা

"বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে যে সুখ হয় তাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় কিন্তু পরে বিষের ন্যায়। ইহার নাম রাজস সুখ।"

উপনিষদ বলিয়াছেন—

অন্যচ্ছ্রেয়ঃ অন্য দুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুভবতি হীয়েতেঽর্থাৎ চ

উপ্রেয়োবৃণীতে (কঠোপনিষদ্)

"শ্রেয় এবং প্রেয় ভিন্ন বস্তু; উহারা ভিন্ন উদ্দেশ্যে পুরুষকে বন্ধন করে। যাহারা শ্রেয় গ্রহণ করে তাহাদের মঙ্গল হয় যাহারা প্রেয় বরন করে তাহারা পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়।"

অনিলবাবু কিন্তু প্রেয়েরই বিশেষ পক্ষপাতী, কারণ পৃথিবীকে ভোগ করা প্রেয়েরই অন্তর্গত।

পুনশ্চ উপনিষৎ বলিয়াছেন;—

"পরাচঃ কামানন্থযন্তিবালাঃ তে মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশং"

যাহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ তাহারা বাহ্ বিষয়ভোগ করিবার চেষ্টা করে এবং মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়।

অনিলবাবু নিশ্চয় অবগত আছেন যে নচিকেতা যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহিয়াছিল তখন যম নচিকেতাকে ইহলোকে সুখভোগের যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। নচিকেতা যখন ভোগ্য বস্তু সকল প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তখন যম নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র জানিয়া ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অনিলবাবুর পরামর্শ মত যদি নচিকেতা ইহলোকের সুখের দ্রব্য ভাল করিয়া উপভোগ করিতে রাজি

হইত, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত হইত সন্দেহ নাই। যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার যাহার নাই, তাহাকে অবশ্য বিষয় ভোগ করিতে হইবে, ইহাই ঈশ্বরের আদেশ। কিন্তু তাহাকে অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিষয় ভোগ পরিণামে দুঃখদায়ক। যাহার সন্ন্যাসের অধিকার হইয়াছে সে বিষয় ভোগ করিবে না। বেদ বলিয়াছেন "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—যে দিন প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অনিলবাবু এই বেদের বিধান সম্বন্ধে কি বলেন? বলা বাহুল্য শঙ্করাচার্য্যও অধিকারীর পক্ষে সন্ন্যাসের বিধান দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে যেরূপ অধিকার নির্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাস দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, শঙ্কর সেরূপ করেন নাই।

বিষয় ভোগকে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টায় অনিলবাবু লিখিয়াছেন যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য লাভ করিয়া আমরা ঈশ্বরের মত জীবনকে ভোগ করিব। আবার আর এক স্থানে অনিলবাবু লিখিয়াছেন "ভগবান জীবরূপে নিজেই স্বেচ্ছায় এই দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন।" কিন্তু ঈশ্বর বিষয়-সুখ ভোগ করেন না এবং দুঃখ ভোগও করেন না। অন্ততঃ ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর আনন্দময়, জগতের সুখ দুঃখ ভোগ করেন না,—জীব নিজ কর্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে। ব্রহ্ম সূত্র ১।২।৮ সূত্রে "সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ ইতিচেৎ ন বৈশেষ্যাৎ" এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। এ স্থলে উপনিষদের একটি মাত্র শ্লোক তুলিলেই যথেষ্ট হইবে :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

(মুণ্ডক উপনিষৎ)

"দুইটী সুন্দর পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) এক বৃক্ষে (দেহে) থাকে। তাহাদের মধ্যে একজন (জীব) স্বাদু ফল ভোজন করে (কর্ম্মফল ভোগ করে)। অপর পাখী (ব্রহ্ম) ভোজন করে না, কেবল দেখে।" সুতরাং জীব ঈশ্বরের সাধর্ম্যলাভ করিলে তাহার বিষয় ভোগ নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু অনিলবাবু কল্পনা করিয়াছেন যে জীব ঈশ্বরের সাধর্ম্য লাভ করিয়া খুব ভাল করিয়া বিষয় ভোগ করিবে (তাঁহার ভাষায় "এই পৃথিবীকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে")। তাঁহার এ কল্পনা অমূলক—অন্ততঃ উপনিষদে ইহার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গীতা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত সেই স্থিতপ্রজ্ঞ।

গীতা জ্ঞানের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং" "বিবিক্তদেশ সেবিত্বম্" বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, এবং জনশূন্য স্থানে বাস। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা" "বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ"। সুতরাং উপনিষদ ও গীতাতে বৈরাগ্যের কথা নাই, পৃথিবীকে পূর্ণভাবে ভোগ করিবার কথা আছে,—এই তথ্যটি যতই চিত্তাকর্ষক হউক, ইহা সত্য নহে।

হিন্দুর সাধনায় ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, প্রিয় প্রভৃতি রূপে কল্পনা করিবার কথা আছে। ইহার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করা। কিন্তু অনিলবাবু ইহার অপরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ঈশ্বরের "সাধর্ম্য লাভ করিয়া, তাঁহার সখা, সাথী, প্রিয় হইয়া তাঁহারই মত জীবনকে দিব্যভাবে ভোগ করিতে হইবে।"—এ যেন কতকটা দুই বন্ধু মিলিয়া স্ফূর্ত্তি করা! বলা বাহুল্য অনিলবাবুর এ কল্পনা

অলীক। ঈশ্বর জীবন উপভোগ করেন না। যিনি ঈশ্বরের সাধর্ম্য লাভ করিয়া ঈশ্বরকে সখা সাথী প্রিয় মনে করিবেন, তাঁহার বিষয় ভোগ বন্ধ হইয়া যাইবে, তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করিবেন।

ইহা সুবিদিত যে গীতার মতে জগতে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক। কিন্তু অনিলবাবুর বিশেষত্ব এই যে যাহা সুবিদিত তিনি তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রচার করিবেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "অনিত্যম্ অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্বমাম্"। ইহার সরল অর্থ এই যে জগৎ অনিত্য এবং দুঃখময়,—জগতে সুখভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে ভজনা কর। কিন্তু জগৎকে 'দুঃখময় বলিয়া পরিত্যাগ করা অনিলবাবুর প্রচারিত আধুনিক ধর্মমতের বিরোধী। তাই তিনি বলিয়াছেন, "মানুষ যে অহংভাবের বশে কাম ক্রোধ লোভের মধ্যে আসুরিক জীবন যাপন করিতেছে, গীতা ইহাতেই বলিয়াছেন "অনিত্যম সুখম্ লোকম্"। এই ভাবে তিনি জগতের সুখময়ত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ কষ্টকল্পিত। বিশেষতঃ অন্যত্রও গীতায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে জগৎ দুঃখময়।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম শাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে দুঃখের আলয় এবং অনিত্য পুনর্জন্ম আর পাইতে হয় না।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "এখন আসিয়াছে যুক্তিবাদের যুগ (Rationalism)"। কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। এখন আসিয়াছে—ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের যুগ। তাই সিনেমা এবং দুর্নীতিপূর্ণ উপন্যাসের এত ছড়াছড়ি। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তির কথা :—"সংসারের

সুখ কয় দিনের জন্য ? ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী সংসার সুখের আশায় মৃত্যুর দুঃখ এবং তাহার পর দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে। ক্ষুদ্র বিষয়-সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করা সমীচীন। বিষয় ভোগ যত বেশী করিবে, তত ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে। তোমার পূর্বকৃত পুণ্যের ফলে ঈশ্বর তোমাকে যে সুখভোগ দেন,—অনাসক্ত হইয়া তাহাই ভোগ কর। তদপেক্ষা বেশী ভোগের আশা ত্যাগ কর। সুদীর্ঘ সাধনা দ্বারা ঋষিগণ সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। ধর্ম সাধনার প্রণালী তাঁহারা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিও। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহারা যে সামাজিক ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সমাজের সকল নরনারীর পক্ষে সর্ব প্রকারে কল্যাণপ্রদ। বিদ্বেষ বুদ্ধিতে তাঁহাদের ব্যবস্থার নিন্দা করিলে তোমার অনিষ্ট হইবে।” এ সকল খাঁটী যুক্তির কথা। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট বিষয় সুখভোগে বাধা পড়ে। তাই আধুনিক যুগে এ সকল কথার মূল্য নাই। তাই অনিল-বাবুকে গীতা ও উপনিষদের দোহাই দিয়া এক সৃষ্টিছাড়া আধুনিক ধর্ম প্রচার করিতে হইয়াছে এবং শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়া বলিতে হইয়াছে যে, বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাস মানসিক ব্যাধি বিশেষ,—যে, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি নিন্দনীয়।

———

জীবনের লক্ষ্য

(ভারতবর্ষ মাঘ ১৩৪২)

১৩৪২ কার্ত্তিকের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় আমার প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। অনিলবাবু যে মত প্রচার করিতেন তাহার মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন যে ভোগই জীবনের লক্ষ্য ; আবার বলিতেছেন যে কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটি হইতেছে নরকের দ্বার। যে ব্যক্তি ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে তাঁহার ভোগ চাই। অর্থাৎ তাঁহার মনে ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। ইহারই নাম "কাম"। সুতরাং "কাম"কে ত্যাগ করিলে. ভোগকে কখনও জীবনের লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু অনিলবাবু বলিতেছেন যে কামকে ত্যাগ করা উচিত এবং ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত। ইহা সম্ভব নহে।

ভোগকে কেন জীবনের লক্ষ্য করা উচিত হয় না, হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে তাহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভোগ কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এক দিন ভোগ শেষ হইবেই। ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। অনিলবাবু এ সমস্যার কোনও মীমাংসা করেন নাই। আশা করি তিনি এরূপ অসম্ভব কল্পনা করেন না যে ইহলোকের ভোগ চিরস্থায়ী হইবে। মানব জীবনের লক্ষ্য ভোগ নহে— লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত চিরকাল আনন্দ পাওয়া যায় না, ইহা সত্য। এজন্য একথা বলা একেবারে ভুল হয় না—যে আনন্দলাভই মানবজীবনের লক্ষ্য।

গীতা ও উপনিষদে আমরা তিন প্রকার আনন্দের কথা দেখিতে পাই। (১) ইহলোকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া যে আনন্দ, (২) মৃত্যুর পর স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে বিষয় ভোগের আনন্দ, (৩) ঈশ্বরলাভের আনন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় আনন্দ উভয়ই ভোগের অন্তর্গত। তৃতীয় আনন্দ ভোগের আনন্দ নহে। পরলোকে সুখভোগ ইহলোকের সুখভোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ উহা তীব্রতর এবং অধিককাল স্থায়ী। গীতায় প্রথমোক্ত আনন্দে (ইহজীবনের সুখভোগকে) রাজসিক সুখ, বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে (১৮।৩৮), * দ্বিতীয় আনন্দকেও (স্বর্গসুখকে) নিন্দা করা হইয়াছে (৯।২০, ২১), †। অতএব গীতাতে ইহলোকের ভোগ এবং পরলোকের ভোগ উভয়েরই নিন্দা আছে। কেবল মাত্র উপরিলিখিত তৃতীয় প্রকার আনন্দের—ঈশ্বরলাভজনিত আনন্দের—প্রশংসা আছে। যথা "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ আশ্নুতে"—সাধক ব্রহ্মলাভ করিয়া অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়।

* বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥১৮।৩৮

"বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ তাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরে বিষের ন্যায় বোধ হয়। ইহার নাম রাজসিক সুখ।"

† তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ।
গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে ॥৯।২১

"তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। যাহারা বেদের কর্মকাণ্ডকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা এইভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে।"

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানং সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥৮।১৫

"আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মাগণ দুঃখের আলয় এবং পুনর্জন্ম লাভ করেন না—তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন।"

এখানে যাহাকে "পরম সিদ্ধি" বলা হইয়াছে, তাহাই যে গীতার মতে জীবনের লক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা কোনও প্রকার ভোগ নহে—তাহা ঈশ্বর লাভ।

উপনিষদের মতও এইরূপ। ইহলোকের ভোগ সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ

তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। কঠোপনিষদ্

"যাহারা বাহ্য বিষয় ভোগ অনুসরণ করে তাহারা মৃত্যুর বিস্তারিত পাশে পতিত হয়।"

পরলোকের ভোগ সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,—

তদ্ যথা ইহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে

এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

"ইহলোকে কর্মের ফলে যে সুখভোগ হয় তাহা যেমন ক্ষয়শীল, পরলোকে পুণ্যের ফলে যে সুখভোগ হয় তাহাও সেইরূপ ক্ষয়শীল।"

জীবনের লক্ষ্য কি তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে,

"যেন অহং ন অমৃতা স্যাং, কিম্ অহং তেন কুর্য্যাং"

"আমি যাহাতে অমৃত না হইব, তাহার দ্বারা কি করিব।"

বলা বাহুল্য বিষয় সুখ ভোগ করিয়া কেহ "অমৃত" হইতে পারে না। সুতরাং বিষয় সুখভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত নহে।

অমৃতলাভের উপায় সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

কেবলমাত্র ঈশ্বরকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মোক্ষলাভের অপর কোনও পথ নাই।"

সুতরাং উপনিষদেও ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থানেই ভোগকে নিন্দা করা হইরাছে এবং ঈশ্বরলাভ করিয়া মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে।

অনিলবাবু যে প্রকার ভোগকে জীবনের লক্ষ্য বলিতেছেন তাহার স্বরূপ একটু আলোচনা করা যাক্। এই ভোগ পরকালের নয়,—কারণ তিনি বলিতেছেন পৃথিবীকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে, জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে, "ইহৈব" ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য যে ভোগ—তাহা ইহজন্মে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন, "নীচ ইন্দ্রিয় ভোগ নহে।" একথা আমরা মানিতে প্রস্তুত আছি। কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ বৈধ এবং অবৈধ উভয় প্রকার হইতে পারে। বৈধ ভোগ পাপ নহে; অবৈধ ভোগই পাপ। সুতরাং অবৈধ বিষয়ভোগকে "নীচ ইন্দ্রিয় ভোগ" বলিয়া বাদ দিয়া, বৈধ বিষয় ভোগই অনিলবাবুর লক্ষ্য বলিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করা একেবারে অসম্ভব।

অনিলবরণবাবু তাঁহার লক্ষ্য ভোগকে কোনও কোনও স্থানে দিব্য ভোগ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন,—বলিয়াছেন, "দেবতাদের সাহচর্য্যে

তাঁহাদের ন্যায়ই জীবনকে ভোগ করিতে হইবে।" এখানে কিন্তু অনিলবরণ বাবু একটু গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সাহচর্য্যে তাঁহাদের ন্যায় ভোগ হয়। কিন্তু পরলোকের কথা অনিলবাবু তুলিতে চাহেন না। অনিলবাবুর ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে দেবতাদের মত ভোগ করিতে হইলে পরলোকে যাইতে হইবে। ইহলোকে তাহার সম্ভাবনা নাই।

গীতা বলেন, কর্ম কর,—কর্মের ফল চাহিও না; ত্যাগ কর, ত্যাগের ফল—ভোগ চাহিও না। অনিলবাবু বলেন, ত্যাগ কর, ত্যাগের ফল—ভোগ পাইবার জন্য। অতএব অনিলবাবু গীতার ধর্ম অনুসরণ করিতেছেন না।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "মানব প্রকৃতির মধ্যে অশুভ যাহা কিছু আছে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে।" মানব প্রকৃতির মধ্যে প্রধান অশুভ হইতেছে ভোগের আকাঙ্ক্ষা, যাহার নাম কাম। কিন্তু অনিলবাবুর মতে ভোগের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইবে। অনিলবাবু বলিয়াছেন "জগতের সর্বত্র যে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে সমস্ত জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে।" কিন্তু অনিলবাবু ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এভাবে জীবন সম্পূর্ণ সমর্পণ করিলে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা যায় না। জগতে কোনও বস্তু ভোগের অনুকূল, কোনও বস্তু ভোগের প্রতিকূল। যদি আমি ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করি, তাহা হইলে ভোগের অনুকূল বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিব। কিন্তু জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে, কোনও বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না; কারণ তখন এই বুদ্ধির উদয় হয় যে ঈশ্বর সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ পরস্পর বিরোধী।

সমস্ত গীতা ও উপনিষদ শাস্ত্র মন্থন করিয়া অনিলবাবু তাঁহার প্রিয় ভোগবাদ সমর্থক মাত্র দুইটি বাক্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ভোগনিবারক যে বহু বাক্য রহিয়াছে সেগুলি তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই, পড়িয়াছে কেবল দুইটি ভোগ সমর্থক বাক্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি বাক্য ভোগবাদ সমর্থন করে না। প্রথম বাক্যটি ঈশোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং জগৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং॥

"জগতের সকল বিকারশীল বস্তু ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

"ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর" ইহার অর্থ এই যে শব্দস্পর্শাদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু মনের মধ্যে ত্যাগের ভাব থাকিবে,—বিষয় সকল "জগৎ" অর্থাৎ বিকারশীল, ক্ষণস্থায়ী, বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে পরিণামে দুঃখ হইবে, এজন্য বিষয় ভোগ করিবার সময়ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে—অর্থাৎ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা হইবে না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনিলবাবু "ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর" ইহার অর্থ করিয়াছেন "ভোগকে জীবনের লক্ষ্য কর।" অর্থাৎ উপনিষদের যাহা অভিপ্রায় তাহার বিপরীত। যাহারা ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী তৃতীয় শ্লোকে "আত্মহনোজনা" বলা হইয়াছে—তাহারা আত্মঘাতী—কারণ তাহারা আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য জীবন অতিবাহিত করে এবং এই সব আত্মঘাতী লোক মৃত্যুর পর "অন্ধেন তমসাবৃতাঃ" অর্থাৎ ঘোরতর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন "অসূর্য্য" লোকে গমন করিয়া থাকে। পুনরায় নবম শ্লোকে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহারা অবিদ্যার

উপাসনা করে, অতএব "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" অর্থাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। কেনোপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ"—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; স্থতরাং যাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগই জীবনের লক্ষ্য করে তাহারা ব্রহ্মকে পায় না, পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না, এ কথা কঠোপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে লাভ করিবার উপায় "অধ্যাত্মযোগ" (কঠোপনিষদ, ২।১২)—অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ করিয়া আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত রাখা, স্থতরাং বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সাধুগণ ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন—"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" (কঠোপনিষদ্ ২।১৫। যাহার মনে ভোগবাসনা নাই সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে—"তম্ অক্রতুঃপশ্যতি বীতশোকঃ" (কঠ—২।২০)। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মার মধ্যে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে—"কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্" (কঠ—৪।১)। ভোগের দ্রব্য সকল অধ্রুব, তাহাদিগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে ধ্রুব বস্তু (ব্রহ্মকে) পাওয়া যায় না, এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করেন না—"ধ্রুবম্ অধ্রুবেষু ইহ ন প্রার্থয়ন্তে" (কঠ—৪।২)। এই প্রকার ভোগবাদ বিরোধী বাক্যে উপনিষদ সকল পরিপূর্ণ। তথাপি অনিলবাবু বলেন, উপনিষদের মত এই যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "যাহার মন ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে প্রসক্ত তাহাদের পরমেশ্বরাভিমুখী সমাধি হয় না" (গীতা ২।৪৪)। 'যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি আত্মাতেই তুষ্ট, কোনও বাহ্য বিষয় আকাঙ্ক্ষা করেন

না” (২।৫৫)। বাহ্য বিষয় ব্যতীত ভোগ হয় না, সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ কখনও ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারেন না। ‘যখন ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয়, তখন প্রজ্ঞা স্থির হয়” (২।৫৮)। বলা বাহুল্য ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে ভোগ হয় না। “শান্তিলাভ করিতে হইলে মমত্ববোধ বিসর্জ্জন দিতে হয়” (২।৭১)। মমত্বজ্ঞান বিসর্জ্জন দিলে ভোগ হয় না। “যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন” (৫।১১), ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে ভোগের জন্যই কর্ম করিতে হয়; কিন্তু তাহা গীতার মতের বিরোধী। “ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে যে ভোগ হয় তাহা দুঃখের কারণ” (৫।২২) গীতা যাহাকে দুঃখের কারণ বলিয়াছেন তাহাকে জীবনের লক্ষ্য বলিলে একটু ভুল হয় না কি? বস্তুতঃ গীতা ভোগবাদের বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং ভগবান যে অর্জুনকে বলিয়াছেন, “শত্রু জয় করিয়া রাজ্য ভোগ কর” ইহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে অর্জুন ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন। ভগবান বহুবার বলিয়াছেন যে ঈশ্বরলাভকেই অর্জুন জীবনের লক্ষ্য করিবেন, এক্ষণে রাজ্যভোগ উপস্থিত হইয়াছে, অনাসক্ত-ভাবে রাজ্যভোগ করিতে হইবে, এই পর্য্যন্ত।

একটি বালক রাগ করিয়া ভাত খায় নাই। তাহার পিতা তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া বলিলেন, “যাও, ভাত খাইয়া এস”। এক্ষেত্রে কেহ যদি বলেন যে বালকটির পিতার অভিপ্রায় এইরূপ যে তাঁহার পুত্র অন্ন ভোজন করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিবে, তাহা হইলে তাঁহার যে ভুল হইবে, অনিলবাবুরও ঠিক সেইরূপ ভুল হইয়াছে।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন “ত্যাগের নেশায় ভোগকে নিন্দা করিয়া, পরলোকের চিন্তায় ইহলোককে অবহেলা করিয়া ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে।” আমরা দেখিলাম যে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভোগের নিন্দা

করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণ ভোগের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগের নেশা হইয়াছিল কি না অনিলবাবুই বলিতে পারেন। কিন্তু ভোগকে নিন্দা করিলেই যে ইহলোককে অবহেলা করিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। ভোগকে উপেক্ষা করিয়া ইহলোকের কর্ত্তব্য কর্ম করিতে হইবে ইহাই গীতার উপদেশ।

দেখিয়া সুখী হইলাম যে অনিলবাবু এবারের প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'পরলোক সত্য এবং মহান্"। পূর্ব্বের প্রবন্ধে তিনি অন্যরূপ সুর ধরিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে নীটশের বাণী "যাহারা তোমাদিগকে পরলোকের আশা দিয়া রাখে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না"— আধুনিক যুগবাণী, কালপুরুষের ইঙ্গিত। এ বিষয়ে অনিলবাবুর মত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এজন্য আমার শ্রম সার্থক বোধ করিতেছি। কিন্তু পরলোক যদি সত্য ও মহান হয় তাহা হইলে ইহলোকে জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করাকে জীবনের লক্ষ্য করা কেন অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে তাহা বেশ বোঝা যায় না। অনিলবাবু যেরূপ পরলোককে সত্য ও মহান বলিয়া স্বীকার করিতেছেন যদি সেইরূপ ঈশ্বরকে আরও সত্য, আরও মহান বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য না করিয়া ঈশ্বরলাভকেই জীবনের লক্ষ্য করা উচিত; তাহা হইলে আমাদের বিবাদ মিটিয়া যায়।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে আমার মতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ এই যে "যখনই সম্ভব সংসার ত্যাগ, কর্ম ত্যাগ করিয়া পরকালের চিন্তায় মগ্ন" থাকা উচিত। আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে হিন্দুধর্ম সকল রোগীর জন্য এক prescription করে না। যাহাদের সংসার ত্যাগ ও কর্ম ত্যাগের অধিকার আছে, তাহারা অবশ্য ত্যাগ করিবে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকের এই অধিকার আছে। বাকী (এবং অধিকাংশ)

লোকের পক্ষে সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম করিতে হইবে; কেহ শাস্ত্রচর্চ্চা করিবেন, কেহ যুদ্ধ করিবেন, কেহ কৃষিবাণিজ্য করিবেন, কেহ ব্যক্তিগত সেবা করিবেন। কিন্তু এই সব কর্ম করা হইবে ভোগকে লক্ষ্য করিয়া নহে, ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। ইহাই সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের উপদেশ।

কিসে ভারতের সর্বনাশ হইল তাহা নির্দেশ করা আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিষ্ঠালাভ করিবার ইহাই আজকাল সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। কেহ বলেন, প্রতিমা পূজা করিয়া ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে, কেহ বলেন, জাতিভেদ হইতে সর্বনাশ—কেহ বলেন মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়াই সর্বনাশ; কেহ বলেন, মা কালীর কাছে পাঁঠা কাটা হয় বলিয়া ভারতের সর্বনাশ। যাহারা যা খুসী সে তাহাই বলিতেছে। কিন্তু এরূপ হাস্যাস্পদ কথা খুব কমই শোনা গিয়াছে যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই ভারতের অধঃপতন এবং ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলেই ভারত দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে, "এই যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জ্যোতির্ময় দিব্য জীবন" আলোচনা করিলে না কি আমরা দেখিতে পাইব যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত। এই যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের খ্যাতিই সমধিক। তাঁহার উপদেশ ত "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ"; তাঁহার জীবনে ত তাহাই দেখিতে পাই। তিনি বলিতেন, গীতা গীতা বার বার করিলে যাহা পাওয়া যায় (অর্থাৎ ভোগী বা ত্যাগী) তাহাই গীতার সার উপদেশ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনও ত ভোগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষ আরও কয়েক জনের নাম করা যাইতেছে—স্বামী ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী, রামদাস কাঠিয়া বাবাজি, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভোলাগিরি,

বামাক্ষেপা, সন্তদাস মহারাজ। কই ইঁহারা ত কেহ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। পাছে আমরা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যের নাম করি, এজন্য অনিলবাবু "আধুনিক" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের মহাপুরুষদের সাক্ষ্যত ত অনিলবাবুর মতের বিরুদ্ধ।

পূর্ব্বের প্রবন্ধে অনিলবাবু লিখিয়াছিলেন যে শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ প্রচার করিবার ফলে "ঐহিক জীবনে ভারতের প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। গার্হস্থ্য জীবনকে অতি হীন চক্ষে দেখা হইল, তাহাকে বিধি নিষেধের অসংখ্য বন্ধনে পিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।" স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধগুলিকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে—লোকাচার বা মেয়েলি আচারকে এখানে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনিলবাবু বলিয়াছেন, "আমি শাস্ত্রের নিন্দা কোথাও করি নাই, মনুসংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্রকে আক্রমণ করি নাই।" খুব ভাল কথা। অতঃপর অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "হিন্দু সমাজ যে আজ অসংখ্য বিধিনিষেধের অত্যাচারে জর্জ্জরিত সে সবই যে মনুসংহিতা হইতে আসে নাই, বসন্তকুমারবাবু কি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন?" এ বিষয়ে আমার মত জানিবার জন্য যদি অনিলবাবুর কিছুমাত্র কৌতুহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে পারি যে হিন্দু সমাজ বিধি-নিষেধের অত্যাচারে যে পরিমাণে জর্জ্জরিত হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশী জর্জ্জরিত হইয়াছে গীতা-উপনিষদের দুর্ব্যাখ্যাকারীদের উৎপাতে। যে ব্যবস্থা মনোনীত না হইবে তাহাই বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত নহে এই বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে; অর্থাৎ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্ধারণ করিবাব জন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা হইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা গীতার ঠিক বিপরীত। গীতায়

ভগবান বলিয়াছেন কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪)। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার ভুল করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী ; (যেমন অর্জ্জুনের ভুল হইয়াছিল, তাঁহার মনে হইয়াছিল যে যুদ্ধ না করাই তাঁহার কর্ত্তব্য)। এইরূপ ভুল হইবার কারণ এই যে সাধারণ মানবের চিত্ত রাগদ্বেষের অধীন—কিন্তু শাস্ত্রবাক্য রাগদ্বেষহীন ঈশ্বরের উক্তি। পুরাতন যুগের সামাজিক ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগে চলিতে পারে না, এই ধুয়া পাশ্চাত্য জগতেই প্রথমে উঠিয়াছে এবং আরও অনেক ভুল মতের সহিত এই মতটিও আমাদের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধুয়া অনুসারে পাশ্চাত্য জগতে আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন, বিবাহ প্রথাটি বড়ই সেকেলে প্রথা, আধুনিক যুগে ইহা চলিতে পারে না ; ইত্যাদি।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "মনুসংহিতার যুগ হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি, ইহা অস্বীকার করা অন্ধ গোঁড়ামী ভিন্ন আর কিছুই নহে।" অনিলবাবু যদি আমাকে একজন অন্ধ গোঁড়া বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে আমি অবশ্য অত্যন্ত ব্যথিত হইব। কিন্তু আমার মনে হয় যে পাশ্চত্য কুশিক্ষায় যাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে মনুসংহিতার (এবং অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্রের) ব্যবস্থাগুলি সকল যুগেরই সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। ইহার সমর্থনে আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে গীতা ও উপনিষদ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি।* অনিলবাবু গীতা ও বেদ উভয়েই মানেন অথচ এই বাক্যগুলি অশ্রদ্ধা করেন—এই

* তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ গীতা ১৬।২৪
"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্ ইব শরীরিণাং" বেদ

রহস্য তিনি না বুঝাইয়া "অন্ধ গোঁড়ামি" বলিয়া সমস্যাটির অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যুক্তি হিসাবে এই মীমাংসার কোনও মূল্য নাই। অমূল্য উপদেশ সকলের আকর মনুসংহিতার মধ্যে তিনি মক্ষিকাবৃত্তি দ্বারা দুইটি ত্রুটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"এখন কি সকল ব্রাহ্মণই শুধু যজন যাজন দান গ্রহণ প্রভৃতি বৃত্তি লইয়াই থাকিতে পারেন?" না, পারেন না। তখনও থাকিতেন না। মনুই ব্রাহ্মণের নানাবিধ বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কতকগুলি প্রশংসনীয়, কতকগুলি নিন্দনীয়। যজন যাজন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ সৈনিকের বৃত্তি এবং কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন প্রভৃতি বৃত্তিও গ্রহণ করিতে পারে, ইহা মনুরই বিধান। অতএব এক্ষেত্রে অনিলবাবু মনুসংহিতার দোষ ধরিতে গিয়া বিফলকাম হইলেন। অনিলবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে মনুসংহিতায় লেখা আছে যে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে তাহার কানে সীসা গরম করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। প্রাচীনকালে সত্য সত্যই যে যখন তখন শূদ্রদিগকে ধরিয়া তাহাদের কানে গরম সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত, ইহা সত্য নহে। সত্য হইলে, পুরাণে বা ইতিহাসে এরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইত। কিন্তু এরূপ ঘটনার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়না। বেদের কোনও উপদেশই যে শূদ্রকে প্রদান করা হইবে না, ইহাও ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে। কারণ বেদের যাহা সার উপদেশ—তাহা গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃতি হইয়াছে, শূদ্রের তাহা পড়িতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু বেদমন্ত্র অসম্পূর্ণ ভাবে শিখিয়া শূদ্র যদি যজ্ঞ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে—এজন্য একটা ভীতিজনক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে মাত্র। অনিলবাবু পণ্ডিচারী আশ্রমের একজন বিশিষ্ট সাধক এজন্য তাঁহার মত কিছু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইল।

গীতার উপদেশ

(মাসিক বসুমতী ভাদ্র ১৩৩৯)

১৩৩৯ সাল, আষাঢ়ের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ "পারস্যযাত্রা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, বিমানপোত যত উপরে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর "সত্তা হ'ল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবী এল কমে। মনে হ'ল এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয়, তখন সে নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে, তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যতবাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেন না, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে, তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জ্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে মরেই বা কে; কেই বা আপন, কেই বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্ম্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে সমাজনীতিতে ধর্ম্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে, তাদের সম্বন্ধে সান্তনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'বাগদাদে ব্রিটিশদের আকাশ-ফৌজ শেখদের গ্রামে প্রতিদিন বোমাবর্ষণ করছেন।' আকাশ হইতে গ্রামের উপর বোমাবর্ষণ করা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধ করা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমান দোষাবহ বোধ হইল, ইহা বড় আশ্চর্য্য বিষয়। আকাশ হইতে বোমাবর্ষণের ফলে আবালবৃদ্ধবনিতা দোষী নির্দ্দোষ

সকলেই মারা যায়। যুদ্ধে কেবল শত্রুসৈন্যই মারা যায়, তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার মারা যায় না, যাহারা যুদ্ধ করিতে আসে না, তাহারাও মারা যায় না। গ্রামের উপর বোমা ফেলিলে নিরীহ বালক, বৃদ্ধ ও রমণী হত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কাহার সঙ্গে?—যে দুর্য্যোধন ভীমকে বিষ খাওয়াইয়াছিল, পাণ্ডবদিগকে ঘরে আগুন দিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কপট পাশায় পরাজিত করিয়া তের বৎসর বনবাসে পাঠাইয়াছিল, দ্রৌপদীকে সভামধ্যে ধরিয়া আনিয়া বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সেই দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করা কি বড় বেশী অন্যায়? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "[illegible], [illegible]দের অপরাধের হিসাব বোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না," তাঁহার এই মন্তব্য অর্জ্জুন সম্বন্ধে কিরূপ সঙ্গত হইয়াছে পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখিয়াছেন, যে অত্যাচার করে, তাহার ত অন্যায় বটেই, যে অত্যাচার সহ্য করে, তাহারও অন্যায়। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কি উপায়ে অত্যাচারের প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা সাধারণের অবগতির জন্য বুঝাইয়া বলিলে ভাল হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কি বরাবর পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন? যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তাহার জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজে দূত হইয়া কৌরব-সভায় গিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ইচ্ছামত রাজ্যভাগ করিয়া পাণ্ডবদের অংশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।" দুর্য্যোধন যখন তাহাতে রাজি হইল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বিশাল রাজ্য হইতে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম পঞ্চপাণ্ডবকে ছাড়িয়া দাও।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দিব না।" তখন স্থির হইল, যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই, যুদ্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থায় পাণ্ডবদের যুদ্ধ করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষা "নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা" সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন জানিতেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তখন তিনি বলিলেন না, "ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে, আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।" যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া, যখন যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়, তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।" যদি তখন অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইত ? পাণ্ডবগণ পরাজিত হইত, এবং দুর্য্যোধন জয়লাভ করিত। অধর্ম্মের প্রভুত্ব স্থাপিত হইত। মৃতের সংখ্যা যে কিছু কম হইত, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন, এ অবস্থায় তোমার যুদ্ধ করাই উচিত।" শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এতই খারাপ বোধ হইল ?

যদি কোনও অবস্থায় যুদ্ধ করা উচিত বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে সে এই অবস্থায়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যাহাতে বিপক্ষের সাধুতার আশ্রয়ে জয়দৃপ্ত হইয়া উঠিতে না পারে, এ জন্য যদি কখনও সাধু ব্যক্তিকে যুদ্ধার্থ কৃতসংকল্প হইতে বলা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হইলে সে এই স্থলে। যদি কোনও ব্যক্তি যুদ্ধের অপরিহার্য্য দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া, যুদ্ধনিবারণ জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়া, যুদ্ধ অনিবার্য্য দেখিয়া ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, এবং উপদেশপ্রার্থী শিষ্যকে নিঃস্বার্থ-ভাবে কর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সে উপদেশ দিয়াছিলেন।

কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তির মত এই যে, যুদ্ধ কোন অবস্থাতেই করা উচিত নহে। টলষ্টয়ের এই মত। তিনি বলেন যে, কোনও কবির কোনও যুদ্ধের প্রশংসা করিয়া কবিতা লেখা উচিত নহে, কারণ, ঐরূপ কবিতা লিখিলে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের এরূপ মত নহে। কারণ,যু তিনি দ্ধ ও যোদ্ধা বীরকে প্রশংসা

করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। অতএব বোধ হয়, তাঁহার মতে সকল যুদ্ধই যে অন্যায়, তাহা নহে ; ন্যায়যুদ্ধও আছে, অন্যায়যুদ্ধও আছে। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবরা যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা কি রবীন্দ্রনাথ ন্যায়যুদ্ধ বলেন না ? যদি বলেন, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া এত নিন্দা করিলেন কেন ?

বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ মত নহে যে, কাহারও কখনও যুদ্ধ করা উচিত নহে। হিন্দুশাস্ত্র অধিকারিভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন, বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে এক ব্যবস্থা দেন নাই। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন না ; যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অবশ্য ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধই কর্ত্তব্য, তদ্বিপরীত যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। রাজ্যভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষায় ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে না ; স্বদেশের জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, এই ভাবে যুদ্ধ করিলে ভগবান্ প্রীত হইবেন, এই জন্যই ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে। ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়রা যদি বলেন, 'কখনও কোনও অবস্থায় যুদ্ধ করিব না', তাহা হইলে দুষ্ট লোকদের অত্যাচার বাড়িয়া যাইবে। শ্রীরামচন্দ্র যদি যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে সীতার উদ্ধার হইত না, রাবণের অত্যাচারে পৃথিবীর অনেকে বহু দুঃখ পাইত। অর্জ্জুন যদি যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া দুর্য্যোধন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিত। তাহাতে জগতের অনিষ্টই হইত। এ অবস্থায় অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, যুদ্ধমাত্রই অন্যায়, ইহা বলা যায় না। কোনও অবস্থায় যুদ্ধ ভাল হইতে পারে এবং যুদ্ধ না করা অন্যায় হইতে পারে। স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রতাপসিংহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পুত্র-কন্যা অন্নাভাবে রোদন করিয়াছে, তাহাও

সহ্য করিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। সে যুদ্ধ কি অন্যায়? যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তিনি কি উচিত কার্য্য করিতেন? তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া কবি পৃথ্বীরাজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কি (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) "সাম্রাজ্যনীতির উড়ো জাহাজ"—যাহার উদ্দেশ্য মানুষকে নিষ্ঠুর করা? পদ্মিনীর সতীত্বরক্ষার জন্য বালক বাদল যুদ্ধ করিয়াছিল, ষোড়শবর্ষীয় বীর পুত্তজী আকবরের বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, পুত্তের জননী এবং বালিকা বধূও যুদ্ধ করিয়াছিল, সে সব যুদ্ধ কি অন্যায়? আবার গজনীর মামুদ এবং পারস্যের নাদির শাও যুদ্ধ করিয়াছিল। সব যুদ্ধই কি সমান? গুপ্তহত্যাকারী রাজ্যাপহারক দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অপূরণীয় সাম্রাজ্যলোভীর আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া যুদ্ধ—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমান বোধ হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি?

যুদ্ধ ভাল, না সন্ধি ভাল, তাহা বলা যায় না। যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাল। যুদ্ধ কর্ত্তব্য হইলে ভাল, কর্ত্তব্য না হইলে খারাপ। অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য ছিল, তাই অর্জ্জুনের পক্ষে যুদ্ধই ভাল ছিল। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে, এই যুদ্ধকে তিনি অন্যায় যুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, আত্মীয়স্বজন মারা যাইবে বলিয়া অর্জ্জুনের বড় কষ্ট হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেই হইবে, তাহাতে যদি আত্মীয়স্বজন মারা যায়, তথাপি কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আত্মীয়-স্বজন যদি অধর্ম্মের পতাকার তলে দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম। আত্মীয়-স্বজন মারা যাইবে বলিয়া অর্জ্জুন শোকাকুল হইতেছেন, কিন্তু শোকের কারণ নাই, কারণ, আত্মা অমর, যুদ্ধে তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না; দেহ বিনশ্বর, এক দিন ত নষ্ট হইবেই, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার মৃত্যু হয় না,—

গীতার এই উপদেশ উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করিয়াছেন,—("ঘরে বাইরে" উপন্যাসেও এই বাক্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, এইরূপ স্মরণ হয়)। "আত্মা অমর" এই উপদেশ দিলে নিষ্ঠুরভাবে মারিবার প্রবৃত্তি কি ভয়ঙ্কর-ভাবে বাড়িয়া যায় ? রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ এ তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকগণও ত এই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশের ফলে পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা বাড়িয়াছে, না কমিয়াছে ?

আকাশযানে উচ্চে আরোহণ করিলে মারিবার প্রবৃত্তি বাড়ে, রবীন্দ্র-নাথের এ উক্তি যথার্থ নহে। আকাশযানে উড়িবার সুযোগ সকলের হয় নাই, কিন্তু মনুমেণ্ট বা বেণীমাধবের ধ্বজায় অনেকেই আরোহণ করিয়াছেন। উপর হইতে নীচের মানুষ এবং ঘরবাড়ীকে খুব ছোট দেখায় সত্য, কিন্তু নীচের মানুষদিগকে বধ করিবার বা ঘর-বাড়ী ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি কাহারও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বরং উর্দ্ধে উঠিলে মানবের স্বাভাবিক দ্বেষ-হিংসা ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয় এবং ক্ষণকালের জন্য আরোহণকারীর মন এই সকল ক্ষুদ্রতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া উদারতার সংস্পর্শ পাইয়া থাকে। যাহারা আকাশযানে উঠিয়া বোমা ছোড়ে, উপরে উঠিলে তাহাদের স্বভাব হিংস্র হইয়া উঠে বলিয়াই যে তাহারা বোমা ছোড়ে, ইহা সত্য নহে। উড়িবার পূর্ব্বে বোমা ছুড়িবে স্থির করিয়াই তাহারা উপরে উঠে, উপরে উঠিয়া তাহাদের স্বভাব বেশী হিংস্র হয়, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। নীচে দাঁড়াইয়া বোমা ছোড়া অপেক্ষা উপরে উঠিয়া বোমা ছুড়িবার সুবিধা বেশী বলিয়াই তাহারা উপরে উঠে ; হিংস্রভাব বাড়াইবার জন্য উপরে উঠে, ইহা সত্য নহে। পৃথিবীর জিনিষ ঝাপসা বোধ না হইলেও, মানুষ ঘর-বাড়ী বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা গেলেও তাহারা বোমা ছুড়িতে ইতস্ততঃ করিত না।

অনেক সময় দূরবীক্ষণ লাগাইয়া জিনিষগুলি বড় করিয়া দেখিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহারা বোমা ছোড়ে। তাহারা পৃথিবীর দ্রব্যাদি ছোট করিয়া দেখে বলিয়া বোমা ছোড়ে না, পৃথিবীর দ্রব্য—ভোগের দ্রব্য অত্যন্ত বড় করিয়া দেখে, এত বড় করিয়া দেখে যে, তাহাতে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি আবৃত হইয়া যায়, এ জন্যই তাহারা বোমা ছোড়ে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের দুইটি উক্তিই ভুল,—আকাশের উপরে উঠিলে নীচের লোকদিগকে মারিবার প্রবৃত্তি বাড়ে না, গীতার তত্ত্বোপদেশ শুনিলেও নিষ্ঠুর হইয়া লোক-হিংসা করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যুত বাস্তবজগতের সুস্পষ্ট অনুভূতি হইলে যেমন স্নেহ-মমতার উদ্রেক হয়, সেইরূপ পাত্রভেদে দ্বেষ-হিংসাও প্রবল হয়। নিরো, নাদিরশা, আওরঙ্গজেব ইঁহারা ব্যোমযানে উড়েন নাই। কিন্তু নিরপরাধের রক্তে পৃথিবী ভাসাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। য়ুরোপে মহাসমরে ব্যোমযানে না উঠিয়াও অনেক নিষ্ঠুর হত্যা সাধিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন?—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

"সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় সমান মনে করিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে পাপ হইবে না।"

যুদ্ধে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধের ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মফল ভগবান্‌কে সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

"অতএব অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন কর, অসক্ত হইয়া কর্ম্ম-সম্পাদন করিলে মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে।"

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ ॥"

"ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম নিক্ষেপ করিয়া, ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি ভৃত্য এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আশা এবং অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।"

শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উপদেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের "নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা", "অপরাধের হিসাববোধ উদ্যতবাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না", এই সকল মন্তব্য মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

"সকল প্রাণীর সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া যিনি বোধ করেন তিনিই পরম যোগী।" অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে "নির্ম্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে" বলেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥

"যোগী সকল প্রাণীর মধ্যে নিজ আত্মা দর্শন করে এবং নিজ আত্মার মধ্যে সকল প্রাণীকে দর্শন করে।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "করুণ" হইতে বলিয়াছেন,—

"অদেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ॥"

"কোন প্রাণীকে দ্বেষ করিবে না, সকলের সহিত মৈত্রভাবাপন্ন হইবে এবং করুণহৃদয় হইবে।"

"দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।"

"সর্ব্বভূতে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা এবং অপ্রগল্‌ভতা" এই সকল গুণ অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন, অথচ যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, অতএব বুঝিতে হইবে, দয়া ও করুণা অক্ষুন্ন রাখিয়াও যুদ্ধ করা যাইতে পারে। সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য কাহাকেও পীড়া দেওয়া নহে, সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিজের ভোগৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা নহে, সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের আদেশ মান্য করিয়া কর্ত্তব্য পালন করা, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে সহায়তা করা, তাহাতে যে সৈন্যবধ হয়, তাহা অভীষ্ট উদ্দেশ্য নহে, অনভীষ্ট ফলমাত্র।

সকলেই জানেন; গীতা হিন্দুর বড় আদরের সামগ্রী। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব হিন্দুর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়,গীতাকে প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে, ইহাতে ধর্ম্মের সারভাগ সংকলন করা হইয়াছে।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥"

"সকল উপনিষদ হইতেছে গাভী, শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা, অর্জ্জুন গোবৎস, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভোক্তা এবং গীতা দুগ্ধ।"

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনির্গতা ॥"

"গীতা ভালরূপে অধ্যয়ন করা উচিত। অন্য বহুশাস্ত্রে প্রয়োজন নাই। কারণ, গীতা স্বয়ং বিষ্ণুর মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে।"

আধুনিক ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দুগণও ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে নিরীক্ষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। মহাত্মা গান্ধীরও সেই মত। অরবিন্দের মতও অনেকটা সেইরূপ। শিবনাথ শাস্ত্রীও ইহার উচ্চ ধর্ম্মভাবের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তিলকও গীতার উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য এবং পরিতাপের বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতে "গীতার প্রচারিত তত্ত্বোপদেশ এই রকমের উড়ো জাহাজ"—অর্থাৎ ইহা মানুষের স্বাভাবিক স্নেহকরুণা বিলুপ্ত করিয়া নিষ্ঠুর ও হিংস্র করিবার কৌশল মাত্র।

আধ্যাত্মিক সাধনা

(মাসিক বসুমতী পৌষ, ১৩৩৯)

১৩৩৯ জৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসীতে' রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব ক'রে কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষসাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ বলে, আমি স্বীকার করিনি।" ..."মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দেব, সেটাই সমগ্রকে পঙ্গু করবে।"..."পূর্ণকে উপলব্ধি করিতে যদি চাই, তবে কোনো একটা অংশ চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি।"..."গুহাবাসের সন্ন্যাসীকে আমি মানিনে; গুহার বাইরে বিরাট জগৎকে আমি গুহার চেয়ে বেশী সত্য বলেই জানি।"

এই বিচিত্র বিশাল জগৎ যে ঈশ্বর হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তিনি যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে পাইতে হইলে যে জগতের সকল অংশের সহিত যোগস্থাপনা করিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। প্রথমতঃ ইহা সম্ভব নহে। জগৎ অতি বিশাল, মানবের

ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং সকলেই জগতের ছোট বা বড় কোনও একটা অংশে চৈতন্যকে প্রসারিত করিতে পারে মাত্র, সমগ্র জগতেব মধ্যে চৈতন্য প্রসারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা কোনও মানবেরই নাই।

দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রয়োজনও নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ"—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জগতের যখন প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা বিদ্যমান আছে, তখন একটিমাত্র পদার্থের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাকে পাওয়া গেলে, সমগ্ররূপেই পাওয়া যাইবে, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, তাঁহার অংশ নাই, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" অর্থাৎ "তাঁহার কলা বা অংশ নাই, কর্ম্ম নাই, তিনি শান্ত, নির্দ্দোষ এবং নির্লিপ্ত"। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই যখন ঈশ্বর বিদ্যমান, তখন কাহাকেও বাহিরে গিয়া ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতে হইবে না, নিজ হৃদয়ের মধ্যে ঠিকমত অনুসন্ধান করিলেই ঈশ্বরলাভ হইতে পারে।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"
— শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

"এক ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন, (আবার) সকল ভূতের অন্তরাত্মা হইয়া থাকেন।"

"স বা এষ আত্মা হৃদি" ছান্দোগ্যোপনিষদ্ "এই আত্মা (ঈশ্বর) হৃদয়-মধ্যে অবস্থান করেন।"

"অথ যদিদংঅস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিন্নন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" (ছান্দোগ্য)

"এই ব্রহ্মপুর (শরীরে) যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্ম আছে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র

হৃদয়াকাশ আছে, তাহার মধ্যে যে বস্তু (ব্রহ্ম) আছেন, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে—তাঁহাকেই জানিতে হইবে।"

যদিও ঈশ্বর হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করেন, তথাপি তাঁহাকে উপলব্ধি করা অতি দুরূহ। কারণ, স্বভাবতঃই আমাদের ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি সকল বহির্মুখী, বিশেষ চেষ্টা না করিলে তাহাদিগকে অন্তর্মুখী করা যায় না। এ বিষয়ে উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"

"প্রজাপতি ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্মুখী করিয়াছেন, এ জন্য ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবস্তু দেখিতে পায়, অন্তরাত্মা দেখিতে পায় না। কোনও কোনও ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিবার ইচ্ছায় দৃষ্টি অন্তর্মুখিনী করিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে দেখিতে পায়।"

এই যে দৃষ্টি বহির্জগৎ হইতে ফিরাইয়া অন্তরভিমুখে চালনা করা, ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনা। ইহাতে বহির্জগতের সহিত যোগ কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। তাহার কারণ ইহা নহে যে, বহির্জগতে ঈশ্বর নাই। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত বহির্জগতে নানাবস্তুতে বিক্ষিপ্ত হইলে অন্তরমধ্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা দুরূহ হয়। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তেমৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥"

"অবিবেকী ব্যক্তিগণই বাহ্য শব্দাদি বিষয় অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা বারম্বার মৃত্যুপাশবদ্ধ হয়। এই কারণে ধীরগণ মোক্ষের স্বরূপ বিদিত হইয়া এই জগতে অধ্রুববস্তুর মধ্যে ধ্রুববস্তু পাইতে পাইতে ইচ্ছা কনেন না।"

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে চিত্ত নিমগ্ন থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া দুরূহ হয়, কারণ তিনি

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ"

আধ্যাত্মিক সাধনা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বুঝাইবার জন্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

ধনুতে যেরূপ শরযোজনা করিয়া একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য ভেদ করিতে হয়, সেইরূপ ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইয়া প্রণব মন্ত্রের দ্বারা আত্মাকে ঈশ্বরাভিমুখে প্রেরণ করিয়া, ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে হইবে। "অপ্রমত্ত" শব্দের অর্থ এই যে, বাহ্য জগতের রূপরস গন্ধে চিত্ত যেন আকৃষ্ট না হয়। "তন্ময়" হইতে হইবে;—অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল—অনবরত ঈশ্বরচিন্তা না করিলে তন্ময় হওয়া যায় না।

শ্রুতি পুনরপি বলিতেছেন —

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

"একমাত্র তাঁহাকেই জানিবে। অন্য বাক্য ত্যাগ করিবে। তিনি অমৃতের প্রাপক, অর্থাৎ তাঁহাকে পাইলে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।"

"অন্য বাক্য ত্যাগ করার" অর্থ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বাক্য ত্যাগ করা বুঝিতে হইবে। দেখা যায়, সাধুগণ সর্ব্বদা ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মগ্ন থাকেন, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গে তাঁহাদের অভিরুচি থাকে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর সব 'আলুণা' লাগে।

মনে করুন, কোনও ব্যক্তি সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা ছাড়িয়া দিবারাত্র ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন আছেন; ধরুন, তিনি ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়া হৃদয়মধ্যে ভগবানকে দেখিবার চেষ্টা করেন; অথবা অন্ধকার গুহার মধ্যে বসিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন, তিনি সে সকলের সংবাদ রাখেন না; ভাল ভাল কবিতা ও উপন্যাস তিনি পড়েন না, Einstein এর Theory of Relativityর কথা শুনেন নাই ব্রাউনিংএর কবিতা বা ইবসেনের নাটক তিনি পড়েন নাই। সর্ব্বদা কেবল একরূপ ভাবধারা তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে,—ভগবান্, আমাকে দেখা দাও, তোমাকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থ হইবে, ধন মান সুখ যশ কিছুই আমি চাহি না, এ সকলে আমার তৃপ্তি নাই।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।"

তিনি ধন জন চাহেন না, কবিতাও চাহেন না। এইরূপ ব্যক্তি উপনিষদুক্ত আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত আছেন বলিতে হইবে। ঐকান্তিকতার সহিত এই ভাবে সাধনা করিলে তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরলাভ কিছুমাত্র বিচিত্র নহে, এবং ঈশ্বর লাভ হইলে তাঁহার আর কিছুই পাইতে বাকি থাকিবে না। "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি। অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"—যাহার দ্বারা অশ্রুত বস্তু সমুদায়ই শ্রুত হয়, অচিন্তিত (বস্তু) চিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাত (বস্তু) জ্ঞাত হয়; সুতরাং সাধনার সময় যদিও তাঁহাকে বহির্জগৎ হইতে সম্বন্ধ

করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সিদ্ধিলাভের পর নিখিল বিশ্বের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়—সিদ্ধিলাভ না করিলে নিখিল বিশ্বের সহিত সে ভাবে যোগস্থাপন করা সম্ভব হয় না। কারণ, এক ব্যক্তি যতই কেন মেধাবী আর পণ্ডিত হউক না কেন, এই সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-সমন্বিত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশই তিনি জানিতে পারিবেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অল্পসংখ্যক জীবের সুখদুঃখই তাঁহার হৃদয়ে অনুভূত হইতে পারিবে। সুতরাং মানবের পরিপূর্ণতার যদি কোনও আদর্শ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ সাধনার দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষই সেই আদর্শ। যিনি এ ভাবে সিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাঁহার বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক জ্ঞান যত বেশীই হউক, পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে তিনি বহু নিম্নে পড়িয়া থাকিবেন।

কিন্তু এইরূপ সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, শুনুন। ''প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব করে কেবল একটি মাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষসাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ বলে, আমি স্বীকার করিনে।" কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—ঠিক এই ভাবেই সাধন করা দরকার—"পরাচঃ কামানমুযন্তি বালাঃ"—অবিবেকীরাই "প্রকৃতির অন্য সকল দিকে" চিত্ত নিবিষ্ট করে,—ধীর ব্যক্তিগণ "আবৃতচক্ষু" হন, দৃষ্টি বাহির হইতে ফিরাইয়া অন্তরভিমুখে প্রেরণ করেন—"তন্ময়ো ভবেৎ"—তন্ময় হইতে হইবে,—তন্ময় হইবার উপায়ই হইতেছে ''একটিমাত্র ভাবাবেগের বা মননচর্চ্চার (অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তার) প্রবল উৎকর্ষসাধন করা" শ্রুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অন্য চিন্তা, অন্য কথা ছাড়িতে হইবে। সুতরাং উপনিষদ্ যে সাধনার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাহা মানেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, সাধনার লক্ষ্যকে সংকীর্ণ ক'রে তার মধ্যে যেটাকেই বাদ দিব, সেটাই

সমগ্রকে পঙ্গু করবে।" সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মানুষের চিত্ত যত কিছু ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, বাহিরের দিক হইতে সেগুলির সাধনা লক্ষ্য করিলে তাহার অতি অল্প অংশই লাভ করা সম্ভব হইবে। সে সব ঐশ্বর্য্য বাদ দিয়া, সাধনার লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ করিয়া কেবলমাত্র হৃদয়মধ্যস্থিত আত্মার মধ্যে চিত্ত নিবদ্ধ করিলে, মানুষ যে কেবল পঙ্গু হয় না, তাহা নহে, পরিপূর্ণ মানব হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহা করে না বলিয়াই আমাদের ন্যায় শতকরা ৯৯ জন মানব পঙ্গু হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পেটুক বলতে পারে জল খেয়ে কেন পেট ভরাব, জঠরের সমস্ত গহ্বর সন্দেশ দিয়ে ঠাসাই ভোজের চরম আনন্দ। তেমনই মাতাল বলে, খাবার খেতে শক্তির যে অপচয় হয়, সেটা বন্ধ ক'রে একমাত্র মদ খেয়েই তৃপ্তির পূর্ণতা ঘটান চাই।" আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যাঁহারা সমস্ত সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে পেটুক এবং মাতালের সহিত তুলনা করা রবীন্দ্রনাথের উচিত হইয়াছে কি? আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, গম্ভীরনাথ, রামদাস কাটিয়া প্রভৃতি বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা সকলেই শিল্প বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চ্চা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে ঐকান্তিক সাধনাকে পেটুকের লোভ এবং মাতালের নেশার সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করা যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই ইহা নিরপেক্ষ সমালোচকমাত্রই স্বীকার করিবেন।

ঈশ্বরভক্তির উৎকর্ষ বুঝাইতে "হরিপ্রেমে মাতোয়ারা" এরূপ বাক্যের প্রয়োগ পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু এরূপ বাক্য শ্রদ্ধার সহিতই প্রয়োগ হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে শ্লেষ ও বিদ্রূপ

সুস্পষ্ট। ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বিদ্রূপ করা শিষ্টাচারসম্মত নহে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "গুহাবাসের সন্ন্যাসকে আমি মানিনে। গুহার বাহিরে বিরাট জগৎকে আমি গুহার চেয়ে বেশী সত্য বলেই জানি।" যাঁহারা গুহার মধ্যে বসিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা কেহই মনে করেন না যে, গুহাই সত্য, বাহিরের জগৎ মিথ্যা। বাহিরের জগতে চিত্তবিক্ষেপ হয়, এজন্য তাঁহারা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উপনিষদের বাক্য অনুসারে সাধনা করিতে হইলে "আবৃত্তচক্ষু" হওয়া প্রয়োজন, দৃষ্টি বহির্জগৎ হইতে ফিরাইয়া অন্তরের মধ্যে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এইরূপ সাধনার জন্য গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাতে আপত্তিজনক কিছুই নাই। গুহার বাহিরে আসিলেও বাহিরের বিরাট জগৎকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সহজ নহে। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণের সাহায্যেও মানব সমগ্র বিশ্বজগতের উপলব্ধি করিতে পারে না। গুহার মধ্যে বসিয়া সাধনা করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই বিরাট বিশ্বজগৎ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি সম্ভব হয়, কারণ "তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

এই গুহার মধ্যেই যাঁহারা চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাঁহারাই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, একটিমাত্র উপাদান হইতে এই বিচিত্র বিশাল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং"—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", তাহার সহস্রাধিক বৎসর পরে আড়ম্বরপূর্ণ বৈজ্ঞানিকগণ বহু ভুল করিয়া এক্ষণে মাত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেই সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। আর এক কথা, বাহিরের বিরাট জগৎ যে খুব বেশী সত্য, তাহাও নহে, কারণ, সত্য জিনিষ চিরকাল একভাবে অবস্থান করে, যাহা আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ, যাহা আজ আছে, কাল নাই, তাহা খুব বেশী সত্য নহে,—

"তৎ সত্যং"—সত্যবস্তু সেই ব্রহ্ম, আর কিছু নহে। এই কারণেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের চক্ষুতে গুহ্য এবং বাহ্য জগৎ উভয়ই পারমার্থিক সত্তাবিহীন। আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে গুহাপ্রবেশ করিবার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, উপনিষদ্ ব্রহ্মকে "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি গুহার মধ্যে অবস্থিত। আমাদের কামনা বাসনা সকল পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেইরূপ বাহ্য-জগতের কোলাহল ছাড়িয়া স্থির নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, অনেক বড় সাধক গুহার মধ্যে তপস্যা করিয়াই ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনা লোভের পরিচায়ক, অতএব নিন্দনীয়। শ্লোকটি এই—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

"বিশ্বের যাবতীয় নশ্বর বস্তু পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত। অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। অন্য কাহারও সম্পদে লোভ করিবে না।" এখানে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনার কোনই নিন্দা নাই। রবীন্দ্রনাথ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"চলমান জগতে যা কিছু চলচে সমস্তকেই অধিকার করে পূর্ণস্বরূপ আছেন অতএব মা গৃধঃ লোভ কোরো না, এই হোল ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক। পূর্ণকে উপলব্ধি করিতে যদি চাই তবে কোনো একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ করাই লোভ এবং ব্যর্থতা, তাকে বিষয়সুখই বলি আর আধ্যাত্মিক আনন্দই বলি।" ঈশোপনিষদের শ্লোকটির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট—"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—পরধনলোভ ত্যাগ করিতে হইবে। উহার মধ্যে "একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ" করবার কোন

কথাই নাই। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ভগবান্ বিরাজ করেন। সেখানে তাঁহাকে অন্বেষণ করাকে রবীন্দ্রনাথ "একটা অংশে চৈতন্যকে রুদ্ধ" করা বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না। ঈশ্বরকে লাভ করিবার সাধনা অন্য সাধনা-নিরপেক্ষ। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট বচন দ্বারা লাভ করা যায় না মেধা দ্বারা লাভ করা যায় না, বিদ্যা দ্বারাও লাভ করা যায় না। ঈশ্বরকে লাভ করিবার উপায় ঈশ্বরের দয়া,—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—ঈশ্বরের দয়ালাভ করিবার উপায়—অন্য সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া একান্ত-ভাবে ঈশ্বরের শরণ লওয়া। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চা না করিলে যে তাঁহাকে লাভ করা যায় না, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আর ঈশ্বরলাভের অত্যন্ত আগ্রহকে "লোভ" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করাও ঠিক নয়। লোভ শব্দের অর্থ পরদ্রব্য-গ্রহণে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বর ত' পরদ্রব্য নহেন, তিনি পরমাত্মা,—আত্মারও আত্মা—সুতরাং ঈশ্বরলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলা যায় কি ?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন. "বেগবান্ চিত্তকে খোঁটায় বেঁধে বাঁধা খোরাকে পরিতৃপ্ত করা সহজ নয়।" আধ্যাত্মিক সাধনা যে সহজ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ভোগ করা, সে প্রবৃত্তি সংযত করিয়া "আবৃতচক্ষু" হইয়া আত্মান্বেষণ করা অতি দুরূহ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মিথ্যা বা ভ্রান্ত নহে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ যে একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনার নিন্দা করিয়াছেন, উপনিষদে তাহাই সমর্থন করা হইয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চস্তরে আরো-হণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,তাঁহারা সকলেই একনিষ্ঠভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা করিয়াছিলেন,—যেমন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বদেব, শ্রীচৈতন্য-

দেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইত্যাদি। সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিভিন্ন শাখায় যে ইঁহারা তুল্যভাবে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা যথার্থ নহে।* ভারতের বাহিরেও যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারাও সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির যথেষ্ট অনুশীলন করেন নাই,—যথা যীশুখৃষ্ট, **Thomas a Kempis, St Francis of Assissi**। যুক্তি দ্বারা বিচার করিলেও রবীন্দ্রনাথের উক্তি সারবান্ বলিয়া প্রতীত হইবে না। কারণ প্রশ্ন করা যাইতে পারে,—রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত আদর্শ-মানব হইতে হইলে বিজ্ঞানে কতখানি পারদর্শিতা লাভ করা প্রয়োজন? আজ যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য স্কুলের বালকরাও জানে, ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণও তাহা জানিতেন না। তাহা হইলে সে যুগে কি আদর্শমানব হওয়া কাহারও সম্ভব ছিল না? আবার ৫শত বৎসর পরে হয় ত অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, এখন সে সকল কেহই জানে না। অতএব এখনও কি কোনও মানবের পক্ষে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা সম্ভব নহে? এমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে যে, কোনও একটা বিশেষ যুগেই মানবের পক্ষে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে বহির্জগতের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করা কখনই সম্ভব নহে, কারণ বহির্জগৎ অতি বিশাল এবং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককেও স্বীকার করিতে হইবে যে; তাঁহারা জ্ঞানবারিধির সৈকতভূমিতে উপলখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। গেটে (Goethe) মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন **Light—more light** (আলো—আরও আলো)। তাহার কারণ, তিনি বহির্জ্জগতের জ্ঞানের দ্বারা জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া-

* ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাহিত্য রচনা কয়িয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা সিদ্ধিলাভ করিবার পরে। সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারাও একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনা করিয়াছিলেন।

ছিলেন। কিন্তু অন্তরমধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোক না জ্বালিলে সকল সংশয় কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

সে,, সেইসর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মকে) দেখিতে পাইলে সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়," এবং ব্রহ্মদর্শন লাভ করিবার জন্য কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনাই যথেষ্ট ; সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সম্যক্ সাধনার প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথ যেরূপ আদর্শ-মানবের কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তব জগতে সেরূপ মানুষ একটিও দেখা যায় না। আজকাল জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির অসংখ্য শাখাপ্রশাখা। কাব্য, দর্শন, উপন্যাস, নাটকের, ইংরাজী বাঙ্গালা, ফার্সি, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্ম্মাণ, গ্রীক, লাটিন, রুসিয়ান সকল ভাষায় কত অসংখ্য ভাল গ্রন্থ আছে। Physics. Chemistry Geology, Botany, Biology, Zoology, Astronomy, Statics, Dynamics, প্রভৃতি বিজ্ঞানের কত বিভিন্ন শাখায় কত জ্ঞান আহৃত হইয়াছে, আবার নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি কত রকম শিল্প আছে। এক ব্যক্তির এই সকল বিদ্যায় তুল্যভাবে পারদর্শী হওয়া কি সম্ভব? তাহার জন্য যে সময় ও উদ্যমের প্রয়োজন, একটি মানবের পক্ষে তাহা নিয়োগ করা অসম্ভব।* আবার শুধু এই সকল বিদ্যায় খুব পারদর্শী হইলে হইবে না, তাহার সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে। তাহার সময় পাইবেন তিনি কোথায়? আধ্যাত্মিক সাধনা খুব সহজ জিনিষ নহে। ইহার জন্য সুদীর্ঘকালব্যাপী একাগ্রসাধনার প্রয়োজন। শুধু সময় নহে, একাগ্রতাও

---

* গীতা বলিছেন,

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন!।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্॥"

চাই,—বিবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলে সে একাগ্রতা বিনষ্ট হইয়া যায়, নাচ-গান শিখিবার চেষ্টা করিলে, নিয়মিতভাবে Theatre, Bioscope, Radio শুনিলে (এ সকল না হইলে রবীন্দ্রনাথের মতে মানব পঙ্গু হইয়া যাইবে) চিত্ত ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে না, তন্ময় না হইলে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, সে পথ অতি দুরূহ,—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ঈশ্বরলাভ করিবার পথ ক্ষুরধারার ন্যায় সূক্ষ্ম। সে পথ অতি দুর্গম।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, আমার এই সব কথা বলিবার কি ইহাই উদ্দেশ্য যে, সাহিত্য বিজ্ঞান, শিল্প এ সকল চর্চ্চা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি এই সকল চর্চ্চা করিয়া থাকে, ঠিকমত চর্চ্চা করিলে সমাজের উন্নতি হইয়া থাকে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই সকল বিদ্যার সম্পূর্ণ অবহেলা করিলে সধারণ মানবচরিত্রের সুশোভন পরিণতি হয় না। কিন্তু মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা যে ঈশ্বরলাভ, তাহাতে এই সকল বিদ্যার একটি অথবা সকলগুলি যে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। প্রত্যুত ঈশ্বরলাভের জন্য যে একাগ্রচিত্ততা এবং দীর্ঘ সাধনা প্রয়োজন, তাহাতে এই সকল বিদ্যার বেশী রকম আলোচনা অন্তরায় হইবে। গ্রাম্য সুখভোগ অপেক্ষা সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা ভাল, কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা অপেক্ষা ঈশ্বরলাভার্থ একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনা শ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অভিনব মত-প্রচারের ফলে কোনও কোনও ব্যক্তির মধ্যে কিরূপ উৎকট রবীন্দ্র-ভক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহার

উদাহরণস্বরূপ শ্রাবণের 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য নামক একজন লেখকের লেখা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"রবীন্দ্রনাথ কি যে কোনও ঋষির চেয়ে কম না কি? বরঞ্চ শুধু ঋষি বল্‌লেই তো তাঁকে খাটো হয়। আমি তো মনে করি সংস্কৃত-সাহিত্যে যাঁরা আর্ষ প্রয়োগ করে গেছেন, এমন যে কোন ঋষি রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায় বসবার সৌভাগ্য লাভ করলে কৃতার্থ হ'য়ে যেতেন।"

ঋষিগণ সাধাণতঃ "প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব্ব ক'রে কেবল একটি-মাত্র ভাবাবেগের বা মনন-চর্চ্চার প্রবল উৎকর্ষসাধন" করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা সাধনার জন্য "গুহাবাস"ও করিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রণীত কবিতা, উপন্যাস, নাটকে এইরূপ সাধনার বহু নিন্দা করিয়াছে। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ভক্তের মনে ঋষিগণ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা নাই। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আলোচনা করেন,—কবিতা—উপন্যাস—নাটক—বিজ্ঞান সকল বিষয়েরই চর্চ্চা করেন। ঋষিগণ এত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিতেন না। সুতরাং কোন কোন ভক্তের দৃষ্টিতে যে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ আদর্শ-মানব বলিয়া প্রতিভাত হইবেন, এবং ঋষিগণ তাঁহার তুলনার বহু নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হইবেন, এবং এইরূপ ভক্ত যে তাঁহার উদ্ভট কল্পনায় ঋষিগণকে 'রবীন্দ্রনাথের পায়ের তলায়' বসাইয়া তাঁহার মানসচক্ষু চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। বিচিত্র ইহাই যে, 'বিচিত্রার' সম্পাদক এইরূপ হীন ও লজ্জাকর রবীন্দ্র স্তুতি তাঁহার পত্রিকায় স্থান দিয়াছেন।

———

বৌদ্ধধর্ম্ম

(মাসিক বসুমতী শ্রাবণ ১৩৪২)

১৩৪২ আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কবিজনোচিত উচ্ছ্বসিত ভাষা বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে বেশী কিছু বলা হয় নাই। শুধু ইহা বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম ছিল 'অহিংস্রধর্ম্ম' 'অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করা' 'সাধু কর্ম্মের মধ্যে আত্মত্যাগ' 'সর্ব্বজীবের প্রতি অপরিসীম মৈত্রীসাধনা।' কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান বস্তু ঈশ্বর। ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কি বলিয়াছেন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নীরব। বুদ্ধদের কোথাও কি বলিয়াছেন যে, এক সর্ব্বশক্তিমাম্ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন? এ কথা বুদ্ধদেব কোথাও বলেন নাই। শুধু তাই নয়, তিনি ইহাও বলেন নাই যে ঈশ্বর আছেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম, আত্মাকে বাদ দিয়া দেহের ন্যায়, বিড়ম্বনা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখ নাই, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের গুরুতর ত্রুটি বলিয়া আমাদের মনে হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কি মত, তাহা জানিতে কৌতুহল হয়।

তাহার পর অহিংসার কথা। হিন্দুরা যজ্ঞে পশু বধ করিত। বুদ্ধদেব বলিলেন, ইহা বড় নিষ্ঠুর। কিন্তু তিনি ত ইহা বলিলেন না যে, পশুর মাংস ভোজন করা পাপ। আমাদের বৃদ্ধ মনু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশু-মাংস ভোজন করে, সে-ও পশুবধজনিত পাপের ভাগী হয়। সহজ বুদ্ধিতে এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই সহজ 'সত্য

বুদ্ধদেবের চক্ষুতে পড়িল না, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে ? তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করিল, তাহারা পশু-মাংস ভোজন করিত। ফলে যে সকল দেশে বুদ্ধদেবের বাণী প্রচারিত হইল, সে সকল দেশে অহিংসার বহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। চীন জাপান তিব্বত ব্রহ্মদেশে বুদ্ধদেবের অনুচরদের রসনা-তৃপ্তির জন্য নিত্য লক্ষ লক্ষ জীব হত্যা হইতেছে, যাহারা এই সব প্রাণীর মাংস ভোজন করিতেছে, তাহারা যে কিছু পাপ করিতেছে, ইহা মনে করে না ; কারণ, তাহারা ত প্রাণিহত্যা করে নাই ! আর ভারতবর্ষের হিন্দুরা যাহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, মা-কালীর নিকট পাঁঠা বলি দেয়—তাহাদের মধ্যেই মাংস ভোজনের জন্য জীবহত্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। বুদ্ধদেব বুঝেন নাই, রবীন্দ্রনাথও বুঝিলেন না যে, যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থার কারণ এই যে, হিংসা করা যাহাদের স্বভাব, তাহাদিগকে ক্রমশঃ অহিংসার পথে লইয়া যাওয়া। তাহাদিগকে বলা হইল যে, যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র পশুবধ পাপ ; তাহারা ইহা বিশ্বাস করিয়া যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র পশু-বধে বিরত হইল। ফলে মোট পশু-বধের সংখ্যা কমিয়া গেল।

এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেবকে প্রশংসা করিবার উপলক্ষ করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে নিন্দা করিবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মে 'মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দেওয়া' হইয়াছে—ইহাই না কি ভারতের অধঃপতনের কারণ ? না হয় মানিলাম যে, জাতিভেদ ছিল বলিয়াই হিন্দুর পতন হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে ত জাতিভেদ নাই, তথাপি পতন হইল কেন ? ভারতে বৌদ্ধ নৃপতিরা বিস্তীর্ণ রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে'—তথাপি ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল কেন ? বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশ পরপদানত হইল কেন ? বৌদ্ধ তিব্বত, বৌদ্ধ চীন লাঞ্ছিত হইল কেন ? জাপান

কি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল বুদ্ধদেবের অহিংসা মন্ত্র জপ করিয়া? জাপান কি এক্ষণে চীনের প্রতি অহরহ 'অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়' নিরত আছে? এই সব আলোচনা করিলে কি ইহা প্রতীতি হয় না যে, উত্থান-পতন সংসারের নিয়ম; জগতে পশুবল অনেক সময় জয় লাভ করে; দুর্বৃত্ত অধার্ম্মিকও মধ্যে মধ্যে নিরীহ ধার্ম্মিকের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে?

'মানুষে মানুষে বেড়া' তুলে দেওয়াকে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু সভ্যতার সূত্রপাত হইতে 'মানুষে মানুষে বেড়া' তুলিয়া দেওয়া হইতেছে এই প্রথা সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত। যখন মানুষের ঘর-দ্বার ছিল না, অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত—তখনই কোনও বেড়া ছিল না। এখন সর্ব্বত্রই বেড়া আছে। প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য বেড়া তুলিয়া থাকে। বেড়া ভাঙ্গিয়া দিলে সব সময় সুফল হইবে না; কারণ, অনেক ক্ষেত্রে মনুষ্যদেহের মধ্যেই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ভীষণ পশু বাস করে, সেই সকল পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বেড়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সবরমতী আশ্রমে বেড়া আলগা করা হইয়াছিল, এজন্য নীলা নাগিনীর বিষে অনেক আশ্রমবাসী জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি সকল স্থানে বেড়া ভাঙ্গিয়া দিতে বলেন, তাহা হইলে কোনও সভ্য সমাজই তাঁহার মত গ্রহণ করিবে না। হিন্দুর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উপরেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সমধিক আক্রোশ। কিন্তু হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ঋষিদের সত্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। ইহা সমাজে ভেদের সৃষ্টি করে না; ইহা ঐক্যেরই সৃষ্টি করে। 'সব মানুষের সমান অধিকার হওয়া উচিত,' পাশ্চাত্য সভ্যতার এই উক্তি ভ্রান্ত

বাস্তবিকপক্ষে সব মানুষের সমান অধিকার হওয়া উচিত নহে, সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য সমাজেও নাই। পাশ্চাত্য সমাজে মুখে বলা হয় যে, সমান অধিকার হওয়া উচিত, কিন্তু কাযে সমান অধিকার দেওয়া হয় না, এজন্য সেখানে Sufragette movemont, strike প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষে দ্বন্দ্ব, ধনিকে-শ্রমিকে দ্বন্দ্ব নিত্যই লাগিয়া আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিক অসমতা উপলব্ধি করিয়া ঋষিগণ প্রত্যেকের যে ন্যায্য অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহারই নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ইহার প্রভাবে হিন্দু সমাজে চিরকাল আভ্যন্তরিক শান্তি বিরাজিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধেও তিনি উপনিষদের ঋষিদের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, উপনিষদের ঋষিগণ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাকে ঈশ্বরকৃত কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য করিয়াছেন? বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত,—প্রত্যেক গ্রন্থেই কি বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে সমর্থন করা হয় নাই? হিন্দুর অতীত ইতিহাসে যাহা কিছু গৌরবের বস্তু, সকলের সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত আছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যদি এতই অনিষ্টকর হয়, তাহা হইলে হিন্দু তাহার ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গণিত, শিল্প, ভাস্কর্য—সকল বিষয়ে এত অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল কিরূপে? তাহা হইলে ব্যাস-বাল্মীকি হইতে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকল সাধু মহাপুরুষ ইহার সমর্থন করেন কেন?

রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, মন্দিরে গিয়া মূর্ত্তিপূজা করিলে চিত্তের অবনতি হয়। অতএব কেহ যদি মূর্ত্তিপূজা করিবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ বহুস্থলে বলিয়াছেন যে, সকল হিন্দুকে মন্দিরে গিয়া পূজা করিবার

অধিকার দেওয়া উচিত! তিনি হয় ত বলিবেন, যাহারা মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না কেন? এখন দেখিতে হয়, মূর্ত্তি-পূজায় বিশ্বাস কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? শাস্ত্রে আছে, এইরূপ মূর্ত্তি এই ভাবে পূজা করিলে কল্যাণ হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করে, মূর্ত্তিপূজায় তাহার বিশ্বাস হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না, *তাহার মূর্ত্তিপূজায় প্রকৃত বিশ্বাস হইতে পারে না। যে-শাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজার* ব্যবস্থা আছে, তাহাতেই বলা হইয়াছে—বিশেষ পাপ করিলে বিশেষ কোনও জাতিতে জন্ম হয়, সে জন্মে দেহ অপবিত্র থাকে, এজন্য মন্দির-প্রবেশ নিষেধ। তাহার সাধনার উপায়,—নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং সাধু কর্ম্ম। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করে, সে এই নিষেধ মানিয়া চলিবে। যে বিশ্বাস করে না, হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা করিবার অধিকার তাহার নাই, যেমন মুসলমান ও খৃষ্টানের অধিকার নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম্ম মানেন না, পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফল কিছুই স্বীকার করেন না, এ অবস্থায় হিন্দুর পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার মতের কোনও মূল্য নাই। তাঁহার এই প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে কতকগুলি হিন্দু নিজ ধর্ম্মে আস্থা হারাইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের মঙ্গলসাধন করা হইতেছে অথবা অনিষ্টসাধন করা হইতেছে, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

ইহা সুবিদিত যে, বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন যে, সংসার দুঃখময়, চিত্ত হইতে সকল প্রকার কামনা বিসর্জ্জন করিতে পারিলে এই সংসার-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ইহা বৈরাগ্যের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যের বিরোধী—"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে নহে আমার।" এ জন্য রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য-বাণী সম্বন্ধে নীরব। কেবলমাত্র নীরব নহেন—তিনি প্রকারান্তরে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব বৈরাগ্যের কথা বলেন নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বুদ্ধদেব সেই মুক্তির

কথা বলিয়াছেন, যাহা রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জনে নয়, সর্ব্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।" কথাটি বড়ই অদ্ভুত। রাগ বা আসক্তি বর্জ্জন করা না হয় অন্যায় হইল, কিন্তু দ্বেষ বর্জ্জন করাও কি অন্যায়? দ্বেষ বর্জ্জন না করিলে "সর্ব্বজীবের প্রতি মৈত্রীসাধনা" হয় কিরূপে? সকলেই জানেন যে, বুদ্ধদেব কামনা ত্যাগ কয়িতে বলিয়াছেন। কামনা হইতেই রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয়। যে বস্তুর জন্য কামনা থাকে, তাহার প্রতি রাগ বা আসক্তি হয়, তাহার বিপরীত বস্তুর প্রতি দ্বেষ হয়। সুতরাং কামনা ত্যাগ করিলে রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া বলিলেন যে, বুদ্ধদেব রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করিতে বলেন না? আষাঢ়ের 'প্রবাসীতেই' "তথাগতের সাধনার একটি দিক" নামক প্রবন্ধে শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অংশ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"সমস্ত সংসারকে বন্ধনাগার সদৃশ মনে করিয়া—সমস্ত সংসার ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া এবং ত্যাগকামী হইয়া নিষ্ক্রমণপ্রয়াসী হইতে হইবে।" বুদ্ধধর্ম্মের প্রসিদ্ধ দশপারমিতার মধ্যে "নিষ্ক্রমণ" নামক পারমিতার ইহাই তাৎপর্য্য। সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ না করিলে সংসার ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হওয়া যায় না। কিন্তু সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধী। সুন্দর জগৎকে ভোগ করিতে হইবে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের মত। এ জন্য রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশের কোনও উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করিতে বলেন নাই। কিন্তু ইহা কি সত্য? রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "আজকাল মানুষের মধ্যে সত্যের বিকাশ বড় অল্প।".

রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা

(মাসিক বসুমতী পৌষ ১৩৪২)

রবীন্দ্রনাথের "পরিশেষে" নামক কবিতা-গ্রন্থে ধর্ম্মমোহ নামে একটি কবিতা আছে। তাহার প্রথম দুইটি লাইন এইরূপ :—

"ধর্ম্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মরে আর শুধু মরে।"

পৃথিবীতে অনেকগুলি ধর্ম্ম আছে। সাধারণতঃ সকলেই নিজের ধর্ম্মকেই সত্য মনে করে, অন্য ধর্ম্মকে মিথ্যা মনে করে। খৃষ্টান মনে করেন, যীশুখৃষ্টের শরণ না লইলে কখনই মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্ম্মই সত্য, অন্য ধর্ম্ম সত্য নহে। মুসলমান মনে করেন, হিন্দুর প্রতিমা পূজা অনিষ্টকর। অর্থাৎ হিন্দু যখন প্রতিমা-পূজা করে, তখন মুসলমান মনে করেন "ধর্ম্মের বেশে মোহ" আসিয়া হিন্দুকে ধরিয়াছে, অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধ, সুতরাং সে নিশ্চয়ই মরিবে। আমরা দেখিতেছি যে, উদ্ধৃত দুইটি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার খৃষ্টান অথবা মুসলমানের মনোভাব অপেক্ষা উদারতর নহে। এরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ততা পরিত্যাগ করা উচিত। যেখানে আমাদের মনে হইবে যে, অপরের ধর্ম্মাচরণ ভুল হইতেছে, সেখানে আমাদের বলা উচিত নহে, "ঐ ব্যক্তি অন্ধ, ও নিশ্চয় মরিবে, নিশ্চয় মরিবে।" অপরের ধর্ম্মাচরণের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবেই আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত।

হিন্দুর মধ্যে কেহই সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি নাই, তাহা বলা যায় না। এমন হিন্দু আছেন, যিনি মনে করেন, মুসলমান বা খৃষ্টান হাজার ধার্ম্মিক হউন, মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল হিন্দু তাহাদের ধর্ম্মের তত্ত্ব

কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় হইতে এরূপ সঙ্কীর্ণতা নিশ্চয়ই অপসারিত হয়। কারণ, গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

"যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবেই ভজনা করুক, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিব। সকল মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করিতেছে।"

পুনশ্চ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

"যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতা ভজনা করে, তাহারা আমাকেই পূজা করে, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক করে না।"

কি সুন্দর উদার মত! অপর সকল ধর্ম্মমত অপেক্ষা কত উচ্চ স্তরের কথা। খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে পাঠ করা যায়, মোলোক (Moloch) বীলজীবাব (Beelzebub) প্রভৃতি দেবতার যাহারা উপাসনা করে, ঈশ্বর তাহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং তাহাদিগকে অনন্ত নরকে পাঠাইয়া দেন। অজ্ঞ কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত পুত্রের উপর পরমপিতার এই ক্রোধ কি অস্বাভাবিক! এখানে পরমপিতাকে কিরূপ হিংস্র ও প্রতিশোধপরায়ণভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে! ইহার সহিত তুলনায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি মহান্,—এই উক্তির মধ্যে কি প্রগাঢ় জ্ঞান, কি আন্তরিক করুণা পরিস্ফুট!

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই দুইটি লাইন পড়িয়া খৃষ্টান-মুসলমান-ব্রাহ্ম-হিন্দু খুসী হইতে পারেন, কারণ তাঁহাদের মনোভাব এখানে সুন্দররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ হিন্দু ইহা পড়িয়া প্রীত

হইবেন না। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু তাহাকে "মর, মর" বলিয়া কখনও অভিসম্পাত দিতে পারে না। সকল পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যাইবে। কোনও পথে শীঘ্র, কোনও পথে দেরীতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। যত মত, তত পথ।

"ঋজু-কুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যঃ
ত্বম্ অসি পয়সাম্ অর্ণব ইব।"

"মানব সকল কেহ সরল পথ অবলম্বন করিয়াছে, কেহ বক্র পথ। কিন্তু সকল মানবের গন্তব্যস্থান তুমিই। যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান—সমুদ্র।"

যে সঙ্কীর্ণ মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইতেই পৃথিবীতে অনেক অশান্তি—অনেক রক্তপাত হইয়াছে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ কি বলেন, শুনুন।

"নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্ম্মিক তার করে না আড়ম্বর"

নাস্তিক বিধাতার বর পায়,—নূতন কথা সন্দেহ নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে যে অস্বীকার করে, তাহা অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি নিন্দনীয়? পিতার প্রতি যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য পালন করে না, সে অতি নিন্দনীয়। কিন্তু পরমপিতার প্রতি যে ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য পালন করে না, সে আরও অধিক নিন্দনীয়। নাস্তিকগণ বলে, ঈশ্বরকে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এ জন্য তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। অথচ তাহারা প্রত্যক্ষ না করিয়াও অনেক কথাই বিশ্বাস করে। ইংলণ্ডে অমুক রাজা আছেন, পূর্ব্বে আমাদের দেশে অমুক রাজা ছিলেন,—এ সকল কথা প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাহারা দৃঢ়বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ নহে। পৃথিবীতে বহু সাধু মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—

ঈশ্বর আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহাদের সাক্ষ্য অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সাধনা প্রয়োজন, আপনি সে সাধনা করিলেন না, অথচ বলিতেছেন, ঈশ্বরকে দেখা যায় না, অতএব আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। রক্তের মধ্যে কত জীবাণু আছে, শুধু চোখে তাহাদিগকে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ সাহায্যে তাহাদিগকে দেখা যায়। আপনি অণুবীক্ষণও ব্যবহার করিবেন না, যাঁহারা সেই অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতেছেন, তাঁহাদের কথাও বিশ্বাস করিবেন না, কি করিয়া বলি যে আপনার সুবুদ্ধি আছে, আপনি বিধাতার বর পাইবার উপযুক্ত ?

পৃথিবীতে যে সকল প্রধান ধর্ম্ম আছে, কতকগুলি বিষয়ে সকল ধর্ম্মের মত এক। এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন, তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পাপীকে দণ্ড দেন, পুণ্যবান্‌কে পুরস্কৃত করেন, এই সকল কথা সকল ধর্ম্মই স্বীকার করে। তাহার সহিত আর একটি কথাও সকল ধর্ম্মেই স্বীকার করে,—নাস্তিকতার ন্যায় কৃতঘ্নতা, নাস্তিকতার ন্যায় পাপ আর নাই। হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম—সকল ধর্ম্মই এই কথা বলে। ব্রাহ্মধর্ম্মেও এ কথা অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; এবং উপনিষদ বলিয়াছেন, "অসন্ এব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্ম ইতি বেদ চেৎ"—যে ব্যক্তি বলে ব্রহ্ম নাই, সে নিজেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং উপনিষদের মত যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের "সে জন মরে আর শুধু মরে" এই উক্তি যদি কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে নাস্তিক সম্বন্ধেই উহা প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অভিসম্পাত সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর প্রতি প্রয়োগ করিয়া, নাস্তিকের অহঙ্কারদৃপ্ত শিরের উপর বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। কেহ যেন না মনে করেন যে, নাস্তিকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের

এই প্রীতি অহেতুকী প্রীতি। নাস্তিক বিধাতার বর কেন পায়, রবীন্দ্রনাথ তাহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কারণ, নাস্তিক ধার্ম্মিকতার আড়ম্বর করে না। ইহা যদি বিধাতার বর পাইবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে লম্পট ব্রহ্মচর্য্যের আড়ম্বর করে না বলিয়া বিধাতার বর পাইতে পারে, চোর সাধুতার আড়ম্বর করে না বলিয়া এবং মাতাল মাদকতানিবারিণী সভায় যোগদান করে না বলিয়া বিধাতার বর পাইতে পারে। নাস্তিকের আর একটি গুণ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, "শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো"। নাস্তিক ব্যক্তির শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না,—যে ব্যক্তি সকল মহাপুরুষের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করে, তাহার শ্রদ্ধা কোথায় ? নাস্তিকের তৃতীয় গুণ, সে "শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।" যে শাস্ত্রের উপর আঘাত করিতে রবীন্দ্রনাথ এত ভালবাসেন, তাহার মধ্যে বেদ উপনিষদই অগ্রগণ্য. ইহা কি রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হইয়াছেন ? স্মৃতিপুরাণও বেদের অনুগামী বলিয়াই শাস্ত্র। শাস্ত্রের উপর আঘাত করিলে কেবল হিন্দুধর্ম্মের উপরই আঘাত করা হয় না, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপরও আঘাত করা হয়। কারণ, ব্রাহ্মগণ বলিয়া থাকেন যে, উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই তাঁহারা অনুসরণ করেন। সুতরাং বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সেই শাখাচ্ছেদন যেরূপ বুদ্ধির পরিচায়ক, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শাস্ত্রবিশ্বাস নষ্ট করাও সেইরূপ বুদ্ধির পরিচায়ক। ইহলোক ও পরলোকে জীবের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং অথবা সাধু পুরুষদের মধ্যে অনুপ্রেরণা দিয়া এই সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথকেই মঙ্গলজনক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। শাস্ত্রপথ ধরিয়াই হিন্দু পৃথিবীর অপর সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতি দুই চারি জন ব্যতীত সকল সাধু মহাপুরুষই শাস্ত্রবাক্য সত্য ও মঙ্গলজনক

বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রের ঘোরতর বিরোধী।

যদি ইহলোক ব্যতীত পরলোক না থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্র না মানিয়া "মানুষের ভালো" করিবার ব্যবস্থা হয় ত করা যাইত। দরিদ্র-দিগকে অন্ন-বস্ত্র দিয়া, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া, কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা যায়; কিন্তু ইহা ত ভুলিলে চলিবে না যে, ইহলোকের পর পরলোক আছে, স্বর্গ-নরক আছে, পুনর্জ্জন্ম আছে। সেই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া মানুষের ভাল করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শাস্ত্র না মানিয়া তাহার ব্যবস্থা কিরূপে করা যায়, রবীন্দ্রনাথ কি তাহা বলিয়া দিবেন? শাস্ত্র না মানিয়া মানুষের ভাল করিবার চেষ্টাও যাহা, চিকিৎসকের উপদেশ অবহেলা করিয়া রোগী সারাইবার চেষ্টাও তাহা, গুরুকে না মানিয়া বিদ্যালাভ করিবার চেষ্টাও তাহা, স্বামীকে না মানিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করিবার চেষ্টাও তাহা।

আস্তিক অপেক্ষা নাস্তিকগণই বেশী পরোপকার করে, ইহা রবীন্দ্রনাথ সংখ্যাগণনার দ্বারা নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়াছেন ত? কোনও কোনও নাস্তিক পরোপকারী হইতে পারেন; কিন্তু বেশীর ভাগ নাস্তিকই কি পরোপকারী? এবং বেশীর ভাগ ঈশ্বরবিশ্বাসী কি পরোপকার বিষয়ে উদাসীন? আমরা ত দেখি, মন্দিরের ধারেই ভিখারীর সংখ্যা বেশী, পর্ব্ব উপলক্ষে গঙ্গাতীরেই তাহাদের সমাগম অধিক হয়। যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহারা পরোপকার করা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াই মনে করে, পরোপকারের আড়ম্বর তাহারা বেশী করে না। নাস্তিকগণ পরোপকার করে, এবং যাহারা মন্দিরে ঈশ্বরের পূজা করে, তাহারা পরোপকার করে না, ইহা বলিলে মন্দিরগামীদের বিরুদ্ধে পাঠকের মন উত্তেজিত করা সহজ হয়, এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। ইহা কিন্তু সত্য নহে।

নাস্তিকদের অগ্রগণ্য চার্ব্বাকের উক্তি "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবে। তাহাদের আর এক উক্তি "হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়"। এই সবই নাস্তিকের শাস্ত্রবাক্য।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার মধ্যে মাত্র দুইটি লাইন আছে—যাহা ভুল নহে। "বিধর্ম্ম বলি মারে পরধর্ম্মেরে
নিজ ধর্ম্মের অপমান করি ফেরে।"

খুব সত্য কথা। যে ব্যক্তি অপরের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করে না, তাহাকে বিধর্ম্ম বলিয়া আঘাত করে, সে নিজের ধর্ম্মেরই অপমান করে। গজনির মামুদ ও ঔরঙ্গজেব্ বাদশাহ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! হিন্দুর ধর্ম্মকে কাফেরের ধর্ম্ম বলিয়া তাহারা মহা উৎসাহে হিন্দুর মন্দির এবং দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়া "নিজ ধর্ম্মেরই অপমান" করিয়াছে। তাহাদের এই আচরণ উদার মুসলমান ধর্ম্মের ঘোরতর কলঙ্কের বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই কি পরধর্ম্মকে শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতে পারিয়াছেন? হিন্দুর প্রতিমা-পূজা, দেবী-পূজায় ছাগবলি, এ সকল তিনি বিশ্বাস করেন না, এ সকল তাঁহার পক্ষে পরধর্ম্ম। এই পরধর্ম্মকে রবীন্দ্রনাথ বিধর্ম্ম বলিয়া কি আক্রমণ করেন নাই? হিন্দু ঈশ্বরের শুভ শক্তিকে দুর্গা ও কালী বলিয়া পূজা করে, রবীন্দ্রনাথ কি তাঁহাকে "খামখেয়ালী শক্তি" "অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তি" বলেন নাই? তিনি কি বলেন নাই যে, "চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্য-মিথ্যার সে ভেদ করে না?" হিন্দু কালীমন্দিরে পশুবলি দেয় বলিয়া এই কবিতাতেই তিনি কালীপূজা করাকে "শয়তান ভজা" বলিয়াছেন, "বর্ব্বরতার বিকার বিড়ম্বনা" বলিয়াছেন এবং মহাকাল আসিয়া সম্মার্জ্জনী লইয়া এই কালীপূজারূপ আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিবে, এরূপ শুভ ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছেন। কবির ভাণ্ডার হইতে চোখা

চোখা বাক্যবাণগুলি রবীন্দ্রনাথ শক্তিপূজার উপর বর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন,—

বিধর্ম্ম বলি মারে পরধর্ম্মেরে
নিজ ধর্ম্মের অপমান করি ফেরে

তাঁহার এই উক্তি তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে যেরূপ উত্তমরূপে প্রয়োগ করা যায়, আধুনিক আর কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তত উত্তমরূপে প্রয়োগ করা যায় না।

শক্তিপূজায় পশু-বলির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের মাংস ভক্ষণ করিবার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল, তাহারা অবাধে যাহাতে পশু বধ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে বলা হইয়াছে—"দেবতার নিকট পশু বলি দিয়া তোমরা সেই মাংস ভোজন করিতে পার, নচেৎ কিছুতেই পার না।" আমি নিজের রসনা-তৃপ্তির জন্য পশু হত্যা করিতেছি, ইহা মনে করিলে মানবের প্রকৃতি যেরূপ নিষ্ঠুর হইয়া উঠে, দেবতার তৃপ্তির জন্য বলি দিতেছি, এই চিন্তায় তত নিষ্ঠুর হয় না। যে ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান হইয়াছে, সে জানে যে, পশু-মাংস ভোজন করিয়া জগদীশ্বরীর প্রীতি হইতে পারে না,—তিনি নিত্য তৃপ্ত, নিজের আনন্দেই পরিপূর্ণ, কোনও বাহ্য বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহাকে আনন্দলাভ করিতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি রসনা-তৃপ্তির জন্য জীব-হত্যা করিতে বা অপরের দ্বারা করাইতে কুণ্ঠিত হয় না, সে নিম্ন অধিকারী, সে এই উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী নহে। দেবতা পশুমাংস ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবেন, এইরূপে নিম্ন স্তরের জ্ঞানেরই সে অধিকারী, এই জ্ঞানের দ্বারা তাহার জীবহিংসা-প্রবৃত্তি কতক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়, তাহার নিষ্ঠুরতা তত বেশী বৃদ্ধি পায় না। আধুনিক সভ্য মানব বিবিধ মাংস ভোজন করিবার সময় ইহা স্মরণ করে না যে, সে মাংস ভোজন করে বলিয়াই কসাইখানায় নিত্য কি

বীভৎস লীলার অনুষ্ঠান হইতেছে। চক্ষুর সম্মুখে পশু-হত্যা দেখিলে মানব বুঝিতে পারে, মাংস ভোজন করা কতদূর নিষ্ঠুরতা। উদরপূরণের জন্য জীব হত্যা করা পাপ—এই উপদেশ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে বেদেই প্রচার করা হইয়াছিল, এবং এই উপদেশের ফলে হিন্দুগণ মাংস-ভোজনের জন্য অপর সকল জাতি অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে জীব হত্যা করে। যাঁহারা নিজে মাংস ভোজন করেন না, এরূপ অনেক আদর্শচরিত্র আচার্য্য হিন্দুধর্ম্মে পশুবলির এই সকল তাৎপর্য্য বহুবার প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি জাগিয়া ঘুমাইবেন, শুনিয়াও শুনিবেন না, তাঁহাকে শোনান অতিশয় কঠিন। তাই রবীন্দ্রনাথ বহুবার পশুবলি উপলক্ষ করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে অসংযত ভাষায় আক্রমণ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। দেবতার নিকট পশুবলি দিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা যদি ভুল হয়, রবীন্দ্রনাথের দেখাইয়া দেওয়া উচিত—ইহার কোথায় ভুল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তত্ত্ব-নির্ণয় করা নয়,—যেন তেন প্রকারেণ হিন্দুধর্ম্মকে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার যেন ব্রত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ দেবতার নিকট পশু-বলির অত্যন্ত নিন্দা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মগণ বেশী পরিমাণে মাংস ভোজন করেন,—না, হিন্দুগণ? রবীন্দ্রনাথ যখন এই পশু-বলির নিন্দা করেন, তখন মনে হয়, মূক প্রাণীর জন্য রবীন্দ্রনাথের কি করুণা! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে এই পশু-বলির নিন্দা কারুণ্যপ্রসূত নহে, অসূয়া-প্রসূত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যই মূক পশুদের দুঃখে এতই কাতর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শান্তিনিকেতনে মাংসভোজন নিষেধ করিতেন।

যে সকল ব্যক্তি মাংসাশী, তাঁহাদের মাংসভোজনপ্রবৃত্তি কমাইবার জন্য তাঁহাদের নিষ্ঠুরতার উপশমের জন্য, হিন্দুর এইরূপ পূজায় প্রাণী বলি দিবার

ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথেরই পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক— বেদ এবং উপনিষদের ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর ন্যায় অল্পমাংসাশী এবং মূক প্রাণীর প্রতি করুণহৃদয় জাতি পৃথিবীতে আর নাই। বৈদিক যজ্ঞের পশুবলিই কালীপূজার পশুবলিতে রূপান্তরীত হইয়াছে। সুতরাং কালী-পূজার পশু বলির মূল অনুসন্ধান করিলে বৈদিক ঋষির ব্যবস্থাতেই উপনীত হইতে হয় এবং কালীপূজায় পশুবলির নিন্দা করিলে বৈদিক ঋষিদের ব্যবস্থারই নিন্দা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এই সকল বৈদিক ঋষির অসংযত ভাষায় নিন্দা করিয়া কি সুরুচিরই পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যেন ভুলিয়া না যান যে, সমস্ত পৃথিবীই জগন্মাতার মন্দির। কসাইখানাতে প্রাণিহত্যা করিলে জগন্মাতার চক্ষুর বাহিরে করা হয় না, যে মূঢ় মনে করে যে, পশুমাংস নিবেদন করিয়া জগন্মাতাকে তৃপ্ত করা হইবে, তাহার অজ্ঞতা জগন্মাতা করুণার চোখেই নিরীক্ষণ করেন, হয় ত মার্জ্জনাও করিতে পারেন। কিন্তু যিনি কেবল নিজতৃপ্তির জন্য মাংস ভোজন করিবার সময় রসনা সংযত করিতে পারেন না, এবং বিশ্বাসী সন্তানের ধর্ম্মসাধনার নিন্দা করিবার সময়ও রসনা সংযত করিতে পারেন না তাঁহার অপরাধ কি দ্বিগুণ নহে?

হিন্দু যদি "পূজাগৃহে রক্তমাখান ধ্বজা" তুলে, তাহার উদ্দেশ্য নিজের দোষ ত্রুটী ঊর্দ্ধে তুলিয়া সকলকে দেখান, দোষ করিয়া ধার্ম্মিক সাজিতে চাহে না। সে "ধার্ম্মিকতারও আড়ম্বর করে না," জীবের প্রতি করুণা দেখাইবারও আড়ম্বর করে না। হিন্দু "শয়তান ভজিতে" জানে না.— হিন্দুর দেব ও অসুরগণের মধ্যে শয়তানের স্থান নাই, পাশ্চাত্য দেশ হইতে রবীন্দ্রনাথ শয়তানকে আমদানী করিয়া ভারতের পুণ্য তপোবনে ছাড়িয়া দিয়াছেন, পরধর্ম্মের নিন্দারূপ শয়তান ভজিবার পদ্ধতিও তিনিই দেখাইয়া দিয়াছেন। আপনার পশুবলি দিতে ভাল লাগে না, আপনি দিবেন না,

তাই লইয়া জগতের কাছে পূর্ব্বপুরুষদিগকে বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা "শয়তান ভজা" ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

"প্রলয়ের শৃঙ্গধ্বনির" নাম করিয়া রবীন্দ্রনাথ হিন্দুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হিন্দু জানে যে, তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকিবে, রবীন্দ্রনাথ মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তাহার দোষ আবিষ্কার করিয়া যতই শিঙ্গা ফুঁকিতে থাকুন, সনাতন ধর্ম্ম তাহা অবজ্ঞা করিতে সমর্থ।

"যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটি রূপে গাড়া
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া।"

যে মুক্তি দিবে, তাহাকে খুঁটিরূপে যদি গাড়িতে পারা যাইত, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আর কি সুবিধার ব্যবস্থা হইত? তাঁহাকে আমরা ধরিতে পাই না বলিয়াই সংসারচক্রে ভ্রমণেরও অন্ত নাই, তাঁহাকে যদি খুঁটির ন্যায় ধরিতে পারি, তাহা হইলে অবিদ্যার সাধ্য কি আমাদিগকে কলুর চোখ ঢাকা বলদের ন্যায় ঘুরাইবে? যে "মিলাবে তাকে ভেদের খাঁড়া" রবীন্দ্রনাথই করিয়াছেন। কারণ, ধর্ম্মের নামে রবীন্দ্রনাথ পরধর্ম্ম আক্রমণ করিতেছেন।

"যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তাঁরি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে॥"

ইহা মিথ্যা কথা। ধরা যাহাতে বিষের স্রোতে না ভাসিয়া যায়, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশের ন্যায়, য়ুরোপ আমেরিকার ন্যায় ভারতভূমি যাহাতে অবাধ জীব-হত্যার স্রোতে ভাসিয়া না যায়, তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা সার্থকও হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথ তাহা যতই অস্বীকার করুন। হিন্দু "তরী ফুটা ক'রে পার" হইবার চেষ্টা করে না। যিনি পরধর্ম্মের সাধনাকে অসংযত ভাষায় নিন্দা করেন, তাঁহার নিজেরই আধ্যাত্মিক

সাধনারূপ তরী ফুটা হইয়া যায়, এবং ভরা ডুবি হইবার সম্ভাবনা তাঁহারই বেশী। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"হে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মবিকার নাশি
ধর্ম্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।"

হঠাৎ আবার স্বর উলটিয়া গেল কেন? যাহারা "মরে আর শুধু মরে" বলিয়া অভিসম্পাত দিয়াছেন, যাহাদের জন্য মহাকালের সম্মার্জ্জনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাদিগকে শয়তান-ভজা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য এত অশোভন আগ্রহ দেখাইয়াছেন, হঠাৎ তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য এত আকঞ্চন কেন? ধর্ম্ম-বিকার কার? ধর্ম্মমূঢ় ব্যক্তি কে? যে পরধর্ম্মের অপর্য্যাপ্ত নিন্দা করে, সে নয় কি?

"যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে
ধর্ম্মকায়ার প্রাচীরে বজ্র হানো"

ইহা রবীন্দ্রনাথের বাণী,—না, গজনির মামুদের বাণী? আপনার পছন্দ না হয়, আপনি সে বেদীতে পূজা করিতে যাইবেন না। কুক্কুটমাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়া আপনি শান্তিনিকেতনের বেদীতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে জীবের প্রতি করুণা প্রচার করুন,—হিন্দু আপনার বেদী ভাঙ্গিতে চাহে না। কুসংস্কার-পূর্ণ হিন্দুকেও তাহার বেদীতে বসিয়া পূজা করিতে দিন।

"এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো"

বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রচার করিয়া জ্ঞানের আলোক এ দেশে আনা হয় নাই, দেখুন রবীন্দ্রনাথ যদি পরধর্ম্মবিদ্বেষ প্রচার করিয়া, পরের পূজার বেদী ভাঙ্গিয়া জ্ঞানের আলোক আনিতে পারেন।

নারীর কর্ত্তব্য

(ভারতবর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১২৪০)

১৩৩৯ চৈত্রের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুইটি চিন্তার ধারার উল্লেখ করিয়াছেন,—একটি গতিশীল, আর একটি রক্ষণশীল। তিনি বলিয়াছেন, "মোটর চালাতে গেলে এঞ্জিনেরও দরকার, ব্রেকেরও দরকার। * * * কিন্তু ব্রেক যদি বলে রসে এঞ্জিনটাকে খুলে রাখো, আমি একাই গাড়ী চালাবো, তা হোলে বেশ একটু হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।"

সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তিকে তিনি গতিশীল চিন্তাধারা বলিয়াছেন, এবং ইহাকে মোটরের এঞ্জিনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পরিবর্ত্তনে বাধা দিবার প্রবৃত্তিকে তিনি রক্ষণশীল চিন্তাধারা বলিয়াছেন এবং মোটরের ব্রেকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার তুলনাগুলি সুসঙ্গত হয় নাই। সমাজকে মোটরের সহিত তুলনা করিলে, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে মোটরের বিবিধ কলকব্জার নিয়মের সহিত তুলনা করা উচিত। সমাজে যেমন বিধি-নিষেধ আছে মোটরের কলকব্জা সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম আছে,—অমুক সময় অমুক কলটি টিপিবে, অমুক কল টিপিবে না। মোটরের কলের নিয়মগুলি পালন করিলে গাড়ী ঠিক মত চলিবে। সেইরূপ সামাজিক বিধি ব্যবস্থাগুলি পালন করিলে সমাজ ঠিকমত চলিবে। মোটরের কলের নিয়মগুলি না মানিলে বিপদ হইবে—মোটর ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সেইরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি না মানিলে, সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইবে—এমন কি, সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

মোটরের কলকব্জার নিয়মগুলি না বদলাইলে মোটর চলিবে না, ইহা বলা যতদূর যুক্তিযুক্ত,—সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিলে সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না. ইহা বলাও তুল্যরূপে যুক্তিযুক্ত। গুরুজনদিগকে ভক্তি করিবে, অতিথির সেবা করিবে, দরিদ্রকে দান করিবে,—এ সবই সামাজিক ব্যবস্থা। সমাজের উন্নতির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা সকল পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব সুধাংশু বাবু যে বলিয়াছেন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া সমাজের উন্নতির চেষ্টা কেবলমাত্র ব্রেকের সাহায্যে গাড়ী চালাইবার চেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ, তাঁহার এই উক্তি যথার্থ নহে।

সুধাংশুবাবুর প্রবন্ধটি একজন সমাজ-সংস্কারক এবং একজন সনাতন-মতাবলম্বী উভয়ের কথোপকথন ছলে লিখিত হইয়াছে। সমাজ সংস্কারকের তিনি নাম দিয়াছেন "১৯৩৩ সাল" এবং সনাতনমতাবলম্বীর তিনি নাম দিয়াছেন "১৮৭৬ সাল"। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে সনাতন-মতাবলম্বীর পক্ষের সকল কথা বলা হয় নাই। সনাতন-মতাবলম্বীর পক্ষের যে কথা-গুলি তাঁহার প্রবন্ধে বাকী রহিয়া গিয়াছে সেগুলির উল্লেখ করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। সুধাংশুবাবুর ব্যবহৃত "১৮৭৬ সাল" এবং "১৯৩৩ সাল" নাম দুইটি আমরাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহার করিব।

সুধাংশুবাবুর প্রবন্ধে ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনের লিখিত প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কালীচরণ বাবু বলিয়াছিলেন যে পূর্ব্বে রীতিমত সংকল্প করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বাগ্‌দান করা হইত ; এইরূপ বাগ্‌দানের পর বরের মৃত্যু হইলে বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনরায় বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল,—বশিষ্ঠ স্মৃতি হইতে শ্লোক তুলিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছেন। "১৯৩৩ সাল" এই

ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "উকুনে বুড়ী পুড়ে মল, বক সাত দিন উপোষ রইল।" "১৯৩৩ সালের" মতে উকুনে বুড়ীর সঙ্গে বকের যে সম্পর্ক, যে পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহার সহিত কন্যারও সেই সম্পর্ক ; অর্থাৎ অঙ্গীকারের কোনও মূল্য নাই। "১৯৩৩ সালের" এই সিদ্ধান্ত সুধীগণ নিশ্চয়ই অনুমোদন করিবেন না। যে পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করা হয়, কন্যা সম্ভবত মনে মনে তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে মানসিক অপরাধ হইবার সম্ভাবনা আছে। সাবিত্রী মনে মনে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই পিতার আদেশে অন্য পাত্র মনোনয়ন করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। "১৯৩৩ সালের" মতে বিবাহের পূর্ব্বে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর সম্বন্ধ উকুনে বুড়ীর সহিত বকের সম্বন্ধের অনুরূপ। কিন্তু শাস্ত্রকারদের ধারণা অন্যরূপ ছিল। এজন্য বাগ্‌দত্তা কন্যার দ্বিতীয় পাত্রে সমর্পণ করা সম্বন্ধে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে এই বিধি পাওয়া যাইতেছে।

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়তেঽথ বরোযদি।

*　　*　　*　　*

অন্যস্মৈ বিধিবদ্‌দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥

"উদক এবং বাক্যের দ্বারা কন্যাদান করিবার পর যদি বর মারা যায়, তাহা হইলে সে কন্যা অন্য পাত্রে সমর্পণ করা যায়।"

সুতরাং পরাশর সংহিতাতে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবার সম্ভাবনাকে "১৯৩৩ সাল" যে উপহাস করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অশোভন হইয়াছে। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি পরাশরের বাক্য যে বিধবা-বিবাহের সমর্থক হইতে পারে না, তাহার আরও কতকগুলি কারণ আছে। পরাশরই

অন্যত্র বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। মনু স্পষ্টতঃ বিধবাবিবাহের নিষেধ করিয়াছেন, সকল স্মৃতিকারই মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। মনু অত্রি প্রভৃতি বিংশতি সংহিতা গ্রন্থের কোথাও বিধবাবিবাহের বিধান নাই। অধিকাংশ স্মৃতিতে নিন্দা বা নিষেধ আছে। প্রাচীন বা আধুনিক ভারতে উচ্চ জাতির আর্য্যগণের মধ্যে বিধবাবিবাহের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। অতএব পরাশর যে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা দিবেন, ইহা সম্ভব নহে। পরাশরের যে বাক্যের অর্থ সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহার কোন্ অর্থ গ্রহণ করা উচিত ইহা অবধারণ করিতে হইলে পরাশরের অন্য বাক্যের সহিত, অন্য স্মৃতি-গ্রন্থের সহিত, এবং ভারতে সুবিদিত সদাচারের সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক সেই সন্দিগ্ধ বাক্যের যে ব্যাখ্যা করা যায় সেই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিধবাবিবাহ ভারতবর্ষে অপ্রচলিত নহে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য "১৯৩৩ সাল" বলিয়াছেন ভারতে ছোট জাতির মধ্যে এই প্রথা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, "ছোট জাতগুলাকে বাদ দিলে হিন্দু যারা বাকী থাকে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।" ১৯৩৩ সালের উচিত ছিল যে সকল ছোট জাতের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা। তাহা হইলে তিনি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে সাধারণের মধ্যে যে বিশ্বাস বর্ত্তমান আছে যে অধিকাংশ হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই এই বিশ্বাস ভুল। কিন্তু তিনি ইহা করেন নাই। অধিকন্তু যে প্রথা কেবলমাত্র ছোট জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু উচ্চ জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই, সে প্রথা শাস্ত্রসম্মত এবং সদাচারানুমোদিত প্রথা বলিয়া কখনও গৃহীত হইতে পারে না। মদ্য পান, গোমাংস বরাহ-মাংস ও মৃত পশুর মাংস ভোজন নীচ জাতির মধ্যে প্রচলিত। এ সকল প্রথাকেও ১৯৩৩ সালের মতে সদাচার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না কি?

প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থাই কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সুখদায়ক, কোনও ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক। অনেক সময় ইহলোকে সুখ ভোগ করিবার ফলে, পরলোকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এবং ইহলোকে কষ্ট ভোগ করিলে পরলোকে সুখ ভোগ করা যায়। যে কর্ম্ম এক ব্যক্তির পক্ষে অনিষ্টকর নহে সেই কর্ম্মই অপর ব্যক্তির পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে। ঋষিগণ সমাজের সকল শ্রেণীর কল্যাণের জন্য সুগভীর চিন্তাসহকারে যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই সকল ব্যবস্থার অনুসরণ করা উচিত। বিবাহিত জীবন স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুখদায়ক ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। ঋষিগণ যেরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন তাহার ফলে আমাদের সমাজের অধিকাংশ রমণীই বিবাহিত জীবনের সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতে পারে। পাশ্চাত্য সমাজে বিধবাবিবাহ-প্রথা আছে সত্য ; কিন্তু হিন্দু সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য সমাজের অনেক বেশী রমণীকে চিরজীবন অনূঢ়া অবস্থায় কাটাইতে হয়। সমগ্র রমণীজাতির সুখশান্তির কথা বিবেচনা করিয়া পাশ্চাত্য সামাজিক ব্যবস্থাকে সমধিক কল্যাণজনক বলা যায় না। কন্যার জন্য সৎপাত্র সংগ্রহ করা সাধারণতঃ দুরূহ। বিধবাবিবাহের প্রচলন হইলে, যে কয়টি বিধবার পুনরায় বিবাহ হইবে, সমাজে সেই কয়টি কুমারী পতিলাভ করিবেন না। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিলে মোটের উপর সমগ্র রমণীজাতির বেশী সুখের সম্ভাবনা নাই।

যাঁহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে তাঁহাদের কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, যে, বিধবারা পূর্ব্বজন্মে বা ইহজন্মে এমন কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করা প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া পুনরায় বিবাহ করিলে ইহজন্মে হয় ত কোনও বিধবা বেশী সুখ ভোগ করিতে পারেন. কিন্তু পরলোকে অপেক্ষাকৃত অধিক দুঃখ ভোগ করিতে

হইবে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, শাস্ত্রকারের জ্ঞান এবং কল্যাণ-কামনার উপর যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না।

মনু ৯ম অধ্যায় ৪৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে কোনও ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিলেও বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। "১৯৩৩ সাল" এই ব্যবস্থার বড়ই নিন্দা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "ঘটিবাটি বিক্রী করলে তারা অপরের হয়। কিন্তু স্ত্রীর বেলা সেটি হবারও জো নেই। আমরা কখনো কখনো দুঃখু করে বলি স্ত্রী ঘটিবাটির সামিল। ভুল বলি। মনুর মতে স্ত্রী হল ঘটিবাটিরও অধম।"

১৯৩৩ সালের মতে মনুর এরূপ বিধান দেওয়া উচিত ছিল যে কোনও ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন অপর ব্যক্তি ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে ১৯৩৩ সালের অভিপ্রেত ব্যবস্থা অপেক্ষা মনুর ব্যবস্থাই ভাল, ১৯৩৩ সাল মনুকে যতটা নির্ব্বোধ এবং পাষণ্ড মনে করিয়াছেন, বাস্তবিক পক্ষে মনু ততদূর ছিলেন না। সমাজে অনেক সময় দরিদ্র বিবাহিত রমণী বড়লোকের কুদৃষ্টিতে পড়ে। ক্বচিৎ এমন হতভাগ্য দরিদ্রও দেখা যায় যে অর্থলোভে তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত থাকে। যদি এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে স্বামী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বত্ব ত্যাগ করিলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং অপর ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিতে পারে, তাহা হইলে এরূপ স্থলে ধনীর লালসার পথে কোনও বাধা থাকে না, সে উপযুক্ত মূল্য দিয়া দরিদ্র রমণীকে বিবাহ করিয়া আনিতে পারে। তাহা হইলেই স্ত্রীর অবস্থা অনেকটা ঘটিবাটিরই সামিল হইয়া যায়। মনু এইরূপ ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া ১৯৩৩ সালের এত ক্রোধ হইয়াছে যে তিনি মনুকে গালাগালি দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন মনু বেঁচে থাকলে কি করতেন

"সেকথা না শোনাই ভালো"। মনুর ব্যবস্থার অর্থ এই যে কেহ অর্থের বিনিময়ে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, এবং অপর পক্ষে কেহ অর্থ দিয়া অপরের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ স্ত্রী ঘটিবাটির সামিল নহে। ১৯৩৩ সাল এইভাবে কথা বলিয়াছেন যেন মনু স্বামীকে অধিকার দিয়াছেন সে তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার দেন নাই। বলা বাহুল্য ইহা সত্য নহে। মনু স্বামীকে স্ত্রী বিক্রয়ের অধিকার দেন নাই। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বিক্রয় করিবে হিন্দুসমাজে তাহার কিরূপ স্থান হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ১৯৩৩ সাল মনুর ব্যবস্থার যেভাবে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে হিন্দু স্ত্রীর অধোগতি হইবে, উন্নতি হইবে না। এ ক্ষেত্রে ১৯৩৩ সাল ভালকে মন্দ মনে করিতেছেন এবং মন্দকে ভাল মনে করিতেছেন। সামাজিক অনেক বিষয়েই ১৯৩৩ সালের এই প্রকার বিপরীত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

১৯৩৩ সাল বলেন "প্রাক্-যৌবন বিবাহ যদি ভাল হ'ত তাহোলে শাস্ত্রকারগণ আগে পুরুষের জন্য সে বিধান করতেন। হিন্দু বালকের মনে যাতে স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি কখনো কোনো ধারণা ("নারীর প্রতি ধারণা" কি বস্তু ?) না জন্মে এ জন্য অল্প বয়সে তারও বিবাহ দেওয়া উচিত।"

মনু বিধান দিয়াছেন যে গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবার অব্যবহিত পরেই পুরুষ বিবাহ করিবে (মনু ৩।৪)। সুতরাং পুরুষেরও যতদূর সম্ভব শীঘ্রই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গুরুগৃহ হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে কি করিয়া বিবাহ করা সম্ভব? বিদ্যা শিক্ষা কালে যাহাতে "অন্য নারীর প্রতি ধারণা" না জন্মে এ জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করা

হইয়াছে। আর একটা কথাও ১৯৩৩ সালের বিবেচনা করা উচিত ছিল। অল্প বয়সে যদি সকল বালিকার বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে পুরুষের বিলম্বে বিবাহ হইলেও বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমে পড়িবার সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়, কারণ শিশুর সহিত প্রেমে পড়া সম্ভব নহে।

১৯৩৩ সাল বলিয়াছেন, অল্প বয়সে বিবাহ "ভালো নয়, সে বিধান মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী, তাই সে বিধান শুধু নারীর ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। নারীর সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের ধারণা যতদূর সম্ভব হেয় হতে হয়।" এই সকল বাক্যে ১৯৩৩ সালের প্রবল শাস্ত্র-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পুরুষের জীবনের সার্থকতা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রমণীর উপর নির্ভর করে, শাস্ত্রকারগণ যে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের ব্যবহৃত সহধর্ম্মিণী, অর্দ্ধাঙ্গিণী, শক্তিরূপিণী এই সকল শব্দ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং তাঁহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্দ্ধাঙ্গের মনুষ্যত্ব বিকাশ সঙ্কুচিত করিয়া দিবেন ইহা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। বস্তুতঃ যে ব্যবস্থা শাস্ত্রকার-গণ রমণীগণের পক্ষে কল্যাণজনক মনে করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ব্যবস্থাই দিয়াছেন, পাশ্চাত্য মোহ কাটিয়া গেলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হইবে। মনু বলিয়াছেন—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
৩।৫৬

"যেখানে রমণীগণ পূজিত হন সেখানে দেবগণ আনন্দিত হন, যেখানে তাঁহারা পূজিত হন না সেখানে সকল কর্ম নিষ্ফল হয়।" বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ১৯৩৩ সাল এ সকল বাক্যে উপহাস করিয়াছেন।

শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে রমণীর চরিত্র স্খলনের আশঙ্কার উল্লেখ

করা হইয়াছে সত্য। কিন্তু ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে পুরুষেরও চরিত্র স্খলনের আশঙ্কা আছে, "বলবানিন্দ্রিয় গ্রামঃ বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" অর্থাৎ বলবান ইন্দ্রিয় সকল বিদ্বানকেও বিচলিত করিতে পারে। পুরাণে অনেক স্থলে ঋষি মুনিদেরও চরিত্রস্খলনের কথা আছে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই পতনের সম্ভাবনা আছে শাস্ত্রকারগণ ইহাই বারম্বার বলিয়াছেন, এবং যে ভাবে জীবন যাপন করিলে এরূপ পতনের আশঙ্কা কম হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ রাগদ্বেষের অতীত ছিলেন, তাঁহারা পুরুষদের প্রতি পক্ষপাত করেন নাই, নারীর প্রতিও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন প্রজাপতি নিজ দেহ দুই ভাগ করিয়াছেন—এক ভাগ পুরুষ, এক ভাগ নারী হইয়াছে। এই শাস্ত্রকার-গণই সীতা সাবিত্রী শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি জগতে অতুলনীয় নারী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ১৯৩৩ সাল বলিয়াছেন "নারীর সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের ধারণা যতদূর সম্ভব হেয় হতে হয়।" বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে মনুষ্যের বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয় ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। তিনি বিদুষী মহিলা। শাস্ত্রীয় বিধান যদি নারীর মনুষ্যত্ব লাভের পরিপন্থী হইত, নারীর সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের ধারণা যদি যতদূর সম্ভব হেয় হইত, তাহা হইলে তিনি শাস্ত্র-বিধানের সমর্থন করিতেন না। বস্তুতঃ ১৯৩৩ সালের এই সকল উক্তি শাস্ত্র-বিদ্বেষ-প্রসূত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৯৩৩ সাল বলিয়াছেন যে জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রের মত এই যে বৈদিক যুগে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অন্য অনেক বৈদিক পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগে বালিকার অল্প বয়সেও বিবাহ হইত, এবং অল্প

বয়সে বিবাহ দেওয়াই বেদের বিধান, - যথা লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়, পঞ্চানন তর্করত্ন, মহোমহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ। বস্তুতঃ ইংরাজি-শিক্ষিত কোনও কোনও পণ্ডিত বেদের আলোচনা করিয়া প্রচার করিয়াছেন বটে যে বৈদিক যুগে কেবল যুবতী-বিবাহই প্রচলিত ছিল, কিন্তু যাঁহারা আজীবন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন সেইরূপ অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে বৈদিক যুগে বালিকার অল্প বয়সেও বিবাহ হইত। এ ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ মিত্রের সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উপনিষদের "মটচীহতেষু কুরুষু" এই উপাখ্যানে "আটিক্যা সহজায়য়া"র উল্লেখ আছে। "আটিকী" শব্দের অর্থ অনভিব্যক্ত স্ত্রী লক্ষণা"। অতএব বৈদিক যুগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৮৭৬ সাল বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী ডীন ইঞ্জ মনে করেন যে বাল্যবিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক। স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচারিকা গ্রন্থকর্ত্রী Ellen Keyও বলিয়াছেন "It is evident to every thoughtful person that a real sexual morality is almost impossible without early marriage" [Love and Marriage" নামক পুস্তকের ehapter 8 p. 311] "প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট স্বতঃসিদ্ধ বোধ হইবে যে বাল্যবিবাহ ব্যতীত প্রকৃত যৌন পবিত্রতা রক্ষিত হইতে পারে না।" যে সকল সামাজিক দুর্নীতি এবং অশান্তিতে পাশ্চাত্য সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, বাল্যবিবাহের প্রচলন হইলে তাহা যে বহু পরিমাণে নিবারিত হইবে, পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ইহা উপলব্ধি করিবেন আশা করা যায়।

১৯৩৩ সালের ধারণা আমাদের শাস্ত্রবিধানগুলি বহু পরিমাণে আমাদের দৈনিক জীবন নিয়মিত করে বলিয়াই আমাদের উন্নতি হয় নাই এবং পাশ্চাত্য দেশে কোনও শাস্ত্র-বিধান দৈনিক জীবন বহুল পরিমাণে নিয়মিত

করে না বলিয়াই বাহ্য জগতে তাহারা এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। তাঁহার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য সমাজে যদি বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিত, বিধবা বিবাহ, স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে যে তাহারা "বিশাল মহাসাগরকে বেঁধে ফেলতে পারত না, বা আকাশের ছায়াপথ দিয়ে তাদের পুষ্পক-রথ চালাতে পারত না" এরূপ মনে করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ বাহ্য জগতে উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল, তখন সেও শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল,—আকাশে উড়ুক না উড়ুক বিশাল মহাসাগরের উপর জাহাজ চালিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে গিয়া যে ব্যবসা-বাণিজ্য রাজ্য-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হিন্দুর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা সে সকল জাতীয় প্রচেষ্টার অন্তরায় হয় নাই। পাশ্চাত্য জগৎ যে আজকাল এ সকল বিষয়ে উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণ এই যে তাহারা আজকাল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। কোনও বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার প্রচলন বা অপ্রচলন হেতু যে তাহারা পার্থিব উন্নতি করিয়াছে ইহা সত্য নহে। যদি কোনও বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা পার্থিব উন্নতির অনুকূল হয়, তাহা হইলে যে ব্যবস্থায় ব্যর্থ প্রেম, ব্যভিচার, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি অশান্তির কারণ কম হয় সেই ব্যবস্থা পার্থিব উন্নতির সমধিক অনুকূল হয়। এবং এই হিসাবে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা অপেক্ষা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। কারণ পাশ্চাত্য সমাজে ব্যর্থ প্রেম, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি কারণে অনেক মূল্যবান জীবন বৃথা কাটিয়া যায়, পারিবারিক শান্তির অভাবে অনেকের উদ্যম ও সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। বস্তুতঃ ১৯৩৩ সালের যুক্তি এইরূপ :—পাশ্চাত্য জগৎ বিবিধ কল কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে ; পাশ্চাত্য জগতে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা

শিথিল ; অতএব সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা শিথিল হইলে অনেক কল কৌশল আবিষ্কার করা যায়। এ যুক্তি ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

অধিকন্তু ১৯৩৩ সাল বাহ্য ঐশ্বর্য্যের উপর অতিরিক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের মূল্য অধিক এবং যে পরিমাণে বাহ্য ঐশ্বর্য্য ধর্ম-বিরোধী সে পরিমাণে উহা অনিষ্টকর। এই সত্য ১৯৩৩ সাল গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তিনি হিন্দু-জাতির সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পৃথিবীবক্ষে অবস্থানকে "ডাইনোসেরাসের টিকটিকিরূপে টিকিয়া থাকার ন্যায় গৌরবজনক" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। মাত্র চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের অধীনতার যুগেই শ্রীচৈতন্য দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; এই সেদিন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী, কাঠিয়া দাস বাবাজি, স্বামী গম্ভীরনাথ প্রভৃতি ভারতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের জীবন্ত রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল সর্ব্বলোকবিদিত মহাপুরুষ ব্যতীত আরও অনেক মহাপুরুষ নিভৃতে ঈশ্বর-সাধনা এবং জগতের কল্যাণ-কামনা দ্বারা মানব-জীবন সফল করিতেছেন, ইহা সুবিদিত। তাঁহাদের পরিচয় সকলে জানে না ; কারণ, তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠা বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। আধুনিক ভারতের তুলনায় পাশ্চাত্য জগতে কি এত বেশী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? যদি না যায়, তাহা হইলে বাহ্যজগতে সবিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই কি ভারতবর্ষকে টিকটিকি বলিয়া উপহাস করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? ডাইনোসেরাসের টিকটিকিরূপে পরিবর্ত্তন লজ্জাজনক বটে। ভারতবর্ষ যদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধা রাখিয়া, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার পরিবর্ত্তন কম হইবে, সে ডাইনোসেরাস রূপেই থাকিতে পারিবে,—কালের আবর্ত্তনে আবার একদিন রাজনৈতিক ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইবে। আর যদি সে

আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া দাসজনসুলভ মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঋষিদিগকে Old fool বলিয়া স্থির করিয়া পাশ্চাত্য সমাজের অব্যবস্থার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মায়ামরীচিকার ন্যায় দূরে সরিয়া যাইবে, সমাজ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। তখন সত্য-সত্যই হিন্দুজাতি টিকটিকিতে পরিণত হইয়া জগতে অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র হইবে! ১৯৩৩ সালের দল যেন তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সে শোচনীয় দিন আগাইয়া দিতে প্রয়োগ না করেন।

১৯৩৩ সাল বলিয়াছেন, "আমরা উঠ্‌তে চেষ্টা করছি বটে কিন্তু তাতে আমাদের মনু-মান্ধাতার আমলের শাস্ত্র কি কিছু সাহায্য করছে? বরং টেনে নামিয়ে দিচ্ছে। সাহায্য করছে তাদেরই কাছ থেকে ধার করা শিক্ষা।" ইহা সম্পূর্ণ ভুল। স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায় বিলাস-বাসনা, যাহা শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্যের নিকট গ্রহণ করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন। সৌখীন বেশভূষা, বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার, কৃত্রিম জীবনে স্পৃহা, পল্লীভবন ত্যাগ, বায়স্কোপ গৃহে ভীড়, চা-চপ-কাটলেটের জন্য ব্যাকুলতা, এই সকল জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিতেছে এবং জাতীয় উন্নতির প্রতিপন্থী হইয়াছে। এ সকলই পাশ্চাত্য জগৎ হইতে ধার করা। বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, বিবাহের অচ্ছেদ্যতা—এ সকল প্রথা জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল নহে। যদি হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখন এ সকল প্রথা বর্ত্তমান থাকিত না। পরাধীনতার পরও যখন হিন্দুর রাজনৈতিক অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তখনও ধর্ম্ম-বিশ্বাসই তাহাকে অনুপ্রেরণা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাণা প্রতাপসিংহ, শিবাজি মহারাজ, এবং প্রতাপদিত্যের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল করিয়াছিল। স্বধর্ম্মত্যাগী

মানসিংহই মাতৃভূমির গলায় অধীনতা পাশ দৃঢ়তর করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যে বস্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে নিজ স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয়, বুঝিতে হইবে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতেছে, তাহার মরণ আসন্ন প্রায়। আর যে বস্তু পারিপর্শ্বিক অবস্থার অনুকরণ না করিয়া নিজ স্বাভাবিক রূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, বুঝিতে হইবে তাহার প্রাণ-শক্তি বিনষ্ট হয় নাই, ব্যাধি বা দৈবদুর্ঘটনার প্রভাবে তাহার প্রাণশক্তি কিছুকালের জন্য ক্ষীণ হইলেও তাহার পুনরায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন লাভের আশা আছে। মৃত দেহই দ্রুতগতিতে স্বভাবচ্যুত হইয়া যায়, এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি, বায়ু প্রভৃতির সহিত মিশিয়া যায় জীবন্ত দেহ নিজ স্বরূপ রক্ষা করে, চারি দিকের অন্য বস্তুর স্বভাব প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ যে জাতির প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই শীঘ্র অপর জাতির অনুকরণ করে। যে জাতির প্রাণ আছে সে নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করে। কাফ্রিজাতি পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারে পাশ্চাত্য জাতি হইতে ভিন্ন নহে। তাহাদের স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুরা ইংরাজদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে না বলিয়া যাঁহারা বিষণ্ণ হইতেছেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ইহাতে দুঃখের কোনও কারণ নাই। তাঁহারা আশ্বস্ত হউন এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই হিন্দুর প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেছে। হিন্দুজাতির মধ্যে যে ব্যক্তিগণ বেশভূষা এবং আচার ব্যবহারে ইংরাজদের অনুকরণ করিয়াছেন তাঁহারা জাতীয় মৃত্যুর অগ্রদূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি তাঁহাদিগকে সমাজ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারা যায়, পরানুকরণরূপ যে বিষ তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, যাহার ফলে তাঁহারা স্বজাতির সুপ্রথাকে কুপ্রথা মনে করিতেছেন, এবং অপর জাতির কুপ্রথাকে সুপ্রথা

মনে করিতেছেন, যাহার ফলে তাঁহারা স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ভয়াবহ পরধর্ম্ম অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যদি সে ভয়ানক বিষ সমগ্র সমাজ-দেহে সঞ্চারিত না হয় তাহা হইলে হিন্দুজাতির জীবন রক্ষা হইবে এবং একদিন সে অর্থনীতি, রাজনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান সকল বিষয়েই পরিপূর্ণ গৌরবলাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

শিল্প

(ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩৩৪)

ইংরাজীতে Art নামে একটি শব্দ আছে, বাঙ্গলায় সাধারণতঃ শিল্প বলিয়া অনুবাদ করা হয়। শিল্প বলিতে অনেকে কারুকার্য্য-নৃত্যগীতবাদ্য প্রভৃতিই বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু Art কথাটি আরও ব্যাপক। কবিতা, উপন্যাস, নাটক এ সকলই Art এর অন্তর্গত। অতএব শিল্প ও কাব্য উভয়কে একত্র করিলে অনেকটা ইংরাজী Art-এর সমতুল্য হয়। Art-এর এক কথায় একটা বাঙ্গলা প্রতিশব্দ থাকা দরকার, এবং সচরাচর Art অর্থে শিল্প শব্দের ব্যবহার হয়, এজন্য আমরাও এইরূপ ব্যবহার করিব।

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে শিল্প বা Art-কে যেরূপ উচ্চ আসন দেওয়া হয়, আর কোন বস্তুকে সেরূপ উচ্চ আসন দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে শিল্পই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিল্প-সৃষ্টি বিষয়ে যে জাতি যত বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছে,

তাহার স্থান তত উচ্চে নির্দ্দেশ করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজকাল ধর্ম এবং দর্শন অপেক্ষাও শিল্পকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম একটা সাম্প্রদায়িক ভাব, শিল্প অসাম্প্রদায়িক; অতএব ধর্ম অপেক্ষা শিল্প শ্রেষ্ঠ। দর্শনের তত্ত্ব পাশ্চাত্যজগতে অল্পসংখ্যক চিন্তাশীল লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। ইহা শিল্পের ন্যায় ব্যাপক নহে, শিল্পের ন্যায় ইহা মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থলস্পর্শী নহে। শিল্প যেমন নিত্যনূতন সৃষ্টি করে, ধর্ম বা দর্শন সেরূপ করে না। পাশ্চাত্য জগতে শিল্পের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বিজ্ঞান; শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়ের স্থানই ধর্ম ও দর্শনের উপরে। কিন্তু বিজ্ঞান অপেক্ষা শিল্পের আদর অধিক বলিয়া মনে হয়। পাশ্চত্য সুধী-সমাজ শিল্পের মধ্যে প্রতিভার যেরূপ সার্থক বিকাশ দেখেন, আর কিছুর মধ্যে সেরূপ দেখেন কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শিল্পের এই উচ্চ দাবী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। করিবার কারণ এই যে, অন্য পাশ্চাত্য ভাবের সহিত এই শিল্পপূজা আজকাল আমাদের দেশে খুব প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহা ভারতের চিরাগত ভাবের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। ভারতে শিল্পের উপযুক্ত আদর বরাবর আছে। কিন্তু শিল্পকে কখনও ধর্ম ও দর্শনের উপরে স্থান দেওয়া হয় নাই। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম শেক্সপিয়র। নিউটনের স্থান তাঁহার কাছাকছি। মিল্ ও হার্বার্ট স্পেন্সরের স্থান অনেক নীচে। ইংলণ্ডের ধর্ম-গগনে এমন কোন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি ইঁহাদের প্রায় সমতুল্য। কিন্তু ভারতে কালিদাস অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের স্থান ঊর্দ্ধে, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্থান ঊর্দ্ধে।

যদিও শিল্প খুব পরিচিত বস্তু, তথাপি শিল্পের সংজ্ঞা (definition) কি তাহা বলা সহজ নহে। এবিষয়ে মতভেদ ও অনেক। সাধারণ-

প্রচলিত মত এই যে শিল্প অর্থে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। কিন্তু 'সৌন্দর্য্য কি' এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। এক দেশের লোক যে বস্তুকে সুন্দর বলে, অপর দেশের লোক তাহাকে সুন্দর বলে না;—হয় ত কুৎসিত বলে। একই দেশে এক ব্যক্তি যাহাকে সুন্দর বলে, অপর ব্যক্তি তাহাকে সুন্দর বলে না। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। চীনদেশে স্ত্রীলোকের পা খুব ছোট হইলে সুন্দর বলে, অন্য দেশে বলে না। সুসভ্য ইংরাজ মহিলার যে পরিচ্ছদ অতিশয় সুন্দর বলিয়া পাশ্চাত্য-সমাজে আদৃত হয়, আমাদের দেশে তাহাই অনেকে একান্ত কুরুচির পরিচায়ক বলিবেন। গ্রীস দেশে সুদৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত মনুষ্যমূর্ত্তি খুব সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইত, উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ সেইরূপ মূর্ত্তি রচনা করিতে নিজেদের প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অনেকে সেরূপ মূর্ত্তি তত সুন্দর বলে না, কারণ ইহাতে স্থূলভাব বা পশুভাব বড় বেশী পরিস্ফুট। শিক্ষা, সংস্কার ও প্রবৃত্তির উপর সৌন্দর্য্যবোধ নির্ভর করে। অতএব এক বস্তু সকলের চক্ষেই সুন্দর বা কুৎসিত লাগিবে তাহা বলা যায় না।

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিকে শিল্পের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আর এক আপত্তি এই যে, সব সময় যে সুন্দর বস্তু অবলম্বন করিয়া শিল্প বিকশিত হয় তাহা নহে। অনেক সময় নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি মন্দ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াও কবি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন। হাস্যরস, বীভৎসরস, রুদ্ররস এ সকল অবলম্বন করিয়া যে শিল্প রচিত হয় তাহার আখ্যানবস্তু সব সময় সুন্দর হয় না অনেক সময় নিকৃষ্ট বস্তুর সাহচর্য্যে সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য অধিকতর স্পষ্ট হয় তাহা সত্য; কিন্তু সব সময়ে নিকৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি যে এই ভাবেই সার্থক হয় তাহা বলা যায় না। অনেক সময় শিল্পে নিকৃষ্ট বস্তু নিজেই সার্থক হয়।

শিল্পের সংজ্ঞার মধ্যে সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিলে এই সকল গোল হয় বলিয়া টলষ্টয় অন্যরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টলষ্টয় বলেন, একজন মানুষের অতীত অনুভূতি ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরের মনে সঞ্চারিত করার নাম শিল্প। কবি কাব্য রচনা করিয়া নিজের অনুভূতি অপরের মনে সঞ্চারিত করেন; চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে রেখা এবং বর্ণ-বিন্যাস করিয়া নিজ মনোভাব সঞ্চারিত করেন; সঙ্গীতকার স্বর-লয়ের সাহায্যে করেন; ভাস্কর প্রস্তর খুদিয়া করেন। যে শিল্পীর অনুভূতি যত প্রবল এবং যিনি যত স্পষ্টভাবে নিজের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারেন, তিনি তত উৎকৃষ্ট শিল্পী।

টলষ্টয়ের সংজ্ঞা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইলেও ইহার কয়েকটি ত্রুটি আছে। ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে বুদ্ধি বা কৌশলপ্রয়োগ যে শিল্প-রচনায় আবশ্যক তাহা বলা হইল না। একব্যক্তি পত্র লিখিয়া নিজের অনুভূত সুখ বা দুঃখ অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারে, কিন্তু সেই পত্রে যদি বুদ্ধি বা কৌশলের কোনও পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে তাহা শিল্প হইবে না। অবশ্য পত্র-লিখন-প্রণালীর মধ্যেও শিল্প কৌশল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা না থাকিলেও একের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া একজনের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়; কিন্তু সাধারণতঃ তাহার মধ্যে কোনও শিল্প থাকে না।

টলষ্টয়ের সংজ্ঞায় অপর একটি ত্রুটি এই যে, শিল্পী অনেক সময় যে ভাব নিজে অনুভব করেন নাই, তাহাও অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। উপন্যাস পাঠ করিবার সময় পাঠকের মনে পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য কৌতুহল জন্মে। শিল্পী ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠকের মনে এইরূপ কৌতুহল জাগাইয়া শিল্পকৌশলের পরিচয় দেন। কিন্তু এই কৌতুহলের ভাব শিল্পী

নিজে অনুভব করেন না, কারণ পরবর্ত্তী ঘটনা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। কোনও গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় পাঠক ঘটনাপ্রবাহ পড়িতে পড়িতে যেরূপ পরিণতি বা উপসংহার প্রত্যাশা করেন, হঠাৎ তাহার বিপরীত পরিণতি বা উপসংহার দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিস্ময়রসে আপ্লুত হইতে পারে। এইভাবে বিস্ময়রসের সৃষ্টি করিয়া কবি নিজ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দেন, কিন্তু নিজ অনুভূতির সঞ্চার করেন না, কারণ উপসংহার কি হইবে তাহা তিনি পূর্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব শিল্পী যে সব সময় নিজ অনুভূত ভাবই সঞ্চার করেন, তাহা ঠিক নহে; কখনও কখনও নিজের অননুভূত ভাবও সঞ্চার করেন।

এই সকল কারণে শিল্পের একটী নূতন সংজ্ঞা খুঁজিতে হয়। বোধ হয় এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে কোনও আপত্তি উঠিতে পারে না:— যে বস্তু কৌশলপূর্ব্বক রচনা করা হয় এবং যাহা অপরের চিত্ত বিচলিত করে,—তাহাই শিল্প। যিনি যত সহজে যত প্রলবভাবে অপরের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তিনি তত উৎকৃষ্ট শিল্পী। কৌশল এবং অপরের চিত্ত আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা এই দুইটি বস্তু শিল্পের প্রাণ। দুইটিই থাকা চাই,—নচেৎ শিল্প হয় না। প্রভূত কৌশলসহকারে একটি বস্তু রচনা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা যদি মানবহৃদয় আকর্ষণ করিতে না পারে, তাহা শিল্প-হিসাবে তাহা ব্যর্থ। কলকারখানা প্রস্তুত করিতে অনেক কৌশলের প্রয়োজন; কিন্তু সে কৌশলের উদ্দেশ্য অর্থাগম,—মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য সে কৌশল প্রয়োগ করা হয় নাই; এজন্য কলকারখানাকে শিল্প কার্য্য বলা যায় না। অপর পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া মানব-হৃদয় আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সংবাদ-লেখক কৌশলের পরিচয় না দিলে তাহা শিল্প হয় না।

শিল্প মাত্রই যে ভাল জিনিষ হইবে ইহা বলা যায় না। কারণ মানবের

চিত্ত কেবলমাত্র ভাল জিনিষের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। ভাল, খারাপ, এবং না-ভাল-না-খারাপ সকল রকম জিনিষই মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। ক্ষমা, দয়া, স্বার্থত্যাগ, কঠিন কর্ত্তব্য পালন,—এ সকলই কৌশলের সহিত বিবৃত হইলে মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। এই সকল ভাব কল্যাণজনক। আবার ভোগ, ইন্দ্রিয়সুখ-লিপ্সা, প্রতিহিংসা, অহঙ্কার এ সকলও মানব-মন আকর্ষণ করিতে পারে। ইহারা অশুভ। কৌতূহল, নির্দোষ আমোদ এবং হাস্যপরিহাস ইহারাও মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে। ইহারা ভালও নহে, মন্দও নহে। ক্ষমতা-বান্ শিল্পীর হাতে এই সকল ভাবগুলিই শিল্পের আখ্যান-বস্তু হইতে পারে। আখ্যান-বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে শিল্পও শুভ, অশুভ, এবং শুভাশুভত্ব-বর্জিত,—তিন প্রকারের-ই হইতে পারে। কিন্তু অনেকে এই সহজ কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করেন, শিল্পমাত্রই ভাল জিনিষ,—যাঁহারা শিল্প চর্চ্চা করেন, তাঁহারা সকলে একটা মহৎ ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। ইহার ফলে আজকাল শিল্পের জন্য—কাব্য, নাটক এবং চলচ্চিত্র-অভি-নয়ের জন্য—প্রতি বৎসর কত কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়, কত লক্ষ লোক আজীবন প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। "...enormous buildings are erected,......hundreds of thousands of work-men...spend their whole life in hard labour to satisfy the demands of art...Hardly any other department of human activity, the military excepted, consumes so much energy as this......The very lives of men are sacrificed." [Tolstoy, *What is Art ?*]

"শিল্পের দাবী মিটাইবার জন্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হয়, লক্ষ লক্ষ লোক কঠোর পরিশ্রমে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে। শিল্পের জন্য

মানবজাতি যে পরিমাণে শক্তি ব্যয় করে, যুদ্ধ ব্যতীত বোধ হয় আর কোনও উদ্দেশ্যে এত শক্তি ব্যয় হয় না। (এই উদ্দেশ্যে) মানবের জীবন পর্য্যন্ত বলি দেওয়া হয়।" [টলষ্টয় প্রণীত পুস্তক "শিল্প কাহাকে বলে?"] বাস্তবিক এত অর্থ এবং এত পরিশ্রম সবই যে কোনও মহৎ কার্য্য সাধনে ব্যয়িত হয় তাহা নহে। শিল্প লোকের ভাল লাগে, তাই লোকে শিল্পের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে। যাহা ভাল লাগে তাহার নাম "প্রেয়"। প্রেয় সব সময় শ্রেয় হয় না।

অন্যচ্ছে্রয়োহন্য দুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে হর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥

(কঠোপনিষদ্)

"শ্রেয় এবং প্রেয় বিভিন্ন দ্রব্য। ইহারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানবকে বন্ধন করে। যে শ্রেয় গ্রহণ করে তাহার সাধু হয়। যে প্রেয় গ্রহণ করে সে অর্থলাভে বঞ্চিত হয়।" শিল্প "প্রেয়ে"র অন্তর্গত। তাহার উদ্দেশ্যে মনোরঞ্জন করা। এজন্য শাস্ত্রে কাব্যতে "কান্তাসম্মিত" বলা হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণ গ্রন্থ সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—(১) কান্তাসম্মিত,—যেমন কাব্য নাটক (২) সুহৃৎসম্মিত—দর্শন-সমূহ; এবং (৩) প্রভুসম্মিত,—বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ। কাব্য ও নাটকের উদ্দেশ্য কেবল মনোরঞ্জন করা, এজন্য তাহাকে কান্তাসম্মিত বলা হয়। বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রভুর ন্যায় আদেশ করিয়া থাকেন, যে কার্য্য করিতে বলেন তাহা করিবার কারণ সকল সময়ে দেখাইয়া দেন না,—এজন্য বেদ স্মৃতি ও পুরাণকে প্রভুসম্মিত বলা হয়। মানবের কি প্রকারে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে দর্শনশাস্ত্রে তাহা নির্দ্দেশ করে, যুক্তি

এবং তর্ক দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেয়। এইভাবে দর্শন সুহৃদের ন্যায় আচরণ করে বলিয়া দর্শনকে সুহৃৎসম্মিত বলা হয়।

কাব্য বা শিল্প উৎকৃষ্ট হইলেই তাহা যে কল্যাণপ্রদ হইবে তাহার কোনও মানে নাই। যে শিল্প মানবহৃদয় যত প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিবে শিল্প হিসাবে সে তত উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহার আখ্যান-বস্তু কল্যাণপ্রদ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। মানব-হৃদয়ে শুভ এবং অশুভ উভয় প্রকারেরই মনোবৃত্তি আছে। সৎশিল্প আমাদের শুভ মনোবৃত্তিগুলি জাগাইয়া দেয়, অসৎশিল্প অশুভ মনোবৃত্তিগুলি জাগাইয়া দেয়।

মানব-হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া শিল্প একটি শক্তিশালী বস্তু। যে জাতি এই শক্তির যেরূপ ব্যবহার করে, সে জাতি সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে। বিবেচনাপূর্ব্বক এই শক্তির ব্যবহার না করিলে অনেক সময় সুফল অপেক্ষা কুফল বেশী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে শিল্পের শক্তি এবং তাহাকে নিয়মিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সুদূর অতীত হইতে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। কাব্য, কাহিনী, নাটক, কথকতা, নৃত্যগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা,—সকল রকমের শিল্প ভারতবর্ষে ধর্মের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তার করিয়া শিল্পের শক্তি সার্থক হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন প্রতিভাবান্ লোকের মধ্যে শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অপরদিকে সাধারণের মধ্যে সৎশিল্প প্রচার হওয়াতে তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতি হইয়াছে। রামায়ণ এবং মহাভারত কাব্য হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট, জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে এবং জাতির মধ্যে ধর্মভাব বিকশিত করিতে ইহারা সেইরূপ সমর্থ। এজন্য সমগ্র পৃথিবীতে এই দুই মহাকাব্যের তুলনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য জগতে ইলিয়ড এবং ওডিসিকে ইহাদের সহিত তুলনা করা হয়। কিন্তু

ইলিয়ড এবং ওডিসি অপেক্ষা রামায়ণ এবং মহাভারতের স্থান অনেক উচ্চে। রামায়ণ এবং মহাভারত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া জনসাধারণের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইলিয়ড এবং ওডিসি তাহার শতাংশেরও একাংশ বিস্তার করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। ইলিয়ড এবং ওডিসির আদর কেবলমাত্র সংসারীদের নিকট; সংসার-বিরক্ত সাধুদের নিকট ইহাদের কোন আদর নাই। রামায়ণ এবং মহাভারতে ভগবানের লীলা বর্ণিত হইরাছে, এজন্য গৃহস্থ সংসারীর পক্ষে ইহা যেরূপ আদরণীয়, সাধু মহাত্মগণের নিকট তাহা অপেক্ষাও বেশী আদরণীয়। সংসারে যতপ্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে, সকল রকম সম্বন্ধের আদর্শ রামায়ণ এবং মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শ সখা, আদর্শ রাজা, আদর্শ ব্রহ্মচারী, সকল রকম আদর্শই আমাদের দুইটি মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে; এজন্য চরিত্র-গঠনের পক্ষে ইহাদের উপযোগিতা অসাধারণ। ইলিয়ড এবং ওডিসিতে এত রকম আদর্শ ত নাই-ই, যেগুলি আছে, সেগুলিও রামায়ণ এবং মহাভারতের আদর্শের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। রামায়ণ এবং মহাভারতের প্রভাব ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া সুদূর সুমাত্রা, যবদ্বীব প্রভৃতি উপনিবেশেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানের প্রাচীন মন্দির-গাত্রে আজিও তাহার অসংখ্য নিদর্শন বর্ত্তমান।

কেবল কাব্য নহে, হিন্দুর সকল রকমের শিল্প ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত। অথবা, হিন্দুর প্রতিভা সকল রকম শিল্পের সাহায্যে ধর্মভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ কাব্য যেমন ধর্মবিষয়ক, সেইরূপ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গীত, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য, সকলই ধর্ম-বিষয়ক। যাত্রা, অভিনয়, কথকতা, চিত্র, সকলের মধ্যেই ধর্মভাব

পরিস্ফুট। মৃত্তিকা দ্বারা সাধারণ কুম্ভকার নির্মিত দেবীমূর্ত্তির মুখশ্রীতে যে দিব্যভাব পরিস্ফুট হয়, শ্রেষ্ঠ ভাস্করের শিল্পেও তাহা দুর্লভ। বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণ এবং অলঙ্কারের সমাবেশে সে মূর্ত্তি পরম রমণীয় হয়, বহুবিধ পৌরাণিক চিত্রে তাহা সুশোভিত হয়, সানাইয়ের কমনীয় সুর ভক্তের হৃদয়ে নবীন ভাব জাগাইয়া দেয়, আগমনী এবং বিজয়ার সঙ্গীত তাহার হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তোলে। শিল্প যত রকমে মানব-মন আকর্ষণ করিতে পারে, হিন্দুর পূজা-পদ্ধতিতে সেই সকল রকম উপায় সুচারু রূপে প্রয়োগ করিয়া হিন্দুর মনকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করা হয়। যে সকল শিল্প অন্যান্য দেশে কেবল সুখসম্ভোগ এবং বিলাসকামনা চরিতার্থ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, হিন্দুর প্রতিভা সেই সকল শিল্পের মধ্যে মানব মনকে বিষয়-সুখ হইতে ফিরাইয়া ভগবদভিমুখা করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে আশ্চর্য্য রূপে সফল হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্প সম্বন্ধে একটা সমস্যার কাছে আসিয়া পড়িয়াছি,—শিল্পের কোনও উদ্দেশ্য থাকা উচিত কি না। এ বিষয়ে এক পক্ষের মত এই যে, শিল্প রচনার কোন উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়, এবং যে শিল্প যত পরিমাণে উদ্দেশ্যরহিত, তাহা তত শ্রেষ্ঠ এবং সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তত অধিক লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। শিল্পীর উদ্দেশ্য হইবে একটি সুন্দর জিনিষ রচনা করা। সে জিনিষ কাহারও কোনও কাজে লাগিবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না। এই ধরুন, সমাজে সৎশিক্ষা প্রচারের জন্য যদি কোন পুস্তক রচনা করা হয়, বা চিত্র অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে যথার্থ শিল্প হিসাবে তাহার মূল্য কমিয়া যাইবে। কারণ যথার্থ শিল্পের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। তাহাকে যদি সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার ভার দেওয়া যায়, তাহা হইলে

সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে সে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে না। যে প্রকারের বা যে পরিমাণ সৌন্দর্য্য সমাজকে শিক্ষা দিবার পক্ষে অনুকুল, সে পরিমাণ সৌন্দর্য্য তাহাতে থাকিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্য্যের কোন অভিব্যক্তি যদি সমাজ-শিক্ষার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে সে প্রকারের সৌন্দর্য্য উদ্দেশ্যমূলক শিল্পের মধ্যে স্থান পাইবে না। অপর পক্ষে যদি কোন সৌন্দর্য্যরহিত বস্তু সমাজ-শিক্ষার পক্ষে অনুকূল হয়, তাহা হইলে সেরূপ বস্তুও উদ্দেশ্যমূলক শিল্পের মধ্যে স্থান পাইয়া তাহার উৎকর্ষ হানি করিবে। সমাজকে শিক্ষা দিবার পক্ষে কিরূপ বস্তু অনুকূল, তাহা সমাজের বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। শিল্পকে যদি তাহার অনুগত হইয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে শিল্পের অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন ভাব সঙ্কুচিত হইবে। যথার্থ শিল্প কেবল মাত্র কোনও বিশেষ সমাজের পক্ষে উপযোগী নহে। যথার্থ শিল্প সকল সমাজের সকল লোকের পক্ষে সমান উপযোগী হইবে।

যাঁহাদের মত এইরূপ, তাঁহারা সৌন্দর্য্য যেরূপ অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন মনে করেন, তাহা যথার্থ নহে। মানবের রুচি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে; এবং প্রবৃত্তি ও সংস্কারের ভেদে মানবের সৌন্দর্য্য-বোধেরও প্রভেদ দেখা যায়। তাহার ফলে এক বস্তু কাহারও নিকট খুব সুন্দর মনে হয়, কাহারও বা তত সুন্দর বোধ হয় না, এমন কি কুৎসিতও বোধ হইতে পারে। অপর পক্ষে মানবচরিত্র-গঠনের উপযোগী বস্তুকে এই প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ যেরূপ সঙ্কীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক মনে করেন, বাস্তবিক ইহারা ততদূর সঙ্কীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িক নহে। রামায়ণের দুই চারিটি ঘটনার আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। অনেক প্রলোভনের মধ্যে সীতা যে তাঁহার পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এই কাহিনী চরিত্র-গঠনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

কিন্তু ইহা যে কেবল হিন্দু পাঠকেরই উপযোগী এ কথা বলা যায় না। অন্য দেশের লোকও যদি ইহা পাঠ করে, তাহা হইলে উচ্চ আদর্শের প্রতি ভক্তিতে তাহার চিত্ত অবনত হইবে; এবং তাহার অজ্ঞাতসারে, তাহার চিত্ত এই প্রকার সদ্‌গুণাবলী বিকশিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র-রূপে প্রস্তুত হইবে। রামের পিতৃভক্তি, ভরতের কর্ত্তব্যপালন, হনু-মানের প্রভুভক্তি,—এই সকল কাহিনী চরিত্র-গঠনের উপযোগী হইলেও অসাম্প্রদায়িক এবং সার্বজনীন।

যথার্থ শিল্পকে উদ্দেশ্যরহিত বলিয়া যে দাবী করা হয় তাহাও বিচারসহ নহে। মানুষ বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল জীব; সাধারণতঃ সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোন কাজ করে না। শিল্প-রচনাকে মানবের শ্রেষ্ঠ চেষ্টার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। সেগুলি যে মানব উদ্দেশ্যহীন ভাবে রচনা করে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সাধারণতঃ অনেকে বলেন, কোকিল যেরূপ স্বাভাবিক প্রেরণায় গীত গাহিয়া থাকে, কবিও সেইরূপ কবিতা রচনা করেন, তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু বিহঙ্গ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, কোকিলের গানও উদ্দেশ্যহীন নহে। চৈত্রের রজনীতে কোকিল যে সুমধুর কণ্ঠস্বরে গগন প্লাবিত করে, স্ত্রী-কোকিলকে আকর্ষণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ শিল্প-রচনার উদ্দেশ্য অপরের মনোরঞ্জন করা এবং তাহার দ্বারা প্রশংসা বা অর্থ উপার্জ্জন করা। এইরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যদি উৎকৃষ্ট শিল্প রচনা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে পাঠকের চরিত্র উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বা শিল্প রচনা করা সম্ভবপর হইবে না কেন? বাস্তবিক পক্ষে উভয় প্রকারের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট শিল্প রচিত হইতে পারে। যে শিল্পীর যেরূপ প্রবৃত্তি তিনি সেইরূপ শিল্প রচনা করেন। এবং যে জাতির মধ্যে যে প্রবৃত্তি প্রবল, সেই জাতির মধ্যে তদনুরূপ শিল্পের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

শিল্পের বহুসংখ্যক বিভাগ আছে, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবন যাপন করিবার প্রণালীও যে একটি শিল্প হইতে পারে, ইহা সকলে উপলব্ধি করেন না। নিজের জীবন-প্রণালীর দ্বারা নিজের অনুভূতি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়, এজন্য টলষ্টয়ের সংজ্ঞা অনুসারে জীবন-প্রণালীকে একটি শিল্প বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এক হিসাবে জীবন-প্রণালীকে শ্রেষ্ঠ শিল্প বলা যাইতে পারে; কারণ, একজন নিজের জীবন-প্রণালী দ্বারা অপরের হৃদয়ে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন কাব্য রচনা করিয়া বা চিত্র অঙ্কিত করিয়া কিম্বা বক্তৃতা করিয়া সেরূপ পারেন না। ইংরাজীতে একটি বাক্য আছে Example is better than precept, অর্থাৎ উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত কার্য্যকরী। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি কেবল শিশুদের মধ্যে যে প্রবল তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেও ইহা অত্যন্ত প্রবল। সাধরণ ব্যক্তিরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি দের সাজসজ্জা যেরূপ অনুকরণ করে, সেইরূপে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালীরও অনুসরণ করে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, অপর ব্যক্তিসকল সেইরূপ করে। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ প্রমাণ করেন, অপর লোক তাহা অনুসরণ করে।"

জীবন-শিল্পের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা সাধু ভাব বা ধর্মভাব প্রচারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সংসারের সুখ এবং ঐশ্বর্য্য অনিত্য; ইহাদের প্রতি আসক্ত হইলে পরিণামে কষ্ট ভোগ অপরিহার্য্য, সকল কথা কাব্য-কাহিনী কিংবা উপদেশ দ্বারাও প্রতিপন্ন করা যায় তাহা

সত্য; কিন্তু একজন সাধুব্যক্তি নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপর এই সকল ভাব যেরূপ প্রগাঢ় ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন, কাব্য বা কাহিনীর দ্বারা সেরূপ করা সম্ভব নহে। এই জন্য মহাত্মা গান্ধি একস্থলে বলিয়াছেন, Asceticism is the noblest art of life অর্থাৎ, বৈরাগ্যই মহত্তম জীবন-শিল্প। যে রাজপদ লাভের জন্য সাধারণ লোকে লালায়িত হয়, যাহার জন্য অনেকে ভ্রাতৃহত্যা এমন কি পিতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে, সেই রাজপদ অবহেলা করিয়া, বুদ্ধদেব দরিদ্রের বেশে একাকী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এই কথা যে শুনিয়াছে, সেই অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও অনুভব করিয়াছে যে রাজ ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ বস্তু, জীবনে সত্যলাভই চরম পদার্থ। স্নেহশীলা বৃদ্ধা মাতা, প্রেমময়ী যুবতী পত্নী, দেশব্যাপী পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, ভক্তদের আন্তরিক পূজা,—এই সকল চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎ-প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সেই করুণ কাহিনী যাহারা শুনিয়াছে তাহাদের হৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রগাঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, জগতে ঈশ্বরলাভই শ্রেষ্ঠ সুখ, তাঁহার সহিত সংসারের সহস্র সুখের তুলনাই হয় না। বুদ্ধদেব এবং শ্রীচৈতন্যদেব যে মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন-প্রণালীর দ্বারা সেই ভাব অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেব এবং চৈতন্যদেব যদি ঐরূপে জীবন যাপন না করিয়া এই সকল উচ্চভাব অবলম্বন করিয়া কাব্য বা সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা হইলে ঐ সকল ভাব এত উৎকৃষ্ট ভাবে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত না। এজন্য এই সকল হাপুরুষদের জীবন-প্রণালী-রূপ শিল্পকে কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি অপর শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বন করিয়া অনেক কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এই সকল

কাব্য প্রভৃতি রচয়িতার স্থান শিল্পী হিসাবে বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের উচ্চে দেওয়া যাইতে পারে না।

কেবল যে ধর্মপ্রচারকদের জীবনকে শিল্প বলা যায় এমন নহে। প্রায় সকল প্রকার মহৎ আচরণকে শিল্প বলা যাইতে পারে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত, হল্‌দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে ঝালাপতি মান্নার কীর্ত্তি। সাধারণতঃ প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা, তাঁহার রাজচ্ছত্র কাড়িয়া লওয়া গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীর ন্যায় আচরণ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। মান্না এ সকলই করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভু প্রতাপসিংহের রাজচ্ছত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া বিষম সঙ্কট হইতে প্রভুকে রক্ষা করা। তাই মান্নাকে রাজবিদ্রোহী বলা হয় না, প্রভুভক্তদের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে কয়া হয়। মান্নার কীর্ত্তিকাহিনী যে শুনিয়াছে, তাহারই হৃদয়ে প্রভুভক্তি এবং আত্মোৎসর্গের মহত্ত্ব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মেবার রাজকুলের ধাত্রী পান্নার আচরণ এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত। মৃত প্রভুর শিশু পুত্রকে অপহরণ করা এবং নিজের পুত্রকে হত্যা করান, পান্না এই দুইটী গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিয়াও প্রভুপরায়ণতার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ধাত্রী পান্না এবং ঝালাপতি মান্না তাঁহাদের হৃদয়ে যে মহান্ কর্ত্তব্যবোধ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আচরণ দ্বারা তাহা উৎকৃষ্ট ভাবে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের আচরণ উৎকৃষ্ট শিল্প বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, শিল্প কি তাহা অনেকে জানিলেও শিল্পের কিরূপ সংজ্ঞা দেওয়া উচিত এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। "শিল্প অর্থে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি" এরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে অনেক আপত্তি হইতে পারে। এজন্য অপর দুইটি সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছি,—

একের অতীত অনুভূতি অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার উপায়কে শিল্প বলা যায় (Tolstoy); কিম্বা যে কার্য্য কৌশলপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া অপরের চিত্ত বিচলিত করা যায়, তাহাকে শিল্প বলা যাইতে পারে। শিল্পমাত্রই মহৎ বস্তু নহে; শিল্প কল্যাণজনক হইতে পারে, না হইতেও পারে। পাশ্চাত্য জগতে একরকম নির্বিচারেই শিল্পের অত্যধিক আদর করা হয়, শিল্পের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করা হয়। ভারতবর্ষে শিল্প অপেক্ষা ধর্ম এবং দর্শনকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে; পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় শিল্পের অত্যধিক আদর করা হয় নাই, কিন্তু শিল্পের উপযুক্ত আদর করা হইয়াছে। শিল্প একটী ক্ষমতাশালী বস্তু এবং সেই ক্ষমতা শুভপথে পরিচালিত করা উচিত, ইহা হিন্দুরা প্রাচীন কাল হইতে উপলব্ধি করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিভা প্রায় সকল রকম শিল্পকে ধর্মভাব এবং সাধুভাব প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছে; এবং তাহার ফলে জনসাধারণের মনে এই সকল উচ্চভাব গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভারতে শিল্পকে ধর্মের জন্য নিযুক্ত করিবার উৎকৃষ্ট ফল, রামায়ণ এবং মহাভারত। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, উৎকৃষ্ট শিল্প উদ্দেশ্য-রহিত হইয়া থাকে এবং হওয়া উচিত, এই কথা যথার্থ নহে। সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জন করিয়া অর্থ ও যশোলাভের উদ্দেশ্যেও শিল্প রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু চরিত্র উন্নত করিবার উদ্দেশ্যেও উৎকৃষ্ট এবং অসাম্প্রদায়িক শিল্প রচিত হইতে পারে। পরিশেষে আমরা দেখিয়াছি যে, মহৎ কার্য্যমাত্রকেই শিল্প বলা যায়। এইরূপ মহৎ কার্য্য দ্বারা একের অনুভূতি অপরের হৃদয়ে উৎকৃষ্ট ভাবে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়। এজন্য জীবনে মহৎ আচরণকে শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

খোলা চিঠি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় মান্যবরেষু—

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ আপনার "সনাতন হিন্দু" বহিখানি আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। বন্ধুবর বলিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করা হইয়াছে, সেগুলি যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। বহিটি পড়িয়া আমারও বোধ হইল, বন্ধুর কথাই ঠিক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি এবং আপনার প্রচারিত মতাবলী সম্বন্ধে আপনাকে পুনরায় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আপনার 'সনাতন হিন্দু' পড়িয়া বোধ হইল, অপনি টোলের পণ্ডিতদের উপর খুব বিরক্ত। আপনি তাঁহাদের বহু দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। দোষ কাহার নাই? টোলের পণ্ডিতের যে কতকগুলি দোষ থাকিবে তাহা বিচিত্র কি? কিন্তু তাঁহাদের অনেকের মধ্যে কি বহু সদগুণাবলী আপনি দেখেন নাই? বহুবংশপরম্পরা ধরিয়া দুঃখদারিদ্র্যেও অবহেলার মধ্যেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরাই আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন এবং সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থাবলী সযত্নে রক্ষা করেন নাই কি? তাঁহাদের তুলনায় আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা কি সমধিক বিলাসী, স্বার্থপর, ভোগান্বেষী এবং পরানুকরণপ্রিয় নহেন? সে যাহা হউক, আমি বা আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু টোলের পণ্ডিত নহি, এমন কি টোলে কখনও পড়ি নাই; আমরা

---

* ১৩৩৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পত্র দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইংরাজী স্কুল-কলেজেই শিক্ষালাভ করিয়াছি। অতএব আপনি মনে করিবেন না যে, টোলের পণ্ডিতদের প্রতি আমাদের অযথা পক্ষপাত আছে অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচয় নাই।

আপনি বলিয়াছেন যে; শাস্ত্রানুমোদিত এবং মহর্ষিগণের অভিপ্রেত পথেই হিন্দুদের চলা কর্ত্তব্য (৩৮ পৃঃ)। আপনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আমাদের ধর্ম্মের যে বাহ্য আকার বহু দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, শাস্ত্রানুসারে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে (১২ পৃঃ)। আদিপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া আপনি দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল ধর্ম্মকার্য্য বিহিত ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি কলিকালে নিষেধ করা হইয়াছে (পৃঃ ১২ ও ১৩)। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রকার ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী; কলিযুগে যে সকল আচার অনিষ্টকর হইবে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কলিযুগের জন্য তাঁহারা যে সকল বিধিনিষেধ করিয়াছেন, আমাদের সেগুলি পালন করিতে চেষ্টা করা উচিত। কলিযুগের জন্য তাঁহারা কতকগুলি পরিবর্ত্তনের বিধান দিয়াছেন বলিয়া, আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন (যাহার বিধান তাঁহারা দেন নাই) করা উচিত হয় না, অন্ততঃ সেরূপ পরিবর্ত্তন করা শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা বলা যায় না। শাস্ত্র যদি এ কথা বলিতেন যে, যখন যেরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে, তখন সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে আপনি যাহা বলিতেন, তাহা ঠিক হইত। কিন্তু শাস্ত্র সে কথা কোথাও বলেন নাই। অধিকন্তু এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও, নানারূপ গোলযোগ হইত। কতকগুলি ব্যক্তি একপ্রকার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন, আবার কতকগুলি ব্যক্তি আর একপ্রকার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। সেরূপ বিবাদের কে মীমাংসা করিবে? বিশেষতঃ কতকগুলি পরিবর্ত্তন আপনি করিতে বলিয়াছেন, যেগুলি শাস্ত্র কলিকালের জন্য নিষেধ

করিয়াছেন (যথা বিলাত যাত্রা)। এ ক্ষেত্রে আপনার ব্যবস্থা শাস্ত্রানু-যায়ী বলা যায় না।

আপনি নিজেই বলিয়াছেন যে, সমাজসংস্কারের ব্যপদেশে আমাদের সমাজমধ্যে শাস্ত্রবিরোধী ও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন যাহাতে না হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে প্রযত্ন করিতে হইবে। কিন্তু আপনি যে সকল পরিবর্ত্তন করিতে বলেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি শাস্ত্রবিরোধী এবং এইরূপ প্রচারের ফলে যে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা আছে। আপনি তাহা "হিন্দু-সমাজ-সম্মেলনে" স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যখন সভার সকল লোক হঠাৎ উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। আপনি লিখিয়াছেন, (১২৩ পৃঃ) "ব্রাহ্মণ সকলেই হইতে পারে, এ কথা অনেক সমাজসংস্কারকের মুখে আজকাল শুনিতে পাই এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া যাউক, এইরূপ প্রস্তাবও সভাসমিতিতে গৃহীত হইতেছে। আবার শুধু গৃহীত হইতেছে তাহা নহে," কার্য্যেও পরিণত হইতেছে। আপনি এই ব্যাপারের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপার আপনার প্রচারিত ব্যবস্থার অনিবার্য্য ফল। আপনি বলিয়াছেন, জাতি জন্মগত হওয়া উচিত নহে, গুণানুসারে হওয়া উচিত। **এখন গুণানুসারে কাহার ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত, কাহার ক্ষত্রিয় হওয়া উচিত, কে ইহা ঠিক করিবেন?** বলিতে পারেন, একটা সভা করিয়া ইহা স্থির করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ণনির্ণয় করিবার জন্য প্রাচীনকালে কোনও সভার কথা ত শোনা যায় নাই। সমাজের প্রত্যেক লোকের গুণকর্ম্ম বিচার করিয়া বর্ণনির্ণয় করিবার যোগ্যতা সভার লোকেরা কোথায় পাইবেন? সভা করিয়া এই সকল ব্যাপার স্থির করিতে গেলে কিরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার হয়, তাহা আপনি ত' নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আপনি বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রে দুই প্রকার বাক্যই পাওয়া যায়। "গুণকর্মবিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগের কথাও যেমন উপলব্ধ হয়, সেইরূপই বহু বচনে জন্মগত ব্রাহ্মণাদি বিভাগেব নির্দ্দেশও পরিদৃষ্ট হয়।" (৪১ এবং ৪২ পৃঃ) আপনার মতে "এই বিরোধের সমন্বয় করিতে হইলে মনুষ্যসমাজের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থানিচয়কে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখিতে হইবে।" আপনার বলিবার উদ্দেশ্য এইরূপ বোধ হয় যে, সমাজের কোনও অবস্থায় জন্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ করা উচিত, আবার অপর অবস্থায় জন্ম অনুসারে না করিয়া গুণ অনুসারে করা উচিত। কিন্তু আপনার এই মীমাংসা সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। আপনি যেরূপ বলিয়াছেন, শাস্ত্রের যদি তাহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইত যে, সমাজের অমুক অবস্থায় বর্ণ জন্মগত হওয়া উচিত এবং অমুক অবস্থায় বর্ণ গুণগত হওয়া উচিত। কিন্তু শাস্ত্রে কোথাও সেরূপ উল্লেখ নাই। আপনি বলিয়াছেন, বর্ণ প্রথমে গুণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইত, পরে ইহা জন্মগত হইল। আপনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জন্মগত বর্ণের দোষ নিবারণার্থ শাস্ত্রকারগণ নানারূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥

—মনুস্মৃতি

কিন্তু শাস্ত্রকারগণ যদি দেখিয়াছিলেন যে, জন্মগত বর্ণ অকল্যাণকর, তাহা হইলে তাঁহারা সোজা বিধান দিতেন যে, বর্ণ জন্মগত হইবে না, গুণগত হইবে, এবং গুণানুসারে কে বর্ণ নির্দ্দেশ করিবে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন,—তাহা না করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইরূপই হইবে। এবং ব্রাহ্মণের পুত্র

যদি বেদ পাঠ না করে, তাহা হইলে সে শূদ্র হইয়া যাইবে। এই যে দুইটি আপাত বিরোধী বাক্য দেখা যাইতেছে, ইহাদের শাস্ত্রানুসারে মীমাংসা এইরূপ :—ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ইহাই ব্যবস্থা। "ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ না করিলে সে শূদ্র হইয়া যায়," এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বেদপাঠ না করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতিশয় নিন্দাসূচক। এ ভাবে সমন্বয় করিলে সকল শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ইতিহাস-পুরাণে যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, সেগুলি আলোচনা করিলেও দেখা যায়, বর্ণ জন্মগত ইহাই সাধারণ নিয়ম, জন্মগত বর্ণ ত্যাগ করিয়া অপর বর্ণ গ্রহণ (যথা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হওয়া) ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম। বিশ্বামিত্র কত কঠোর তপস্যা করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন। আর আজকাল সাধনা নাই, তপস্যা নাই, **সভাতে** resolution **পাশ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণ হইবার সখ দেখা যাইতেছে।** উপরি উদ্ধৃত মনুস্মৃতির শ্লোক যেরূপ আচার-হীনতার নিন্দাসূচক বলিয়া বুঝিতে হইবে, সেইরূপ ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটিকে ভাগবন্নাম সংকীর্ত্তনের প্রশংসাসূচক মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহার Literal (আক্ষরিক) অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্র-বাক্যগুলি পরস্পর-বিরোধী হইয়া যায়।—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু বীক্ষণাৎ॥

"হে ভগবান্, আপনার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন বা উচ্চারণ করিলে, আপনাকে স্মরণ করিলে, চণ্ডালও বেদবিহিত যজ্ঞ করিতে অধিকারী হয়, আপনাকে দর্শন করিলে যে, সে এরূপ অধিকারী হইবে, তাহা কি আর

বলিতে হইবে ?" এই শ্লোকের Literal ব্যাখ্যা করিলে কিরূপ দাঁড়ায় ? ভগবানের সহস্র নাম, তাঁহার যে কোনও একটি নাম যে কোনও ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, সে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ত সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্মই থাকিবে না। ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে। অপর শাস্ত্র-বাক্যের সহিত ইহার সামঞ্জস্যও নাই। আপনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে সকলেরই পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, তাহার পর দীক্ষালাভ করিলে সে যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকারী হয় (৫৭ পৃঃ)। এই ব্যাখ্যা আপনার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখানেও Literal ব্যাখ্যা হইল না। যদি Literal ব্যাখ্যা ছাড়িতেই হয়, তাহা হইলে সনাতনপন্থীদের ব্যাখ্যায় আপনি দোষ দিবেন কিরূপে ?

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ

"গুণকর্ম্ম বিভাগ অনুসারে আমি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" আপনি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভগবান্ বর্ণ জন্মগত করেন নাই, গুণকর্ম্মগত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কি ইহাই অর্থ ? জীবনে যে যেরূপ কর্ম্ম করে, যাহার যেরূপ গুণ, ভগবান্ তাহাকে তদনুরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করান। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনিজন্মসু"(১৩।২১)—অর্থাৎ জীব যে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, গুণের প্রতি আসক্তিই তাহার কারণ। জন্মগ্রহণ ত একটা অহেতুক ব্যাপার বা accident নহে। জগতে কিছুই accident নহে, সকলই ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে হয়, এবং তিনি যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও গুণ তাহাকে সেইরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করান। যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও কর্ম্ম, তাহাকে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করান, কারণ, ব্রাহ্মণকুলে

জন্মিলে তাহার ব্রাহ্মণোচিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার সুযোগ বেশী। কিন্তু বেশী সুযোগ সত্ত্বেও যে তাহা অবহেলা করে এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও অসদাচরণ করে, পরজন্মে তাহার অন্য কুলে জন্ম হয়। ইহজন্মে তাহাকে অসৎ ব্রাহ্মণই বলিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কি বলিয়াছিলেন, তাহাও দেখুন। দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণের পুত্র কিন্তু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, তাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিলেন না, ব্রাহ্মণই বলিলেন। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা অতি ক্রূরস্বভাব, বিপক্ষ সংহারের জন্য স্ত্রী এবং ভ্রূণহত্যা করিতেও সঙ্কোচ করেন না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই মানিলেন। উপনিষদের যুগেও বর্ণ জন্মগত ছিল, তাহার প্রমাণ জাবালির উপাখ্যান। সত্যকাম যখন ঋষির নিকট বেদপাঠ করিতে গেল, তখন ঋষি তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। জন্মের সহিত বর্ণের যদি সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে বালকের গোত্র জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকে না।

আপনি বলিয়াছেন, পুরাকালে হিন্দু ভিন্ন অপর জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ আপনি বেশনগরের শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে লেখা আছে যে, যবনজাতীয় ডিয়ার পুত্র হেলিওডোরা বাসুদেব-মন্দিরের অগ্রভাগে একটি গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং হেলিওডোরা আপনাকে ভাবগত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (৪ এবং ৫ পৃঃ) অপিচ ভাগবত হইতে আপনি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা-
আভীর-শুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

বিষ্ণুকাঞ্চীতে লর্ড ক্লাইভ বিষ্ণুর জন্য একটি মূল্যবান হীরকের হার উপহার দিয়াছিলেন,—আজিও তাহা দর্শক দেখিতে পাইবেন। টিপু স্থলতান হিন্দুমঠের জন্য সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার হইতে প্রমাণ হয় না যে, লর্ড ক্লাইভ বা টিপু স্থলতান হিন্দু হইয়াছিলেন। ভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে মাত্র এই কথা বলা হইয়াছে যে, ভগবানের আশ্রয় লইয়া সকল জাতির লোক পবিত্র হইয়া থাকে, তাহারা যে হিন্দু না হইলে পবিত্র হইতে পারে না, এ ধারণা আপনার কেন হইল ?

হিন্দুধর্ম্মের একটা বিশিষ্টতা এই যে, ইহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অপর সকল ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে কেহ মুক্তি পাইবে না ;—**কেবল হিন্দুধর্ম্মই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছে, সকল ধর্ম্মই সত্য ; যাহার যে ধর্ম্ম, সে সেই ধর্ম্মপথে ঠিকমত চলিলে ভগবান্‌কে পাইবে।**— এজন্য অপর সকল ধর্ম্মের প্রচারকগণ অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন, এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অশোভন ব্যগ্রতা দেখান। তাহাতে কত অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, কত রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবল হিন্দুধর্ম্মই এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত। তাই হিন্দু ধর্ম্মেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ন্যায় সাধকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, যিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের সাধনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, সকল ধর্ম্মমতেই ভগবানকে পাওয়া যায়।" গীতার অপূর্ব্ব সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

"যে যে ভাবে আমাকে পূজা করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিব।"

কাহারও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত এবং জগতে বহু অশান্তির কারণ, মহাত্মা গান্ধি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং সে জন্য অপর ধর্ম্মের লোক ভাঙ্গাইয়া হিন্দুদের দলবৃদ্ধির জন্য আজকাল যে চেষ্টা হইতেছে, মহাত্মাজী বরাবর তাঁহাতে বাধা দিয়া আসিয়াছেন।

সর্দ্দা-আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইয়াছে, আপনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার এই যে আন্দোলন, ইহা মিথ্যার উপরেই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত" এবং মনুর স্মৃতি হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন ত্বেবৈনাং প্রযচ্ছেত্ত গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

"বরং ঋতুমতী কন্যা মরণ পর্য্যন্ত গৃহে থাকুক, তথাপি গুণহীন ব্যক্তির হস্তে তাহাকে প্রদান করিবে না।" কিন্তু আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝি,—সাধারণতঃ কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া যে-সে পাত্রের হাতে সম্প্রদান করা উচিত নয়। ঋতুমতী কন্যাকে অবিবাহিত রাখা অন্যায়, অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করাও অন্যায়। উভয়ের মধ্যে অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা বেশী অন্যায়। উপরি উক্ত শ্লোক হইতে আপনি যদি সিদ্ধান্ত করেন যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পর বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রের অভিপ্রেত, তাহা ঠিক হইবে না, কারণ, তাহা হইলে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কন্যাকে আমরণ অবিবাহিত রাখাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত, এবং পাশ্চাত্য দেশে যদি কিছুকাল পরে বিবাহপ্রথা উঠিয়া যায় এবং আমাদের সমাজসংস্কারকগণ্ কন্যাদিগকে আজীবন অনূঢ়া রাখিবার জন্য আইন করিতে চাহেন, আপনি তাহাও

বোধ হয় সমর্থন করিবেন! মনুর কি অভিপ্রায়, তাহা অন্য শ্লোকে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরং॥

ত্রিশ বৎসর বয়সের পাত্র দ্বাদশ বৎসরের কন্যা, অথবা চব্বিশ বৎসরের পাত্র, ৮ বৎসরের কন্যা বিবাহ করিবে।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী॥
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাৎ বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, তাহার পর স্বজাতীয় পতি নিজে নির্ব্বাচন করিবে। কন্যার পক্ষে স্বয়ং পতিনির্ব্বাচন করা মনু অন্যত্র নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু কন্যা অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকা বেশী নিন্দনীয় বলিয়া এখানে স্বয়ম্বরপ্রথার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে কৌলীন্যপ্রথার ফলে বহু কন্যা অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিত, সকলেই উহার নিন্দা করিয়াছেন। ঐ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিতও নহে, এ জন্য ক্রমশঃ ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাতে কন্যাগণ দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিত, এই কারণে আপনি ঐ প্রথার প্রশংসা করিয়াছেন।

পৌরাণিক যুগে কতকগুলি যুবতী কন্যার বিবাহ হইয়াছে দেখা যায়, যথা শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী (সীতার অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল)। আধুনিক সমাজসংস্কারকগণের ন্যায় আপনিও ইহার উল্লেখ করিরাছেন। আমরা পূর্ব্বে মনুর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি যে, ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে যদি পিতা কন্যার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে কন্যা স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিবেন। দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতির ঋতুকালের তিন বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত পতির সহিত মিলিত হন নাই, এ জন্য শাস্ত্রমতে

তাঁহাদের স্বয়ংম্বরের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কারণ, আর বেশী দিন অবিবাহিত রাখা উচিত বোধ হয় নাই। শকুন্তলাও নিজেই পতিনির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে ইহা প্রমাণ হয় না যে, সে সময় ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথা ছিল না। যে শাস্ত্রে অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা ছিল, সেই শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এই সকল ক্ষেত্রে অধিক বিলম্ব নিবারণার্থ স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

পরিশেষে আপনার দুই একটি পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের উল্লেখ করিয়া এই পত্রের উপসংহার করিব। আপনি ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "আমাদিগের শিশুগণকে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে শিক্ষা দিতেছি, তাহার দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগের পশ্চাত্যভাব-প্রবণতা, সনাতনধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্যতা এবং দাসোচিত মনোবৃত্তির পরিপুষ্টি হইতেছে।" অথচ আপনি অন্যত্র এই ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুগণেরই প্রাচীনপন্থীদের প্রতি বিরূপতা এবং সমাজ-সংস্কার চেষ্টার প্রয়াস প্রশংসা করিয়াছেন (৩৭ পৃঃ) আধুনি ইরাংজী শিক্ষিত অধিকাংশ ব্যক্তি যে স্বধর্ম্মে আস্থাহীন বলিয়াই প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধমতাবলম্বী এবং পাশ্চাত্য জাতিদের অনুকরণ করিয়াই সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আপনি কি দেখিতেছেন না? ২১ পৃষ্ঠায় আপনি বলিয়াছেন, আস্তিক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বর্জ্জন করিয়া, তাঁহাদিগকে নেতৃত্বের পদ হইতে বিতাড়িত করিয়া, হিন্দুসমাজের বা হিন্দু মহাজাতির অভিপ্রেত সমুন্নতি যে আকাশকুসুমের ন্যায় একান্ত অলীক, এ কথা নব্য সম্প্রদায়কে ভুলিলে চলিবে না। অথচ আপনি নানাস্থানে এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে কপট, ভণ্ড, মূর্খ, দুরাচার, দেশদ্রোহী প্রভৃতি যথেষ্ট গালাগালি দিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে সমাজের স্বাভাবিক নেতা বলিয়াছেন, ইহাই ঠিক। কারণ, তাঁহারা বহুপুরুষ ধরিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন অধ্যাপনা

করিতেছেন এবং শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। নানা অভাব দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াও,—তদপেক্ষাও যাহা সহ্য করা কঠিন, আধুনিক শিক্ষিত লোকদের উপহাস ও নির্য্যাতন সত্ত্বেও—তাঁহারা স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোককে আপনি আপনার মত গ্রহণ করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। **অতএব আপনার সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ আপনার মতগুলি আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র।** প্রভেদের মধ্যে এই যে, আপনি এই মতগুলি হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

আপনি উপনিষদ্ প্রভৃতি হিন্দুর কয়েকটি প্রাচীন কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আমরা কি সেই হিন্দুর বংশধর ?" (৯ পৃঃ) আপনার মত গ্রহণ করিলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হয়। কারণ, আপনি বলেন, যে হূণ শক যখন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক দলে দলে হিন্দু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয় হইয়াছে। আপনার এ উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা উপনিষদের ঋষিগণের বংশধর, না হূণ শকদের বংশধর, তাহা বলা কঠিন।

আপনি যে সকল সমাজসংস্কার করিতে চাহেন, যাঁহারা তাহার বিরোধী, তাঁহাদের "দাসোচিত মনোবৃত্তি" (৬৫ পৃঃ) বলিয়া আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার মতের সহিত মিল হয় নাই বলিয়াই ইঁহাদের মনোবৃত্তিকে দাসোচিত বলা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। বরং যাঁহারা মনে করেন যে, "যেহেতু ইংরাজেরা আমাদের উপর রাজত্ব

করেন, সুতরাং ইংরাজের যেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদেরও সেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত, নচেৎ আমাদের মঙ্গল নাই," তাঁহাদেরই মনোবৃত্তিকে দাসোচিত বলা যাইতে পারে।

আপনি বলিয়াছেন, আমাদের "অন্তঃশত্রুর মধ্যে প্রধান হইতেছে,—আমাদিগের আত্মসত্তায়, আত্মমাহাত্ম্যে ও অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিতে একান্ত অবিশ্বাস।" আমরাও আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আমাদের **"আত্মমাহাত্ম্যে ও অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিতে বিশ্বাস করুন।"** আমাদের শাস্ত্রকার ঋষিগণ সমাজের জন্য যে সকল বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের কল্যাণ হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয় করুন। **পাশ্চাত্যজাতির অনুকরণে আমাদের সমাজ গঠন না করিলে** যে, আমাদের উন্নতি হইবে না, এ ভ্রম দূর করুন। *একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনি যে ভাবে সমাজ-*সংস্কার করিতে বলিয়াছেন, **তাহার সহিত পাশ্চাত্য সমাজের কি প্রভেদ আছে?** এই সমাজ-সংস্কার দুর্ব্বল্ জাতি কর্ত্তৃক প্রবল জাতির অনুকরণ ব্যতীত আর কি? পাশ্চাত্য সমাজের "ঐহিক সর্ব্বস্ব সভ্যতার গর্ব্ব" (পৃঃ ২) দেখিয়া, আপনি অভিভূত হইবেন না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ"॥

শাস্ত্র যেরূপ বিধান দিয়াছেন, অকুতোভয়ে সেই পথ নির্দ্দেশ করুন, নিশ্চয়ই দেশের কল্যাণ হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোবৃত্তি অনুসারে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা হইতে বিরত হউন,—সংস্কারক দলের মনোরঞ্জনপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন।